পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহ: একটি পর্যালোচনা

The Cursed Nations Mentioned In Surah Hud Of The Holy Quran: An overview

Faculty of Arts
Department of Islamic Studies

(এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক
মুহাঃ সহিদ উল্লাহ
সেশন: ২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের এম. ফিল. গবেষক জনাব মুহাঃ সহিদ উল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত "পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।

আমার জানামতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম। ইতিপূর্বে এম. ফিল. বা অন্য কোন ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

.....

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা দিচ্ছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব লিখিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

.....

মুহাঃ সহিদ উল্লাহ
এম. ফিল. গবেষক
সেশন: ২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على النبي الامين وعلى آله وصحبه اجمعين -

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার, যিনি জ্ঞানবানদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি, যার মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটেছে। আমার "পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যার অসীম দয়ায় আমার মত অধমের দ্বারা ঐতিহাসিক একটি প্রসঙ্গ নিয়ে উপরোল্লিখিত গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সম্মানিত পিতা মাও. মুহাম্মদ আবদুল মতিন (সহকারী অধ্যাপক অবঃ) এবং মাতা জীবুন্নেছা বেগমের, যাদের কঠোর পরিশ্রম, সাধনা ও দু'আর বদৌলতে আজ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা উনাদের উভয়কে নেক হায়াত দান করুন, আমীন।

গবেষণাকর্মটির জন্য আমি যার নিকট চির ঋণী হয়ে থাকবো, তিনি হলেন আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান স্যার, যার সুচিন্তিত মতামত, প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা, সার্বক্ষণিক তদারকি ও পরামর্শ আমাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। স্যারের আন্তরিক তত্ত্বাবধানে আমি আমার গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি। আল্লাহ তা'আলা স্যারকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও আমার বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মহোদয়গণের, যারা আমার গবেষণকর্মে সহযোগিতা করেছেন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় মোঃ আবদুল বাতেন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (অবঃ), ইসলামিক মিশন, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর এর প্রতি যিনি হাঁটতে চলতে সবসময় আমাকে অত্র গবেষণায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা রইল আমার ভাগ্নে মোঃ জমীর উদ্দীন (বি.সি.এস শিক্ষা) এর প্রতি যে আমাকে অত্র গবেষণাকর্মে সাহস যুগিয়েছে এবং বিভিন্ন সময় সহযোগিতা প্রদান করেছে। প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন আমার সহকর্মী জনাব আর. কে. শাব্বীর আহমদ, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), মিছবাহুল উলূম কামিল মাদরাসা, মতিঝিল, ঢাকা।

পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মহান প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবী কামনা করছি। আমার এ ক্ষুদ্র গবেষণাকর্মটিকে আল্লাহ তা'আলা যেন একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই কবুল করে নেন এবং এর উসিলায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরকালে নাজাত দান করেন, আমীন।

প্রতিবর্ণায়ন

ا = অ	ف = ফ
ب = ব	ق = ক্ব/ক
ت = ত	ك = ক
ث = ছ	ل = ল
ج = জ	م = ম
ح = হ	ن = ন
خ = খ	و = ওয়া/উ
د = দ	ه = হ
ذ = য	ة = হ/ত
ر = র	ء = ’ (উর্ধ্ব কমা)/ অ
ز = য	ي = য়
س = স	َ = (যবর) = া/ আ
ش = শ	ِ = (যের) = ি/ ই
ص = স/ছ	ُ = (পেশ) = ু / উ
ض = দ/ দ্ব	أو = ূ / ঊ
ط = ত/ত্ব	اي = ী / ঈ
ظ = য	ً = দু’ যবর/ আন
ع = ‘আ	ٍ = দু’ যের/ ইন
غ = গ	ٌ = দু’ পেশ/ উন

বি. দ্র.

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। শব্দের শেষের ة কে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন بقرة (বাকারা) যে সব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলাভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত শব্দ সংকেত বিবরণী

আল-কুরআন, ১০:১৫	: প্রথম সংখ্যা সূরা ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
ইমাম বুখারী	: আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
ইমাম নাসাঈ	: আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ
ইমাম আবু দাউদ	: আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী
ইমাম তিরমিযী	: আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী
ইবনু মাজাহ	: আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী
ইমাম আহমদ	: আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাম্বল আল-বাগদাদী
ইমাম মালিক	: ইমাম মালিক ইবনু আনাস আল-মাদানী
ইমাম দারেমী	: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আদ-দারেমী
ইবন কাছীর	: আবুল ফিদা ইমাদউদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর
ইমাম তাবারী	: আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তাবারী
ইমাম কুরতুবী	: আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আবী বকর আল-কুরতুবী
আ.	: আলাইহিস সালাম
তা. বি.	: তারিখ বিহীন
ইং	: ইংরেজি সাল
হি.	: হিজরী সাল
খৃ.	: খৃষ্টাব্দ
পৃ.	: পৃষ্ঠা
১ম.	: প্রথম
২য়.	: দ্বিতীয়
ড.	: ডক্টর
(স.)	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	: রাদিয়াল্লাহু আনহু
(র.)	: রহমতুল্লাহি আলাইহি
খ.	: খণ্ড
সং.	: সংস্করণ
তা'আলা	: আল্লাহ শব্দের সাথে তা'আলা ব্যবহার করা হয়েছে
ই.ফা.বা.	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনু.	: অনুবাদ

সূচীপত্র

ভূমিকা..... ১

প্রথম অধ্যায়: পবিত্র কুরআনের সূরা হুদ পরিচিতি ৬

১ম পরিচ্ছেদ: পবিত্র কুরআনের পরিচয়..... ৬

২য় পরিচ্ছেদ: সূরা হুদের পরিচিতি, নামকরণ ও বিষয়বস্তু ১০

৩য় পরিচ্ছেদ : সূরা হুদ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য ১২

৪র্থ পরিচ্ছেদ: অভিশপ্ত জাতির পরিচয়..... ১৪

৫ম পরিচ্ছেদ: অভিশপ্তের কারণ ও পূর্ব সতর্কীকরণ..... ১৮

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহের সংখ্যা ও পরিচয় ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়: নূহ (আ.) এর জাতি ও প্রলয়ংকরী মহাপ্লাবন..... ২৪

১ম পরিচ্ছেদ: নূহ (আ.) এর জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ২৪

২য় পরিচ্ছেদ : পৃথিবীতে শিরকের সূচনা ৩১

৩য় পরিচ্ছেদ : দাওয়াত ও তাবলীগ..... ৩৪

৪র্থ পরিচ্ছেদ: নৌকা তৈরি ও প্রলয়ংকরী মহাপ্লাবন..... ৩৮

৫ম পরিচ্ছেদ: নূহ (আ.) এর প্লাবনের ব্যাপকতা..... ৪৪

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: নূহ (আ.) এর জাতি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াবলী..... ৪৬

৩য় অধ্যায়: আদ ও সামূদ জাতি ৪৮

১ম পরিচ্ছেদ: আদ জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান..... ৪৮

২য় পরিচ্ছেদ: হুদ (আ.) এর দাওয়াত ও আদ জাতির অবাধ্যতা..... ৫৩

৩য় পরিচ্ছেদ: আদ জাতির উপর আপতিত আযাব ও তাদের ধ্বংসের বিবরণ ৫৫

৪র্থ পরিচ্ছেদ: সামূদ জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান..... ৫৭

৫ম পরিচ্ছেদ: সালিহ (আ.) এর দাওয়াত ও সামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ..... ৬২

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: তাদের ঘটনাপুঞ্জ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়াবলী..... ৬৮

চতুর্থ অধ্যায়: লূত (আ.) এর জাতি ও মাদইয়ানবাসী ৭০

১ম পরিচ্ছেদ: লূত (আ.) এর জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ৭০

২য় পরিচ্ছেদ: সমকামিতা ও পৃথিবীতে তার সূচনা ৭৪

৩য় পরিচ্ছেদঃ লূত (আ.) এর দাওয়াত ও তার জাতির সলিল সমাধি.....৮৪
৪র্থ পরিচ্ছেদঃ মাদইয়ানবাসী ও তাদের আবাস.....৮৯
৫ম পরিচ্ছেদঃ শু'আইব (আ.) এর দাওয়াত ও মাদইয়ানবাসীর ধ্বংস.....৯৩
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ তাদের ঘটনায় আমাদের শিক্ষা.....৯৮

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ফিরআউনের গোষ্ঠী ও তাদের সলিল সমাধি.....৯৯
১ম পরিচ্ছেদঃ ফিরআউন ও তার জাতির পরিচয়.....৯৯
২য় পরিচ্ছেদঃ মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের পূর্ব ইতিহাস.....১০৫
৩য় পরিচ্ছেদঃ ফিরআউনের খোদায়ী দাবী ও মূসা (আ.) এর দাওয়াত.....১০৮
৪র্থ পরিচ্ছেদঃ ফিরআউনের অবাধ্যতা ও মূসা (আ.) এর মু'জিযাসমূহ.....১১১
৫ম পরিচ্ছেদঃ ফিরআউন ও তার গোষ্ঠীর ধ্বংস হওয়ার কাহিনী.....১১৯
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ তাদের ঘটনায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ.....১২১

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উল্লিখিত অপরাধসমূহ থেকে উত্তরণের উপায় ও সুপারিশমালা.....১২৪
১ম পরিচ্ছেদঃ সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন.....১২৪
২য় পরিচ্ছেদঃ ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন.....১৩২
৩য় পরিচ্ছেদঃ পাপ ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতকরণ.....১৪১
৪র্থ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী অনুশাসনমূলক কর্মসূচী পালন.....১৫০
৫ম পরিচ্ছেদঃ চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধিকরণ.....১৬১
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ পরকালীন জবাবদিহিতায় উদ্বুদ্ধকরণ.....১৬৯

উপসংহার.....১৭৯

গ্রন্থপঞ্জী.....১৮৫

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد-

পৃথিবীর ইতিহাস উত্থান পতনের ইতিহাস। পৃথিবীতে কত দূর্দান্ত জাতি ও প্রতাপান্বিত শাসকের আগমন ঘটেছে যাদের সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন ও ভোগবিলাসিতা তাদেরকে ইতিহাসের নির্মম পরিণতিতে নিক্ষেপ করেছে। পরিণত হয়েছে তারা ধ্বংসস্তুপে। এমনি কয়েকটি জাতি ও শাসকের ধ্বংসের ঘটনাপুঞ্জ নিয়েই আমার এই গবেষণাকর্মটির অবতারণা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট এ পৃথিবী নামক গ্রহে রয়েছে অসংখ্য জীবের বসবাস। তন্মধ্যে মানুষের স্বতন্ত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার কারণে তাদেরকে আশরাফুল মাখলুক্বাত বা সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়ে থাকে। এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার পেছনে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কিছু নিয়ম পদ্ধতি যা অনুসরণ করে চললে মানুষ এ পৃথিবীতে স্থিতিশীলতা ও সংহতিপূর্ণ সহাবস্থানের সাথে সমাজবদ্ধ হতে পারে। দুনিয়াতে যেমনিভাবে তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে তেমনিভাবে পরকালীন জীবনেও মুক্তি অর্জন করতে পারে। সেসব রীতি-নীতি হল আল্লাহ প্রদত্ত আইন যা মানবজাতিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন। আর নবী-রাসুলগণ সে সকল আসমানী কিতাবের মাধ্যমে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করার ও পরকালে মুক্তি অর্জন করার সহজ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত আইন পালন করার মাধ্যমেই কেবল একটি জাতি শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও প্রগতিশীল হতে পারে; ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা হলেন সৃষ্টিকর্তা, আর যে কোন সৃষ্ট জিনিষ কোন্ নীতিমালা অনুসরণ করে চললে সফলতা লাভ করতে পারবে তা তার স্রষ্টা থেকে আর কেউ অধিক জ্ঞাত নয়। ফলে দুনিয়া এবং পরকালে মানবজাতির সফলতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিকল্প নেই।

কিন্তু যখনই মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত প্রভূত সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি পেয়ে ভোগবিলাস ও ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা শুরু করে দেয় তখনই মানব সমাজ নৈতিকভাবে এতটাই অধ:পতিত হয়ে পড়ে যে, এক সময় তাদের মধ্যে আর এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকে না, যে তাদেরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। ঠিক তখনি আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ঐশী নিয়ম পদ্ধতি দিয়ে নবী/রাসূল প্রেরণ করেন। কিন্তু যখনি তারা সে নিয়ম পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে মনগড়া চলা আরম্ভ করে, নবী-রাসুলগণের কথা অমান্য করে, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করা শুরু করে দেয়, তখনি সমাজে অশান্তি, বিশৃংখলা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে মানব সমাজ অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত ও অপরাধপ্রবণ হয়ে আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের যোগ্য হয়ে পড়ে। কালের পরিক্রমায় এক সময় তারা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

ইসলাম নিচক কোন ধর্মের নাম নয়। এটি মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। ইহা মানুষের সকল প্রকার অপরাধ দমনে ও সকল সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করছে। মানুষের মধ্যে শান্তি শৃংখলা বিধানে এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইসলামে যে সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে তার সবগুলিই আল-কুরআনকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়েছে যাতে রয়েছে যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক সমাধান। এতে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা। সকল যুগের, সকল মানুষের জন্যে রয়েছে এতে পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে দিয়ে এ বিশ্বভূবনে ইসলামী রীতি-নীতি ও আদর্শের সূচনা করেন। আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করেন। রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হন এমন এক সর্বজনীন জীবন বিধান যা শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে মুক্তির এক মহাসনদ। যার মূলমন্ত্র হল সাম্য, তাক্বওয়া, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, উদারতা, মানবতা, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

বিশ্বের ইতিহাসে সাধারণত দু'ধরণের মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি হল বিজয়ী ও সফলকাম মানবগোষ্ঠী আর অপরটি হল ধ্বংসপ্রাপ্ত মানবগোষ্ঠী। আম্বিয়া (আ.) গণের দাওয়াতে যুগে যুগে যে সকল মানবগোষ্ঠী সাড়া দিয়েছিল তারাই হল সফলকাম মানবগোষ্ঠী। মূলতঃ আল কুরআন মানব জাতিকে সেই সফলতার দিকেই আহ্বান জানায়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথের দিশা দান করুন, তাদের পথ যাদেরকে উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন" (১:১)। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ও বিজয়ী জাতিদের ঘটনা উপস্থাপন করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে যুগে যুগে যারা আল্লাহ ও নবীগণের নাফরমানী করেছিল তারাই ধ্বংস হয়েছে আর যারা অনুগত ছিল তারা বিজয়ী হয়েছে। যেমন নূহ (আ.) ও তার অনুগতরা বিজয়ী ও সফলকাম হয়েছে আর তার বিরুদ্ধাচরণকারীরা মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) ও তার অনুসারীরা বিজয়ী ও সফলকাম হয়েছে, আর তার বিরুদ্ধবাদীরা পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক যুগে আম্বিয়া (আ.) এবং তাদের অনুসারীগণই বিজয়ী হয়েছিলেন আর তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস হয়েছে। পবিত্র কুরআন এদের ঘটনাপুঞ্জকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে সুস্পষ্টভাবে আহবান করছে যে, তোমরা সফলকাম হতে চাইলে তদ্রূপ অনুগত বান্দাদের রীতি অনুসরন কর এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের পথ বর্জন কর, অন্যথায় তাদের মত তোমাদেরও ধ্বংস অনিবার্য।

সুখী, সমৃদ্ধশালী, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও কল্যাণমুখী জীবনযাত্রা মানুষের স্বভাবজাত কামনা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শৃংখলা এবং মুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মানবতা ও নিরাপত্তা সর্বত্রই ভূলুণ্ঠিত। শান্তিপূর্ণ জনপদ যেন সোনার হরিণ। বস্তুত: বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী ও দূর্বলের উপর জুলুম আজ বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। যেমন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত একটি ধর্ম হল বৌদ্ধ ধর্ম। এর প্রবর্তক হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। তার ধর্মের প্রধান শ্লোগান হল 'অহিংসা পরম ধর্ম' এবং 'জীব হত্যা মহাপাপ'। এতদসত্ত্বেও সেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচিত ও সেই সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা রাষ্ট্র মায়ানমার নিরীহ রোহিঙ্গাদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জালিয়ে দিয়েছে। তাদের মহিলাদেরকে ধর্ষণ করেছে। শিশুদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে

দিয়েছে। রোহিঙ্গাদেরকে জবাই করে তাদের গোস্তের ভাগ বসিয়েছে এবং সে গোস্ত তারা রান্না করে খেয়েছে। যা বিশ্বের সকল প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচিত্র প্রচারিত হয়েছে।

তাই বাস্তবতার প্রয়োজনে যে কোন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন আদর্শিক রীতি-নীতির। মানবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন আদর্শিক মূল্যবোধের। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বহু জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ধর্মগুরু এ লক্ষ্যে ব্যাপক কাজ করে গেছেন। বহু রীতি-নীতি প্রণয়ন করেছেন। বহু ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রণয়ন করেছেন। আজও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তা সত্ত্বেও মানব রচিত সেই রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি মানবতার কল্যাণে ফলপ্রসূ হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি সাময়িক ফল দিলেও পরবর্তীতে তা মানব জাতির কল্যাণ অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন এক সময় সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের খুব জয় জয়াকার ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা লেজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। আবার পুঁজিবাদ পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। কিন্তু ক্রমেই পুঁজিবাদের ধারক বাহকরাও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়তে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী মানুষ মুক্তির আশায় আবার ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ইসলামী রীতি-পদ্ধতির। শান্তি আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আজ ইসলামের সেই কালজয়ী আদর্শকে অনুশীলন করার জন্য বিশ্বব্যাপী, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তাই আবার শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়তে এবং বিশ্বব্যাপী মানবজাতিকে ধ্বংসের দারপ্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্যে আল-কুরআনের ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে পরিচিতি লাভ করেছে। সুতরাং এখানেও এ ধরণের গবেষণার দাবি রাখে। যুগে যুগে আল-কুরআন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও উহার মধ্যকার সুরা হুদে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ নিয়ে গবেষণা, তাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ উদঘাটন করা এবং তাদের মত যেন অন্য কোন জাতিকে ধ্বংস হতে না হয় সে জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে গবেষণা অপ্রতুল। সুতরাং এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণার দাবী রাখে। তাই আমার 'পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহ: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি এ দাবীরই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমার এ অভিসন্দর্ভে মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা হুদের যে ভুমিকা রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আল-কুরআনের আলোকে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের ধ্যান ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত অলীক রীতি-নীতির বিপরীতে আল-কুরআনে প্রদর্শিত রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা হুদে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মনগড়া রীতি-নীতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের বিপরীতে বিজিত নবী-রাসুল এবং তাদের অনুসারীগণের রীতি-নীতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের তুলনামূলক পর্যালোচনা অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি বিষয়বস্তুর আলোকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভটির আবেদন পাঠক, গবেষক ও শিক্ষার্থী সমাজের কাছে একান্তভাবে স্বীকার্য।

এ গবেষণাকর্মটির মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মানুষদের সামনে অত্র সূরায় বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অবাধ্যতা, নাফরমানী, ধোকাবাজী, অহংকার এবং অত্যাচার ইত্যাদি যেসব কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে তার প্রকৃতি ও ধরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তা পরিষ্কার করে দেয়া। পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে তার বাস্তবতা উপস্থাপন করে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানবজাতিকে সতর্ক করা এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। সেজন্য ঐ জাতিসমূহের পরিচিতি, ধর্মীয় অবস্থা, নৈতিক স্খলন, আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ এবং জুলুম-অত্যাচারের ধরণ ও তার অশুভ পরিণতি সর্ম্পকে তথ্যবহুল দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে তা থেকে বেরিয়ে এসে সফলতা ও কামিয়াবি অর্জন করার তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক উপায় নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমি আমার এ অভিসন্দর্ভটিকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়: পবিত্র কুরআনের সূরা হুদ পরিচিতি। দ্বিতীয় অধ্যায়: নূহ (আ.) এর জাতি ও শিরকের সূচনা। তৃতীয় অধ্যায়: আদ ও সামূদ জাতি। চতুর্থ অধ্যায়: লূত (আ.) এর জাতি ও মাদইয়ানবাসী। পঞ্চম অধ্যায়: ফিরআউনের গোষ্ঠী ও তাদের সলিল সমাধি। ষষ্ঠ অধ্যায়: উল্লিখিত অপরাধসমূহ থেকে উত্তরণের উপায় ও সুপারিশমালা। এদের প্রতিটি অধ্যায়কে আবার ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

অধ্যায়গুলোর পরিচ্ছেদসমূহে অপরাধসমূহের ভয়ানক পরিণতি ও তা থেকে উত্তরণের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উক্ত বিষয় সর্ম্পকে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে তথা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য যথাসম্ভব তথ্য উপাত্ত সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় দিক নির্দেশনাগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটির শেষ দিকে নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় ও উপাদান হিসেবে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন, অনুশাসনমূলক কর্মসূচী পালন, নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতকরণ, চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধিকরণ ও পরকালীন জবাবদিহিতায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসহ বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা অবক্ষয়মুক্ত ও কল্যাণভিত্তিক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রতি অধ্যায় শেষে গবেষণার মূল বক্তব্যের ওপর নাতিদীর্ঘ সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে ও একটি উপসংহার সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে প্রচলিত ও স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য ও উপাত্তসমূহ যথাসম্ভব মূল গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুদিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বক্ষমান গবেষণায় বর্ণনামূলক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে গবেষণার ফলাফলসমূহ পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। আল-কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে মাআরিফুল কুরআন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনুদিত আল-কুরআন অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তথাপিও মুদ্রণযন্ত্রের (কম্পিউটার) বাংলা-আরবী কম্পোজ সীমাবদ্ধতার কারণে সর্বক্ষেত্রে যথাযথ প্রতিবর্ণায়ন হয়তোবা সম্ভব হয়নি। নামের ক্ষেত্রে বাংলায় ব্যবহৃত প্রচলিত রীতি-নীতি ক্ষেত্র বিশেষ ব্যবহৃত

হয়েছে। পাদটীকা এবং তথ্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন লেখক বা গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের নাম, অনুদিত গ্রন্থ হলে অনুবাদকের নাম। (প্রকাশনের স্থান: প্রকাশক বা প্রতিষ্ঠানের নাম, সংস্করণের ক্রম (যদি থাকে), প্রকাশকাল, খণ্ড নম্বর (যদি থাকে), পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি। যেসব গ্রন্থ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে যেসব গ্রন্থের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমবার বিস্তারিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে, পরবর্তীতে প্রাগুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভে যে সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের আলোচনা তুলে ধরেছি, তা-ই সব নয়; বরং এ ছাড়াও পৃথিবীতে আরো বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু আমার আলোচ্যবিষয় হল সূরা হুদে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ তাই আমি আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেবলমাত্র সে সকল জাতিসমূহের আলোচনা যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যাদের আলোচনা সূরা হুদে রয়েছে। আশা করি পাঠকগণ এর মাধ্যমে ইসলামের আলোকে আধুনিক যুগে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পাবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের তথা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করে কল্যাণকর জাতি গঠনের তৌফিক দান করুন, আমিন।

প্রথম অধ্যায়
পবিত্র কুরআনের সূরা হুদ পরিচিতি
১ম পরিচ্ছেদ
পবিত্র কুরআনের পরিচয়

পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থঃ

পবিত্র শব্দটি বিশেষণ (Adjective), এর অর্থ সৎ, পরিষ্কৃত, শোধিত, জীবাণুমুক্ত, সম্মানিত, স্বচ্চ। এর আরবী প্রতিশব্দ হল – مُقَدَّسٌ – مُنَزَّهٌ - مُبَارَكٌ – مُطَهَّرَةٌ ইত্যাদি।[১] ইংরেজীতে Holy, sacred ইত্যাদি।[২] আল-কুরআনে مُطَهَّرَةٌ শব্দটিকে কুরআনের বিশেষন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ - مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ অর্থাৎ উহা লিপিবদ্ধ আছে সম্মানিত, সূউচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে।[৩] رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً অর্থাৎ আল্লাহর একজন রাসূল পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করতেন।[৪] এমনিভাবে مبارك শব্দটিকেও কুরআনের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ অর্থাৎ 'এটি একটি বরকতময় গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং তোমরা তার অনুসরন কর'।[৫] আল্লাহ তা'আলার ذات তথা সত্তা যেমন পবিত্র তেমনি তার কালামও পবিত্র। তাই কুরআনুল কারীমের মাছহাফকে অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা বৈধ নয়। এ জন্য হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় এবং জুনুবীর জন্য কুরআনুল কারীমের সহীফাকে স্পর্শ করা এমনকি স্পর্শ না করে মুখস্ত তিলাওয়াত করাও নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন। যা সুরক্ষিত কিতাবে সংরক্ষিত। উহাকে যেন পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ না করে।[৬]

কুরআন (قرآن) শব্দটি قرأ শব্দমূল থেকে নির্গত, এর অর্থ পাঠ করা। যেহেতু কুরআনুল কারীম সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ তাই একে القرآن নামকরণ করা হয়েছে। পাঠ করা অর্থে قرآن শব্দটি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ অর্থাৎ 'নিশ্চয় উহা (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার, সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন তুমি তা অনুসরন

---

১. আবু তাহের মেসবাহ, ***আল-মানার (আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান)***, চকবাজার, ঢাকা ১২১১: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রকাশকাল ১৯৯০ খৃ., পৃ. ৮৪৩।

২. A. T. DEV'S, ***STUDENTS FAVOURITE DICTIONARY(BENG. TO ENG.),*** BANGLA BAZAR, DHAKA: PROGATI COMPUTER & PUBLISHER, NEW ADDITION 2007, PAGE NO. 634.

৩. আল-কুরআন, ৮০:১৩-১৪।

৪. আল-কুরআন, ৯৮:০২।

৫. আল-কুরআন ৬:১৫৫।

৬. আল-কুরআন, ৫৬:৭৭-৭৯।

কর’।[৭] এ আয়াত দুটিতে قرآن শব্দটি পাঠ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মান্না‘ আল কাত্তান (র.) বলেন, قرآنশব্দটি غُفْرَانٌ ، شُكْرَانٌ ، فُعْلَانٌ এর ওজনে একটি ক্রিয়ামূল। এটি قَرْأٌ মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ জমা করা, যুক্ত করা। পাঠ করার মাধ্যমে যেহেতু হরফ এবং শব্দসমূহের একটিকে অপরটির সাথে যুক্ত করা হয় সেহেতু কুরআন শব্দটির মৌলিক অর্থ সাব্যস্ত হল পাঠ করা। এখানে কুরআন ক্রিয়ামূলটিকে (مصدر بمعنى اسم مفعول হিসেবে) مَقْرُوٌّ তথা পঠিত অর্থে গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের সাথে কুরআন শব্দকে খাস করা হয়েছে যা উহার প্রকৃত নাম হিসেবেই পরিগণিত।[৮] আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (র.) বলেন قرآن শব্দটি قرأ – يقرأ থেকে গঠিত। এর অর্থ জমা করা বা একত্র করা। কুরআনকে এজন্য কুরআন বলা হয় যে এটা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারকথাকে একত্রিত করেছে। পরে অবশ্য তা পাঠ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ পাঠ করার মাধ্যমে শব্দসমূহকে একত্রিত করা হয়।[৯] অপর একদল আলিম বলেন সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআনকে এ জন্য কুরআন নামকরণ করা হয়েছে যে, এটা শুধু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের সারমর্মই নয় বরং পূর্ববর্তী সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারমর্মকে একত্রিত করে দিয়েছে।[১০] স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাও এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ ‘আমি আপনার উপর সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি’।[১১] তিনি আরও বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ ‘আমি কিতাবে কোন কিছুর বর্ণনা বাদ দেইনি’।[১২]

কোন কোন ভাষা বিজ্ঞানী মনে করেন قرآن শব্দটি قرء থেকে গঠিত। তাদের মতে القرأ অর্থ الجمع বা একত্র করা।[১৩] যেমন আরবরা বলে থাকে قرأ المَاءُ فِيْ الحَوْضِ অর্থাৎ হাউজে পানি জমা করা হয়েছে। কেননা এ কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সার সংক্ষেপকে জমা করেছে।[১৪] আর এ قرء থেকেই قرية শব্দের উপত্তি। এর অর্থ গ্রাম বা জনপদ, যেখানে কিছু মানুষ বসবাসের জন্য জমায়েত বা সমবেত হয়।[১৫] আবার কারো মতে قرآن শব্দটি قرء বা قرن ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। এর অর্থ একাংশকে

---

৭. আল-কুরআন, ৭৫:১৭-১৮।

৮. মান্না’ ইবনে খলীল আল কাত্তান (মৃ. ১৪২০হি.), ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআ’রিফ, ২য় সংস্করণ ১৪২১ হি., ২০০০ খৃ., খ.০১, পৃ. ১৫-১৬।

৯. রাগিব আল ইস্পাহানি, ***আল মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন***, করাচী, পাকিস্তানঃ নূরমোহাম্মদ কারখানা, পৃ. ৪০২।

১০. মান্না’ ইবনে খলীল আল কাত্তান (মৃ. ১৪২০হি.), ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৬।

১১. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯।

১২. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮।

১৩. মূলঃ আবুল ফযল মাও. আব্দুল হাফিজ বালয়াভী (রহঃ), ***মিছবাহুল লোগাত***, অনুবাদ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকাঃ থানভী লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., পৃষ্ঠা নং ৬৯০।

১৪. সুবহি আস-সালিহ, ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, দারুল ইলম লিল-মালাঈন, ২৪ তম সংস্করণ ২০০০ খৃ., খ.০১, পৃ. ১৯।

১৫. ড. আমীর আবদুল আযীয, ***দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন***, বৈরুতঃ দারুল ফুরকান, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩,

অপরাংশের সাথে যুক্ত করা, জমা করা।[১৬] আল্লামা ইবনুল আসীর (র.) বলেন, আল-কুরআন শব্দের মৌলিক অর্থ হল الجمع। বা একত্র করা। যেহেতু পবিত্র কুরআন বিভিন্ন ঘটনাবলী, আদেশ-নিষেধ, ওয়াদা-ধমকী ইত্যাদিকে একত্র করেছে এছাড়াও এর একটি আয়াতকে অপর আয়াতের সাথে এবং একটি সূরাকে অপর সূরার সাথে বাহ্যিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গভীরভাবে সংযুক্ত করেছে তাই একে القرآن। বলা হয়।[১৭]

ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ একদল আলিমের মতে, কুরআন শব্দটি عَلَمٌ বা কিতাবের নির্ধারিত নাম। এটা اِسْمٌ مُشْتَقٌّ নয়। অর্থাৎ এটা আল্লাহর কিতাবের জন্য নির্ধারিত নাম যেমনিভাবে তাওরাত ও ইঞ্জীল বিশেষ কিতাবের নাম ছিল।[১৮] যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, – بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ অর্থাৎ 'বরং ইহা কুরআন মাজীদ, লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত'। আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) তার নূরুল আনোয়ার গ্রন্থে কিতাবের সংজ্ঞায় যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তিনি লিখেছেন, 'কুরআন শব্দটি যদি কিতাবের নাম হয় আর এটিই প্রসিদ্ধ কথা তাহলে এটি হবে কিতাবের শাব্দিক সংজ্ঞা'।[১৯] এ থেকেও বুঝা যায় যে, কুরআন শব্দটি মূলত কিতাবুল্লাহর নির্দিষ্ট নাম।

পবিত্র কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

কুরআন বিশেষজ্ঞগন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ধরণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (র.) কিতাব তথা পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন- أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة অর্থাৎ কিতাব হলো ঐ কুরআন যা রাসূল (স.) এর উপর অবতীর্ণ, মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ এবং তার থেকে সন্দেহাতীত ভাবে ধারাবাহিক বর্ণনায় বর্ণিত।[২০] আল্লামা তাক্বি উসমানি (দা.) বলেন: المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة অর্থাৎ (কুরআন সেই বাণী) যা রাসূল (স.) এর উপর অবতীর্ন হয়েছে, পাণ্ডুলিপিসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সন্দেহাতীত ভাবে ধারাবাহিক সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।[২১]

---

১৬. মূল: আবুল ফযল মাও. আব্দুল হাফিজ বালয়াভী (রহ:), ***মিছবাহুল লোগাত***, অনুবাদ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯০ ও ৬৯৮।

১৭. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী, ***লিসানুল আরব***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১২৯।

১৮. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী, ***লিসানুল আরব***, বৈরুত: দারু ছাদের, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৪ হি., খ. ১, পৃ. ১২৮; মান্না' ইবনে খলীল আল কাত্তান (মৃ. ১৪২০হি.), ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৬।

১৯. শায়খ আহমদ মুল্লাজিউন (র.), ***নূরুল আনওয়ার***, দেওবন্দ, সাহারানপুর: আশরাফী বুক ডিপো, পৃ. ৭।

২০. শায়খ আহমদ মুল্লাজিউন (র.), ***নূরুল আনওয়ার***, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, প্রকাশ ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৭-৮।

২১. মূল: মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ***উলূমুল কুরআন ও উসূলে তাফসীর***, অনুবাদ: মুফতী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, ঢাকা: আশরাফিয়া বুক হাউজ, পৃ. ১৮, 'আত তালবীহ মা'আত তাওযীহ, ১/২৬, মাতবা'আ মুসতফা আল-বাবী, মিশর' এর সূত্রে বর্ণিত।

কুরআনুল কারীমের একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা হল: **كلام الله المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته** অর্থাৎ কুরআন হল নবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ অলৌকিক বাণী যা মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ, ধারাবাহিক বর্ণনায় বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদাত।[২২] আল্লামা জুরজানী (র.) বলেন কুরআন হল, **هوالمنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة** অর্থাৎ উহা হল যা রাসূল (স.) এর উপর অবতীর্ণ, মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ এবং তাঁর থেকে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক বর্ণনায় বর্ণিত।[২৩] ওলামায়ে কেরাম কিতাবুল্লাহর সংজ্ঞায় বলেন, **كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته**". অর্থাৎ 'কুরআন হল আল্লাহ তা'আলার কালাম যা মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ, যার তিলাওয়াত ইবাদাত'। আলোচ্য সংজ্ঞায় 'কালাম' শব্দটি দুনিয়ার সকল কালামকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর 'আল্লাহ' শব্দটি বলার কারণে মানব, জীন ও পিরিশতাদের কালাম কিতাবের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। আর **المنزل على محمد صلى الله عليه** (মুহাম্মদ স. এর উপর অবতীর্ণ) বলার কারণে পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব যেমন তাওরাত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি কিতাবের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। **المتعبد بتلاوته** (যার তিলাওয়াত ইবাদাত) এ কথা বলার কারণে আহাদ তথা একক বর্ণনায় বর্ণিত আয়াতসমূহ এবং হাদীসে কুদসী বাদ পড়ে গেছে, কেননা একক বর্ণনায় বর্ণিত আয়াতসমূহ এবং হাদীসে কুদসী নামাজে বা অন্য সময় ইবাদাত হিসেবে তিলাওয়াত করা হয় না।[২৪]

আল্লামা যারক্বাশী (র.) বলেন- **فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ لِلْبَيَانِ وَالْإِعْجَازِ** অর্থাৎ কুরআন হল এমন ঐশীবাণী যা মুহাম্মদ (স.) এর উপর বয়ান এবং মুজিযার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।[২৫] মুহাম্মদ আলী আস সাবূনী (র.) বলেন- **هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُعْجِزُ الْمُنَزَّلُ على خَاتَمِ الاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ بِوَاسِطَةِ الْاَمِيْنِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمَكْتُوْبُ فِيْ الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْقُوْلُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ اَلْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَا تِحَةِ اَلْمُخْتَتِمُ بَسُوْرَةِ النَّاسِ** অর্থাৎ কুরআন হল আল্লাহ তা'আলার মুজিযাপূর্ণ বাণী যা সর্বশেষ নবী ও রাসূলের উপর জিবরীল আমীনের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, পাণ্ডুলিপিসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে, ধারাবাহিক বর্ণনায় আমাদের নিকট বর্ণিত হয়ে এসেছে, যার তিলাওয়াত ইবাদাত, যার শুরু সূরা ফাতিহা দিয়ে এবং শেষ সূরা নাস দিয়ে।[২৬]

---

২২. ড. আমির আবদুল আযীয, ***দিরাসাতু ফী উলূমিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪ ; সুবহি আস-সালিহ, ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ. ২১।

২৩. আস সাইয়্যেদ আশ-শরীফ আল জুরজানী, ***আত তা'রীফাত***, করাচী, পাকিস্তান: কাদীমী কুতুবখানা, পৃ. ১২৩।

২৪. মান্না' ইবনে খলীল আল কাত্তান (মৃ. ১৪২০হি.), ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৭।

২৫. আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (র.), ***আল- ইতক্বান ফি উলূমিল কুরআন***, আল-হাইআতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যাহ লিল-কুতুব, প্রকাশ ১৯৭৪ খৃ. ১৩৯৪ হি., খ. ০১, পৃ. ২৭৩।

২৬. শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, ***আত তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন,*** মিশর: দারুস সাবূনী, ২য় সংস্করণ ২০০৩ খৃ., পৃ. ০৭ ।

২য় পরিচ্ছেদ
সূরা হুদের পরিচিতি, নামকরণ ও বিষয়বস্তু

পরিচয়ঃ

'সূরা' (سورة) শব্দটি আরবি শব্দ। এটি একবচন, বহুবচনে سُوَرٌ، سُوْرٌ، سُوَرَاتٌ، سُوْرَاتٌ ইত্যাদি। এর অর্থ কুরআনের সূরা, উচ্চ মর্যাদা, সম্ভ্রান্ত, শ্রেষ্ঠত্ব, চিহ্ন, ইত্যাদি। এখানে 'সূরা' শব্দটি কুরআনের সূরা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[২৭] পরিভাষায় সূরা হল **طائفة من الآيات القرآنية لها بدء ونهاية.** অর্থাৎ সূরা হল আল-কুরআনের কতিপয় আয়াতের সমষ্টি যার শুরু এবং শেষ রয়েছে।[২৮] আর **'হুদ'** হচ্ছে আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আ.) যাকে আদ জাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। 'সূরা হুদ' হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ১১তম সূরা যা ১১তম পারায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ১২৩ এবং রুকূ সংখ্যা ১০। এটি মক্কায় অবতীর্ণ।[২৯] ধারাবাহিকতার দিক থেকে সূরা হুদ পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের মধ্যে ১১তম সূরা, যা সূরা ইউনুসের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।[৩০] সূরা হুদ ঐ সকল সূরার মধ্যে অন্যতম একটি সূরা যেগুলোর মধ্যে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতি আপতিত খোদায়ী আযাব ও গযব সমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন রাসূল (স.) এর কিছু দাড়ি মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন! তখন রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।[৩১] আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন সূরা হুদ মক্কায় অবতীর্ণ তবে ১২, ১৭ এবং ১১৪ নং আয়াত ব্যতীত, কেননা এ আয়াতগুলি মদিনায় অবতীর্ণ। এর মোট আয়াত সংখ্যা ১২৩। এটি সূরা ইউনুস এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।[৩২] আল্লামা হাসান, ইকরামা, আতা এবং জাবির (র.) প্রমুখের মতে সূরা হুদ মক্কায় অবতীর্ণ। তবে ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ক্বাতাদাহ (র.) এর মতে এক আয়াত ব্যতীত, কেননা এর একটি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ।[৩৩]

নামকরণঃ

সূরা হুদের নাম **'হুদ'** রাখা হয়েছে উক্ত সূরার ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০ এবং ৮৯ নাম্বার আয়াত থেকে, কেননা এ আয়াত গুলোতে হুদ শব্দটির উল্লেখ আছে। আর এ শব্দটিকে নিয়েই এ সূরার নামকরণ করা

---

২৭. মূলঃ মাও. আব্দুল হাফিজ বালয়াভী (রহঃ), ***মিছবাহুল লোগাত***, অনুবাদ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪০৪।

২৮. মুহাম্মদ বকর ইসমাঈল, ***দিরাসাতুন ফি উলূমিল কুরআন***, দারুল মানার, ২য় সংস্করণ ১৪১৯ হি., ১৯৯৯ খৃ., পৃ. ৫৬।

২৯. হযরত মাওলানা মুফতী মহাম্মদ শফী (রহঃ), ***তাফসীরে মা'আরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ, কোরআন মুদ্রন প্রকল্প), পৃ. ৬১৯ ।

৩০. www.almstba.com/t255887.html

৩১. ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর, ***তাফসীরে ইবনে কাছীর***, দারু তাইয়্যেবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি., ১৯৯৯ খৃ., খ. ০৪, পৃ. ৩০২; এবং আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত- তিরমিযী, ***জামে আত-তিরমিযী***, বৈরুতঃ দারুল গারব আল-ইসলামী, প্রকাশ ১৯৯৮ খৃ., খ. ০৫, পৃ. ২৫৫।

৩২. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.), ***তাফসীরে কাবীর***, বৈরুতঃ দারু এহয়াইত তোরাছ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২০ হি., খ. ১৭, পৃ. ৩১২।

৩৩. আল্লামা শামসুদ্দীন কুরতুবী (র.), ***তাফসীরে কুরতুবী***, কায়রোঃ দারুল কুতুব আল-মিছরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি., ১৯৬৪ খৃ., খ. ০৯, পৃ. ০১।

হয়েছে সূরা হুদ। এ নিয়মটাকে বলা হয় اسم الكل باسم الجز অর্থাৎ অংশ বিশেষের দ্বারা পূর্ণবস্তুর নাম রাখা। কেননা নামকরণের বিষয়ে একটি সর্বজনবিধিত নিয়ম হল, কোন বিষয়ের নামকরণ তার অংশ বিশেষের দ্বারা করা হয়। যেমন সূরা বাকারার নাম বাকারা রাখা হয়েছে তার ৬৭, ৬৮, ৬৯ এবং ৭১ নম্বর আয়াত থেকে, কেননা উক্ত আয়াত গুলোতে 'বাকারা' শব্দটি উল্লেখ আছে। সে শব্দটিকে নিয়েই উক্ত সূরার নাম সূরা বাকারা রাখা হয়েছে। এমনিভাবে সূরা আলে এমরান এর নামকরণ করা হয়েছে সে সূরার ৩৩ নম্বর আয়াত থেকে, কেননা উক্ত আয়াতে 'আলে এমরান' শব্দটি উল্লেখ আছে। সে শব্দটি নিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আলে এমরান। অথবা কোন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দ্বারা তার নামকরণ করা হয়। যেমন সাহাবীদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন যার হাতদ্বয় তুলনামূলক লম্বা ছিল, যার কারণে তাকে 'যুলইয়াদাইন' বলা হত।[৩৪] এমনিভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর জামার আস্তিন থেকে একদা হঠাৎ করে একটি বিড়াল ছানা বের হয়ে পড়লে মহানবী (স.) তাকে আদর করে 'আবু হুরায়রা' (বিড়াল ছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। তখন থেকে তিনি আবু হুরায়রা নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩৫]

অথবা এ সূরাটির নাম সূরা হুদ রাখার কারণ হল, যেহেতু এ সূরায় বিশেষভাবে হযরত হুদ (আ.) এর ঘটনা এবং তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, সেহেতু এ সূরাকে تسمية الكل باسم الجز হিসেবে সূরা হুদ নামকরণ করা হয়েছে।[৩৬] আবার কেউ কেউ বলেন আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর সাধনা করেছিলেন। তাই এ সূরাকে সূরা হুদ বলে নামকরণ করা হয়েছে।[৩৭]

বিষয়বস্তুঃ

বিষয়বস্তুতে এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার পরিপূরক। গত সূরায় জোর তাগিদ দেয়া হয়েছিল মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার লেনদেনের বিষয়ে যা ছিল করুণানির্ভর। কিন্তু এ সূরায় জোর দেয়া হয়েছে ন্যায়বিচার ও পাপের শাস্তির উপর যখন সকল করুণা প্রত্যাহত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার করুণার বহিঃপ্রকাশ, মানুষের সাথে তার লেনদেন এবং তার দীর্ঘ সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মানুষের অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা ও অহঙ্কারের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং সত্য গ্রহণে কুটিলতার সাথে সাংঘর্ষিক (আয়াত ১-২৪)। জনগণকে আল্লাহর সত্য শিক্ষা দানে নূহ (আ.) এর নিঃসার্থতা এবং নম্রতা তার জাতির লোকদের নিকট যুক্তিহীন কলঙ্করটানো মনে হল ফলে তারা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু তিনি আল্লাহর নির্দেশে নৌকা তৈরি করলেন এবং নিরাপদে ও শান্তিতে রইলেন আর তার দাওয়াত

---

৩৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, দারু তাওক্বিন নাজাত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২হি., ১ম খ., পৃ. ১০৩।

৩৫. ইউসুফ বিন আবদুর রহমান বিন ইউসুফ, ***তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল***, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, খ. ৩৪, পৃ. ৩৬৬।

৩৬. মূল: আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.), ***তাফসীরে জালালাইন***, অনুবাদ: মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম, ***তাফসীরে জালালাইন আরবী- বাংলা***, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ইসলামিয়া কুতুবখানা, খ. ০৩, পৃ. ১৬২; আবুল হাসান মুকাতিল আল-বলখী, ***তাফসীরে মুকাতিল***, বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ, প্রথম সংস্করণ ১৪২৩ হি., খ. ০২, পৃ. ২৬৯।

৩৭. সূরা হুদের নামকরণ, www.almstba.com/t255887.html

প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল (২৫-৪৯)। নবী হুদ (আ.) তার জনগণকে মিথ্যা দেবতাদের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিলেন এবং নবী সালিহ (আ.) সামূদ জাতিকে আল্লাহর নিদর্শনকে অসম্মানের বিরুদ্ধে আহবান জানালেন। কিন্তু উভয় জাতির ক্ষেত্রেই আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস হয়েছিল (৫০-৬৮)। লূত জাতিকে জঘন্য ও কদর্য বিষয়াদি দেয়া হয়েছিল। ইবরাহীম (আ.) তাদের জন্য মিনতি করেছিলেন এবং লূত (আ.) কে তাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা পাপকাজে গভীর থেকে গভীরে ডুবে গিয়েছিল এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (৬৯-৯৫)। শু'আইব (আ.) তার জাতি মাদায়েনবাসীকে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অপকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কিন্তু তারা তাকে অসহযোগিতা ও নিন্দা করল এবং ধ্বংস হয়ে গেল। ফিরআউনের মত অহঙ্কারী নেতারা যারা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করত এবং মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক এবং পাপের শাস্তি যথার্থ ও চিরস্থায়ী। সুতরাং সকল পাপকার্য পরিহার কর এবং সম্পূর্ণ অকপটে আল্লাহ তা'আলার কাজ কর (৯৬-১২৩)।[৩৮] মোটকথা আলোচ্য সূরায় পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত খোদায়ী আযাব ও গযব, কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

৩য় পরিচ্ছেদ
সূরা হুদ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে একমাত্র তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করে এবং তারই নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নবীর আদেশ মান্য কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক। অন্য সকল কিছুর ইবাদাত বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা কর। এরই উপর গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সূরা হুদ অবতীর্ণ করে এতে নূহ (আ.) এর জাতি, আদ ও সামূদ জাতি, লূত (আ.) এর জাতি, মাদইয়ানবাসী ও ফিরআউনের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের করুন কাহিনী বর্ণনা করে উম্মতে মুহাম্মদীকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, দেখ তোমাদের পূর্ববর্তী খোদাদ্রোহী জাতিদের পরিণাম কী হয়েছিল। তারা নবীদেরকে অমান্য করে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তোমরা এর থেকে উপদেশ হাসিল করে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা কর; অন্যথায় তোমাদের ধ্বংসও সেরকম অনিবার্য। তোমাদেরকে এ দুনিয়ায় অবকাশ দেয়া হচ্ছে মাত্র।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। আর এ হিদায়াতকে নিশ্চিত করার জন্য তিনি পবিত্র কুরআনে প্রধানত তিন ধরণের ইলমের বর্ণনা দিয়েছেন। ১. علم التوحيد তথা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান ২. علم الأحكام তথা বিধি-বিধানের জ্ঞান ৩. علم التذكير তথা নসীহত করণ। এদের মধ্যে ৩য় প্রকারের ইলম অর্থাৎ ইলমুত তাযকীর

---

[৩৮]. ABDULLAH YUSUF ALI, ***THE HOLY QUR-AN, (Text, Translation and commentary)***, COPYRIGHTED 1946 BY KHALIL Al-RAWAF, PRINTED IN THE UNITED STATES BY MCGREGOR & WERNER, INC. VOLUME ONE, P. 513.

আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. التذكير بآلاء الله (আল্লাহর নিয়ামত সমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান) ২. التذكير بأيام الله (অতীতকালীন ঘটনাবলী দ্বারা উপদেশ প্রদান) ৩. التذكير بما بعد الموت (মৃত্যুর পর কী হবে তা দ্বারা উপদেশ প্রদান)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাওহীদের উপর নিয়ে আসার জন্য এবং তার বিধি-বিধান পালনে উৎসাহিত করার জন্য পবিত্র কুরআনে এ তিন ধরনের নসীহত করেছেন। সূরা হুদ এ তিন প্রকার নসীহতের মধ্যে ২য় প্রকারের নসীহত তথা التذكير بأيام الله (অতীতকালীন ঘটনাবলী দ্বারা উপদেশ প্রদান) এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এ সুরায় মহান আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.) এর জাতি, আ'দ জাতি, সামূদ জাতি, লূত (আ.) এর জাতি, মাদায়েনবাসী ও ফিরআউনের গোষ্ঠীর অবাধ্যতা এবং পৃথিবীতে তাদের করুণ পরিণতি ও ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করে তাতে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ বিষয়ের উপর সতর্ক করাই মূল উদ্দেশ্য যে, তোমরা এদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যদি তোমরা তাওহীদের উপর অবিচল থেকে বিধি-বিধান মেনে না চল তাহলে তোমাদের অবস্থাও তাদের মতই হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাদের কাহিনী বর্ণনা করার পর বলেছেন فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ অর্থাৎ হে জ্ঞানবান লোকসকল! তোমরা উপদেশ হাসিল কর।[৩৯]

পরিপূর্ণ সূরা হিসেবে পবিত্র কুরআনের সূরা হুদের কোন শানে নুযূল বর্ণিত হয়নি, যেমন কিছু কিছু সূরার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সূরার শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূরার বিশেষ দুটি আয়াতের শানে নুযূল বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। একটি ৫ নং আয়াতের, এ আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে বিশেষ করে আখনাস বিন শুরাইক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ছিল অত্যন্ত মিষ্টিভাষী ও কৌশলী। সে মহানবী (স.) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তার সাথে সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করত এবং অত্যন্ত কৌশলে কথা বলত কিন্তু অন্তরে মহানবী (স.) এবং মুমিনদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। অপরটি ১১৪ নং আয়াতের, এর শানে নুযূল সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে চুমু দিয়ে তার মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি হল অতঃপর সে তওবা করার উদ্দেশ্যে রাসূল (স.) এর নিকট গিয়ে বিষয়টি জানালে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর লোকটি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল! এ বিধানটি কি শুধু আমার জন্য? তখন রাসূল (স.) বললেন, না এটি আমার সকল উম্মতের জন্য।[৪০]

তাফসীরে মুকাতিল এর টীকায় আল্লামা আবদুল্লাহ মাহমুদ শাহাতাহ বলেন, সূরা হুদ অবতীর্ণের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য হল কুরআনুল কারীমের হাকীকত বর্ণনা করা, সমস্ত মাখলুকাতের উপর আল্লাহ তা'আলার হক কী তা জানান দেয়া, সমস্ত প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার তা জানিয়ে দেয়া। আরশ সৃষ্টি ও ইহার প্রাথমিক অবস্থা, কাফিরদের কথা ও অবস্থার তারতম্য জানিয়ে দেয়া, রাসূল (স.) কতৃক আরবদেরকে কুরআনের মত একটি গ্রন্থ আনয়ণের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া, পরকাল বিমুখ দুনিয়া অন্বেষণকারীদের নিন্দাকরা, অত্যাচারীদেরকে অভিসম্পাত করা, কাফির ও ঈমানদারগণের কাহিনী বর্ণনা করা, নূহ (আ.) ও তার তুফানের কাহিনী, হুদ (আ.) এর ঘটনা ও আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী,

---

৩৯. আল-কুরআন, ৫৯:২।

৪০. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১১, হাদিস নং ৫২৬।

সালেহ (আ.) ও সামূদ জাতির কাহিনী বর্ণনা করা, ইবরাহীম (আ.) ও সারাহ (আ.) কে ইসহাক (আ.) এর সুসংবাদ প্রদানের কথা জানিয়ে দেয়া, লূত (আ.) এর ঘটনা ও তার জাতির ধ্বংসের কাহিনী, শুআইব (আ.) এর আলোচনা ও জাতির সাথে তার বাক-বিতণ্ডার বর্ণনা দেয়া, মূসা (আ.) ও ফিরআউনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা, কিয়ামতের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া, জান্নাত ও জাহান্নাম এ দুই পথের পথিকদের বিস্তারিত আলোচনা করা, রাসূল (স.) কে ইস্তেকামাতের নির্দেশ প্রদান করা, অত্যাচারী ও পথভ্রষ্টদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেয়া, রাসূল (স.) এর অন্তরের স্থিতির জন্য পূর্ববর্তী রাসূলগণের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়া এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা।[৪১]

৪র্থ পরিচ্ছেদ
অভিশপ্ত জাতির পরিচয়

'অভিশপ্ত' শব্দটি (Adjective) বিশেষণ পদ। এটি পুংলিঙ্গ, এর স্ত্রীলিঙ্গ হল অভিশপ্তা। অভিশপ্ত শব্দের অর্থ হল বিনষ্ট, বিপর্যস্ত, অধ:পতিত, ক্ষতিগ্রস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, অভিসম্পাতপ্রাপ্ত, যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে এমন ইত্যাদি। যাকে আরবিতে বলে **لَعِيْنٌ - مَلْعُوْنٌ -لُعْنَةٌ- مَشْئُوْمٌ - مَنْحُوْسٌ - رَجِيْمٌ - قَارِسٌ- هَالِكٌ - خَرَابٌ - مَغْضُوْبٌ - مُدْمَرٌ- فنَاءٌ - انْحِطَاطٌ**।[৪২] আর ইংরেজীতে বলা হয় Cursed, Accursed, Accurst, Execrable, Destroyed, Annihilated, wrecked, ruined, blasted, tumbledown ইত্যাদি।[৪৩] পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত অর্থে **مَغْضُوب** শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ অর্থাৎ তাদের পথ প্রদর্শন করুন, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদের পথ নয় যারা 'অভিশপ্ত' এবং পথভ্রষ্ট।[৪৪] এখানে **مغضوب** শব্দের অর্থ 'অভিশপ্ত'। যদিও এখানে "ال" দ্বারা নির্দিষ্ট করে বিশেষত অভিশপ্ত ইহুদী জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত ইবলীসকে সম্বোধন করে رَجِيمٌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তিনি বলেন, قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ তিনি বলেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও কেননা তুমি 'অভিশপ্ত'। আর তোমার উপর কিয়ামত পর্যন্ত 'অভিসম্পাত'।[৪৫] আল্লাহ

---

৪১. আবুল হাসান মুকাতিল বিন সুলায়মান আল-বলখী, ***তাফসীরে মুকাতিল(টীকা),*** বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ, ১ম প্রকাশ ১৪২৩ হিজরী, খ. ০২, পৃ. ২৬৯।

৪২. আবু তাহের মেসবাহ, ***আল-মানার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান***, চকবাজার, ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রকাশ ১৯৯০ খৃ., পৃ. ৬৪,৭৯২; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আরবী- বাংলা ব্যবহারিক অভিধান [আল- ক্বামূসুল ওয়াজীয],*** ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, চতুর্দশ সংস্করণ: জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ৬৩০; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ***আলকাওসার আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান,*** বংলাবাজার, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ৭ম সংস্করণ মার্চ ১৯৯৭, যিলকদ-১৪১৭, পৃ. ৪৭৫।

৪৩. A. T. DEV'S, ***STUDENTS FAVOURITE DICTIONARY (BENG. TO ENG.),*** BANGLA BAZAR, DHAKA, PROGATI COMPUTER & PUBLISHER, NEW ADDITION 2002, P. 86.

৪৪. আল-কুরআন, ১:৬।

৪৫. আল-কুরআন, ১৫ : ৩৪-৩৫ ও ৩৮ : ৭৭-৭৮।

তা'আলা অভিশপ্ত আদ জাতি এবং ফিরআউনের জাতি সম্পর্কে বলেছেন, وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ এ জগতেও তাদের পেছনে রয়েছে 'অভিসম্পাত' এবং পরকালেও।[৪৬] অর্থাৎ তাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই বিনষ্ট এবং ধ্বংস। এছাড়াও একই অর্থে পবিত্র কুরআনে هلاك শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ ডেকো না, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত সব কিছুই 'ধ্বংস' হয়ে যাবে। রাজত্ব তারই এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৪৭] আবার একই অর্থে পবিত্র কুরআনে فناء শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটি 'ধ্বংস' হয়ে যাবে।

'জাতি' শব্দটি একবচন, বহুবচনে জাতিসমূহ। জাতি শব্দের অর্থ হল বংশ, গোত্র, দল, জনগণ, লোকজন, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি। আরবিতে বলা হয় – قوم – امة – شعب – ملة – جنس – طائفة বহুবচনে اقوام – امم – شعوب – ملل – اجناس – طوائف ইত্যাদি। আর ইংরেজীতে বলা হয় - Nation, caste, lineage, tribe, species, kind ইত্যাদি।[৪৮] পবিত্র কুরআনে জাতি অর্থে قوم শব্দটির প্রায়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ অর্থাৎ স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন হযরত মূসা (আ.) তার 'জাতি'কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তওবা কর।[৪৯] এমনিভাবে জাতি অর্থে شعب শব্দটির প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একটি মাত্র পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন 'জাতি' ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।[৫০] আরার জাতি অর্থে امة শব্দটির প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ অর্থাৎ তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।[৫১] এমনিভাবে জাতি অর্থে ملة শব্দটির প্রয়োগও লক্ষ্য করা

---

৪৬. আল-কুরআন, ১১ : ৬০ ও ৯৯।

৪৭. আল-কুরআন, ২৮ : ৮৮।

৪৮. A. T. DEV'S, ***STUDENTS FAVOURITE DICTIONARY(BENG. TO ENG.),*** BANGLA BAZAR, DHAKA: PROGATI COMPUTER & PUBLISHER, NEW ADDITION 2002, P. 404.

৪৯. আল-কুরআন, ২:৫৪ সহ মোট ১১৮বার।

৫০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩।

৫১. আল-কুরআন, ৩ : ১১০ সহ মোট ৫০ বার

যায়। যেমন مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ তোমাদের 'জাতি'র পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.), তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান।[৫২] এমনিভাবে طَائِفَةٌ শব্দটির প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ অর্থাৎ প্রত্যেক বড় জনগোষ্ঠী থেকে ছোট একটি দল কেন এ উদ্দেশ্যে বের হয় না, যে তারা দ্বীনের বুঝ অর্জন করবে এবং ফিরে এসে তাদের জাতিকে সতর্ক করবে।[৫৩]

পরিভাষায় জাতি হল: القوم الجماعة من الناس تجمعهم جامعة يقومون لها وقوم الرجل أقاربه عصبية ومن يكونون بمنزلتهم تبعا له অর্থাৎ জাতি হল এমন মানবগোষ্ঠী যাদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠাতা সুসংগঠিত করে দেয়, আর ব্যক্তির গোষ্ঠী হল তার নিকটাত্মীয় এবং যারা তার অনুগামী হয়ে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।[৫৪] তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে- الْقَوْمُ: الْجَمَاعَةُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى" لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ" [الحجرات: ١١] ثم قال" وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ"وَقَالَ تَعَالَى:" وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ" [الأعراف: ٨٠] أَرَادَ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ. وَقَدْ يَقَعُ الْقَوْمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى" إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ" [نوح: ١] وَكَذَا كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ إِلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا অর্থাৎ জাতি হচ্ছে পুরুষদের দল; মহিলাদের দল নহে, যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা হুজুরাতে বলেন, "কোন قَوْمٌ (দল) যেন অপর قَوْمٌ কে তিরস্কার না করে এবং কোন নারী যেন অপর নারীকে তিরস্কার না করে"। এখানে আল্লাহ তা'আলা قَوْمٌ (দল) এর বিপরীতে (نساء) 'নারী' ব্যবহার করেছেন, তাতে বুঝা যায় যে, قَوْمٌ (দল) বলতে শুধু পুরুষকে বুঝায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফে বলেন, "স্মরণ কর লূত (আ.) এর কথা যখন তিনি তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন" এখানে জাতি বলে শুধু পুরুষদের উদ্দেশ্য করেছেন, মহিলাদেরকে নয়। আবার কখনও কখনও قَوْمٌ (দল) বলে নারী এবং পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা নূহে বলেন, "নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি"। এখানে জাতি বলতে পুরুষ এবং নারী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে প্রত্যেক নবী নারী-পুরুষ সকলের প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন।

লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন,

والقَوْمُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، وَقِيلَ: هُوَ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ، ويُقوِّي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ ؛ أَي رِجَالٌ مِنْ رِجَالٍ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِساء، فَلَوْ كَانَتِ النِّسَاءُ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يَقُلْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ؛ وقَوْمُ كُلِّ رَجُلٍ: شِيعته

---

[৫২]. আল-কুরআন, ২২:৭৮ সহ মোট ৯ বার।

[৫৩]. আল-কুরআন, ৯:১২২।

[৫৪]. ইবরাহীম মোস্তফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ: কুতুবখানায়ে হুসাইনিয়া, প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩ খৃ., পৃ. ৭৬৮।

وَعَشِيرَتُهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ: النَّفَرُ والقَوْم والرَّهط هؤُلاء مَعْنَاهُمُ الْجَمْعُ لَا وَاحِدَ لَهُمْ مِنْ لَفْظِهِمْ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. قَالَ ابْنُ الأَثير: القَوْم فِي الأَصل مَصْدَرُ قَامَ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النساء، ولذلك قابلهن بِهِ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ لأَنهم قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بالأُمور الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَن يُقِمْنَ بِهَا. الْجَوْهَرِيُّ: القَوْم الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ النِّسَاءُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ لأَن قَوْمَ كُلِّ نَبِيٍّ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، والقَوْم يُذَكَّرُ ويؤَنث، لأَن أَسماء الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إِذَا كَانَتْ لِلْآدَمِيِّينَ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ مِثْلَ رَهْطٍ وَنَفَرٍ وقَوْم، قَالَ تَعَالَى: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، فذكّر، وَقَالَ تَعَالَى: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ، فأَنّث.

অর্থাৎ জাতি হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের দলের সমষ্টি। আবার কেউ কেউ বলেন, জাতি বলতে শুধু নারীর দলকে বুঝায়; পুরুষের দলকে নয়। যার স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে, তিনি বলেন, "কোন قَوْمٌ (দল) যেন অপর قَوْمٌ কে তিরস্কার না করে এবং কোন নারী (نساء) যেন অপর নারীকে তিরস্কার না করে"।[৫৫] এখানে আল্লাহ তা'আলা قَوْمٌ (দল) এর বিপরীতে 'নারী' (نساء) ব্যবহার করেছেন, তাতে বুঝা যায় যে, قَوْمٌ (দল) বলতে শুধু পুরুষকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে তিরস্কার না করে এবং কোন নারী যেন অপর নারীকে তিরস্কার না করে। এখানে যদি قَوْمٌ (দল) এর মধ্যে নারী অন্তর্ভুক্ত থাকত তাহলে আল্লাহ তা'আলা আলাদা করে وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ বলতেন না। আর প্রত্যেক ব্যক্তির কাওম হচ্ছে তার দল ও গোষ্ঠী। আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) বলেন, قوم শব্দটি মূলত قام শব্দের মাসদার। তারপর উহা পুরুষদের জন্য প্রবলভাবে ব্যবহার হতে থাকে; নারীদের জন্য নয়। আর পুরুষদের জন্য কাওম শব্দটি এজন্য ব্যবহার হতে থাকে যে, তারা নারীদের এমন সব বিষয়ের দায়িত্বশীল যেগুলি নারীগন সম্পাদন করতে পারে না। আল্লামা জাওহারী বলেন, কাওম বলতে পুরুষকে বুঝায়; নারীকে নয়। আর এটি অর্থগত বহুবচন, এর শব্দগত একবচন নেই। তবে কখনও কখনও পুরুষদের সাথে অনুগামী হিসেবে এর মধ্যে নারীগণ অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা প্রত্যেক নবীর জাতি বলতে নারী-পুরুষ উভয়ই উদ্দেশ্য। আর এটি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেননা ইসমে জমার শব্দগুলি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার হয় তখন সেগুলি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ এ আয়াতে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ এ আয়াতে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে।[৫৬]

মোটকথা অভিশপ্ত জাতি বলতে পৃথিবীর ঐ সমস্ত জাতিকে বুঝায় যারা যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। আর এ সকল নিয়ামত ও প্রভাব প্রতিপত্তি পাওয়ার পর তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, তার বিধি-বিধান মেনে চলা। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বকে অস্বীকার

[৫৫]. আল-কুরআন, ৪৯:১১।

[৫৬]. মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু ছাদির, ৩য় সংস্করণ ১৪১৪ হি., খ. ১২, পৃ. ৫০৫।

করে দাম্ভিক ও অহংকারী হয়ে উঠে। নীতি নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বকে ভুলে গিয়ে তারা পশুত্বের বৈশিষ্ট্যে মেতে উঠে। আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। নবী রাসূলগণ দিবা-নিশি তাদের কে হিদায়াতের পথে অহবান জানাতে থাকেন। কিন্তু তারা নবী রাসুলগণের অহবানে সাড়া না দিয়ে তাদের পশুত্ব চরিত্রের বহি:প্রকাশ ঘটাতেই থাকে। আর তখনি আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আসমানী আযাব ও গযব নাযিল করেন। এভাবেই সে সকল প্রতাপান্বিত জাতি-গোষ্ঠী পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। এখানে অভিশপ্ত জাতি বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

৫ম পরিচ্ছেদ
অভিশপ্তের কারণ ও পূর্ব সতর্কীকরণ

পৃথিবীতে যত বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত ও ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় তার সবই মানুষের কৃতকর্মের ফসল। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ জলে এবং স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কৃতকর্মের কারণে, যেন তিনি তাদের কতিপয় কাজের ফল আস্বাদন করাতে পারেন, যাতে তারা ফিরে আসে।[৫৭] অর্থাৎ মানুষ নিজে তার অপকর্মের কারণে বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয় এবং স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্যান্য মাখলূকাতও মানুষের কৃতকর্মের কারণেই বিপর্যয়ে পর্যবষিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা সাধারণত ছোটোখাটো কোন অপরাধে কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেন না; বরং তাদের অন্যায়, অপরাধ এবং নাফরমানী যখন সীমালঙ্ঘনের চরম শিখরে পৌঁছে যায় এবং নবী-রাসূল ও দ্বীনের দাঈগণের দ্বারা তাদেরকে বারবার সতর্ক করার পরেও যখন তারা হিদায়াতের পথে না আসে, ঠিক তখনি আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে চুড়ান্ত ফয়সালা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সাধারণত যে সমস্ত কারণে কোন জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল 'জুলুম' বা অত্যাচার, যা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে।[৫৮] দ্বিতীয়টি হল আল্লাহ তা'আলা ও তার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।[৫৯] তৃতীয় নম্বর হল শিরক।[৬০] চতুর্থ নম্বর হল আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা, পঞ্চম নম্বর হল নবীদেরকে হত্যা করা, ৬ষ্ঠ নম্বর হল নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন করা।[৬১] ৭ম নম্বর হল আল্লাহ, তার পিরিশতাগণ ও তার রাসূলগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করা[৬২] ইত্যাদি।

---

[৫৭]. আল-কুরআন, ৩০: ৪১।
[৫৮]. আল-কুরআন, ২৮:৫৯; ১৮:৫৯; ১১:১০২।
[৫৯]. আল-কুরআন, ৩:১৩৭; ৬:১১; ১৬:৩৬; ৪৩:২৫; ৫৬:৯২।
[৬০]. আল-কুরআন, ০৪: ৪৮, ১১৬; ০৫:৭২; ২২:৩১।
[৬১]. আল-কুরআন, ০২: ৬১; ০৩:১১২; ০৫:৭৮; ৭২:৭২।
[৬২]. আল-কুরআন, ০২: ৯৮।

পাপকাজ সাধারণত দুই ধরণের। ১. কবীরা গুনাহ বা বড় পাপ ২. সগীরা গুনাহ বা ছোট পাপ। বান্দার কর্তব্য হল সকল প্রকার গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। তবে মানুষ মাত্রই ভুল। তাদের থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু গুনাহ হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই বান্দাহ যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলা অনিচ্ছা সত্ত্বে ঘটে যাওয়া সগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا অর্থাৎ তোমরা যদি নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাক তবে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানিত প্রবেশস্থলে প্রবেশ করাব।[৬৩] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে ছোট গুনাহ ছাড়া, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা ছোটোখাটো গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৬৪] কবীরা গুনাহ আবার দুই ধরণের হক বিনষ্ট করার কারনে হতে পারে। এক. আল্লাহ তা'আলার হক বিনষ্ট করার কারণে। দুই. বান্দার হক বিনষ্ট করার কারণে। বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার হকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া কবীরা গুণাহসমূহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হক বিনষ্ট করার কারণে সংঘটিত হওয়া কবীরা গুণাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা কাউকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না সে বান্দার হক আদায় করে দেয় অথবা ঐ বান্দা তাকে ক্ষমা করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তার নিজের হক বিনষ্ট করার কারণে সাধারণত কোন জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেন না; বরং সাথে সাথে তারা যখন বান্দার হকও বিনষ্ট করে, মানুষের উপর জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার করে, দ্বীনের দাঈদের উপর নির্যাতন করে এমনকি তাদের নিষ্ঠুরতা যখন চরম সীমায় পৌঁছে যায় ঠিক তখনি আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস অনিবার্য করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا অর্থাৎ তোমাদের কী হল? যে তোমরা দুর্বল নারী পুরুষ ও শিশুদের রক্ষার জন্য আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না, যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ অত্যাচারী জনপদ থেকে বের করে নিন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।[৬৫] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অত্যাচার করাতো দূরের কথা বরং অত্যাচারিতদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (স.) বলেন, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وفي رواية وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَين الله حجاب অর্থাৎ তিন ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল

[৬৩]. আল-কুরআন, ০৪: ৩১।
[৬৪]. আল-কুরআন, ৫৩:৩২।
[৬৫]. আল-কুরআন, ৪:৭৫।

হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এক. পিতা মাতার প্রার্থনা। দুই. মুসাফিরের প্রার্থনা। তিন. মাযলূম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রার্থনা। অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি মাযলূমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাক, কেননা তার আর্তচিৎকার আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না; বরং তা সরাসরি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।[৬৬]

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তখন সাধারণত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকারের আযাব দিয়ে থাকেন। ১. যা উপরের দিক থেকে আসে। ২. যা নিচের দিক থেকে আসে। ৩. বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মুখোমুখি করে একাংশকে অপর অংশ দ্বারা শাস্তি দেয়া। যা উপরের দিক থেকে আসে তার উদাহরণ হল: আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর জাতিকে উপরের দিক থেকে অনবরত বৃষ্টি অবতরণের মাধ্যমে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন, আদ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্জা দিয়েছিলেন উপরের দিক থেকে, হযরত লূত (আ.) এর জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন উপরের দিক থেকে শিলাবৃষ্টি দিয়ে, আবরাহার হস্তীবাহিনী যখন পবিত্র কা'বা ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল তখন উপর থেকে পক্ষীকূলের মাধ্যমে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধবংস করে দিয়েছিলেন। নিচের দিক থেকে আযাব আসার উদাহরণ হল: নূহ (আ.) এর প্লাবনের পানি উপরের দিক থেকে বৃষ্টি আকারে যেমন এসেছিল সাথে সাথে যমীনের নিচ থেকেও পানি উথলে উঠেছিল, এমনকি পবিত্র কুরআনে প্লাবনের পূর্বাভাষও বলে দেয়া হয়েছে যে চুলার তলদেশ থেকে পানি উথলে উঠবে। এছাড়াও কারূন তার ধনভাণ্ডারসহ মাটি সরে গিয়ে নিচের দিকে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। দল-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মুখোমুখি করে একাংশকে অপর অংশ দ্বারা শাস্তি দেয়ার উদাহরণ হল, যেমন রাসূল (স.) এর জন্মের পূর্বে আরবে গোত্রে গোত্রে কলহ বিবাদ লেগেই থাকত। এছাড়া ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ, বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দল উপদলে বিভক্ত করে পরস্পর মুখোমুখি করে দিবেন এবং এক কে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। আপনি লক্ষ্য করুন, কিভাবে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলীকে বর্ণনা করে থাকি, যেন তারা অনুধাবন করতে পারে।[৬৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, আমি আমার পালনকর্তার কাছে ৩টি বিষয়ে প্রার্থনা করেছি। ১.আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা আমার এ দু'আ কবুল করেছেন। ২. আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা আমার এ দু'আও কবুল করেছেন। ৩. আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত না হয়। আমাকে এরূপ দু'আ

---

৬৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওয়ালী উদ্দীন আত তিবরীযী, ***মিশকাতুল মাসাবীহ,*** বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৫ খৃ., খ. ০২, পৃ. ৬৯৫, হাদিস নং ২২৫০।

৬৭. আল-কুরআন, ৬:৬৫।

করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৬৮] তাতে বুঝা গেল উম্মতে মুহাম্মদী আকস্মিক আসমানী আযাব ও গযবে ধ্বংস না হলেও তাদের নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দলীয় সংঘর্ষ চলতে থাকবে। তাই পবিত্র কুরআনে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৬৯] এছাড়াও রাসূল (স.) উম্মতকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তবে আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকেই সতর্ক করা ব্যতীত ধ্বংস করেন না। নবী-রাসূলগণের দ্বারা বারবার সতর্ক করার পরেও যখন তারা অবাধ্যতা পোষণ করতে থাকে; জুলুম-নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘন করতে থাকে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। যেন তারা পরকালে এই অভিযোগ করতে না পারে যে, আমাদের নিকট কোন নবী-রাসূল/সতর্ককারী আসেনি। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ অর্থাৎ উহা এ কারণে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদকে কোন অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করার নন অথচ তার অধিবাসীরা সে সম্পর্কে গাফেল থাকে।[৭০] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক কোন জনপদকে ধ্বংসকারী নন, যতক্ষণ না তিনি তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনান, আর আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি না যতক্ষণ না তার অধিবাসীরা জালিম হয়।[৭১] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ অর্থাৎ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জনপদে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দিয়েছেন। আবার তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যাদের উপর গোমরাহী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব তোমরা যমীনে ভ্রমন কর এবং লক্ষ কর মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল?[৭২] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরন করেছি। আর এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।[৭৩]

---

৬৮. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২২১৬, হাদীস নং ২৮৯০।

৬৯. আল-কুরআন, ০৩ : ১০৩।

৭০. আল-কুরআন, ৬ : ১৩১।

৭১. আল-কুরআন, ২৮ : ৫৯।

৭২. আল-কুরআন, ১৬ : ৩৬।

৭৩. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৪।

অতএব বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে ধ্বংস করার পূর্বে তাদের প্রতি নবী/রাসূলগণের মাধ্যমে সতর্কবাণী পাঠান। নবী রাসূলগণ তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার পরিহার করতে বলেন যেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পায় এবং পরকালে আর কোন অভিযোগ পেশ করতে না পারে যে আমরা অজ্ঞ ছিলাম, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেনি। আর প্রত্যেক নবী রাসূলই উম্মতকে এ কথা বলে দাওয়াত দিতেন يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা কি মুত্তাকী হবে না?[৭৪]

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
সূরা হুদে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিসমূহের সংখ্যা ও পরিচয়

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে প্রধানত ৬টি জাতির অভিশপ্ত ও ধ্বংস হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ ছয়টি জাতি হল:

১. হযরত নূহ (আ.) এর জাতি। আল-কুরআনের সূরা হুদের ২৫-৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) ও তার জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৭৫]

২. আদ জাতি। এরা হল হযরত হুদ (আ.) এর জাতি। সূরা হুদের ৫০-৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত হুদ (আ.) ও তার জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৭৬]

৩. সামূদ জাতি। এরা হল হযরত সালেহ (আ.) এর জাতি। সূরা হুদের ৬১-৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.) ও তার জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৭৭]

৪. হযরত লূত (আ.) এর জাতি। ইতিহাসে এরা সাদূমবাসী হিসেবে পরিচিত। সূরা হুদের ৬৯-৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.) ও তার জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৭৮]

---

৭৪. আল-কুরআন, ৭:৬৫; অনুরূপ ২১:২৫।

৭৫. এছাড়াও আল-কুরআন, ৩:৩৩-৩৪; ৪:১৬৩; ৬:৮৪; ৭:৫৯-৬৪; ৯:৭০; ১০:৭১; ১৪:৯; ১৭:৩ ও ১৭, ১৯:৫৮; ২১:৭৬-৭৭; ২২:৪২; ২৩:২৩-৩০; ২৪:৩৭; ২৬:১০৫-১২২; ২৯:১৪-১৫; ৩৩:০৭; ৩৭:৭৫-৮৩; ৩৮:১২; ৪০:৫ ও ৩১, ৪২:১৩; ৫০:১২-১৪; ৫১:৪৬; ৫৩:৫২; ৫৪:৯-১৬; ৫৭:২৬; ৬৬:১০; ৭১:০১-২৮ এ নূহ (আ.) ও তার জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭৬. এছাড়াও আল-কুরআন, ৭:৬৫-৭২; ২৩:৩১-৪২; ২৬:১২৩-১৪০; ৪১:১৫-১৬; ৪৬:২১-২৬; ৫১:৪১-৪২; ৫৪:১৮-২১; ৬৯:৬-৮; ৮৯:৬-৮ এ হুদ (আ.) ও তার জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭৭. আল-কুরআন, ৭:৭৩-৭৯; ১৫:৮০-৮৪; ১৭:৫৯; ২৬:১৪১-১৫৯; ২৭:৪৫-৫৩; ৪১:১৬-১৭; ৫১:৪৩-৪৫; ৫৪:২৩-৩১; ৬৯:৪-৫; ৯১:১১-১৫ এ সালেহ (আ.) ও তার জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭৮. এছাড়াও আল-কুরআন ৭:৮০-৮৪; ১৫:৫১-৭৭; ২১:৫১-৭৫; ২২:৪২-৪৩; ২৫:৪০; ২৬:১৬০-১৭৫; ২৭:৫৪-৫৮; ২৯:২৬-৩৫; ৩৭:১৩৩-১৩৮; ৩৮:১৩; ৫০:১৩-১৪; ৫১:২৪-৩৭; ৫৩:৫৩-৫৪; ৫৪:৩৩-৩৮; ৬৬:১০ এ লূত (আ.) ও তার জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৫. আসহাবে মাদইয়ান। এরা হল হযরত শোআইব (আ.) এর জাতি। সূরা হুদের ৮৪-৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.) ও তার জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৭৯]

৬. ফিরআউনের জাতি। তার জাতির নাম ছিল কিবতী। এদের প্রতি হযরত মূসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। মূসা (আ.) এর জাতির নাম ছিল বনী ইসরাঈল। সূরা হুদের ৯৬-৯৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.) ও তার জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৮০]

---

[৭৯]. এছাড়াও আল-কুরআন ৭:৮৫-৯৩; ৯:৭০; ২৬:১৭৬-১৯১; ২৮:২২-২৭; ২৯:৩৬-৩৭; ৩৮:১৩; ৫০:১৪ এ শু'আইব (আ.) ও তার জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

[৮০]. এছাড়াও আল-কুরআন ২:৪৭-৭৫; ৭:১০৩-১৫৭ ও ১৫৯-১৭১; ১২:৭৫-৯৩; ১৪:৫-৮; ১৭:১০১-১০৪; ২০:৯-৯৮; ২৩:৪৫-৪৯; ২৫:৩৫-৩৬; ২৬:১০-৬৬; ২৭:০৭-১৪; ২৮:০৩-৪৮; ২৯:৩৯-৪০; ৩৭:১১৪-১২২; ৪০:২৩-৪৬; ৪৩:৪৬-৫৬; ৪৪:১৭-৩৩; ৫১:৩৮-৪০; ৫৪:৪১-৫৫; ৬৯:৯-১০; ৭৩:১৫-১৬; ৭৯:১৫-২৫; ৮৯:১০-১৩ এ ফিরআউনের জাতি, মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নূহ (আ.) এর জাতি ও প্রলয়ংকরী মহাপ্লাবন

১ম পরিচ্ছেদ
নূহ (আ.) এর জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান

নূহ শব্দের অর্থ ক্রন্দন করা। যেহেতু নূহ (আ.) অধিক ক্রন্দন করতেন তাই তাকে নূহ নামে নামকরণ করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম আবদুল গাফ্ফার। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ইয়াশকুর।[৮১] আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল জাব্বার। তাকে নূহ নামে নামকরণ করা হয় এ জন্য যে, তিনি তার উম্মতের গুণাহের জন্য কান্নাকাটি করতেন।[৮২] ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন নূহ (আ.) এর নাম ছিল সাকান। সাকান শব্দের অর্থ হল প্রশান্তি লাভ করা। তার নাম এজন্য সাকান রাখা হয় যে, হযরত আদম (আ.) এর পর মানুষ তার নিকট-ই প্রশান্তি লাভ করত। আর তিনি হচ্ছেন তাদের পিতা।[৮৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরামাহ (রা.), জুবাইর (রা.) এবং মুকাতিল (র.) থেকে বর্ণিত, نوح শব্দটি আরবি نياحة শব্দমূল (ক্রন্দন করা) থেকে এসেছে। এমতাবস্থায় نوح এর অর্থ হবে অধিক ক্রন্দনকারী। হযরত নূহ (আ.) নিজের নফসের উপর খুব বেশী কান্নাকাটি করতেন যার কারণে তাকে নূহ নামে নামকরণ করা হয়।[৮৪] তবে এ কান্নার কারণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন তিনি তার ক্বাওমের ধ্বংসের জন্য বদদু'আ করেছিলেন।[৮৫] তাই তিনি পরবর্তী জীবনে অধিক কান্নাকাটি করতেন। আবার কেউ বলেছেন তার কান্নার কারণ ছিল পুত্র কিন'আনকে রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা। কেউ বলেছেন একদা নূহ (আ.) চর্মরোগে আক্রান্ত একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বললেন, কুকুরটি কতইনা কুৎসিত! তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর নিকট এ মর্মে ওহী পাঠিয়ে দিলেন যে, তুমি আমাকে দোষারোপ করছ? না আমার সৃষ্ট কুকুরকে দোষারোপ করছ? এ জন্য হযরত নূহ (আ.) অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করতেন। আবার কেউ বলেছেন তার জাতি সবসময় কুফরির উপর থাকত। তিনি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দিতেন তখনই তারা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত। তখন তিনি তাদের জন্য কাঁদতেন এবং দুঃখবোধ করতেন।[৮৬] এ সকল রিওয়ায়াত বর্ণনা করার পর আল্লামা আলূসী (র.) নিজেই মন্তব্য করেন যে, এ সকল রিওয়ায়াত

---

৮১. আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ***তাফসীরে জালালাইনের পার্শ্বটীকা***, (সুত্র.www. islamicpotro.com) পৃ. ২৮৮; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, কায়রো: দারুল কুতুব আল মিছরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৪।

৮২. মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে ঈসা আদ-দামেরী (র.), ***হায়াতুল হায়ওয়ান,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪২৪ হি., খ. ০১, পৃ. ১৬।

৮৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল-কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৩।

৮৪. আল্লাম আলূসী (র.), ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি., খ. ৪, পৃ. ৩৮৮ ।

৮৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখরী (র.), ***সহীহুল বুখারী***, দারু তাওকিন নাজাত, প্রথম সংস্করণ ১৪২২ হি., খ. ৬, পৃ. ৮৪।

৮৬. আল্লামা আলূসী (র.), ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী***, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮৮।

গ্রহনযোগ্য নয়; বরং নূহ তার জন্মের সময়কারই নাম। আর ইহা نياحة ধাতু থেকেও উদ্ভূত নয়। কারণ শব্দটি আদৌ আরবি নয়।[৮৭]

হযরত আদম (আ.) এর প্রায় দশ শতাব্দী পর[৮৮] এবং হযরত ইদরীস (আ.) এর প্রায় সাড়ে চারশত বছর পর হযরত নূহ (আ.) এর যুগ শুরু হয়।[৮৯] আর এ যুগের মানুষদেরকেই বলা হয় নূহ (আ.) এর জাতি। আল্লামা ইবনে জারীর এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেন, এ জাতিকে 'বনূ রাসিব' (بنو راسب) বলা হত।[৯০] আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র.) এর বর্ণনামতে হযরত আদম (আ.) এর ইন্তেকালের ১২৬ বছর পর আর পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের বর্ণনামতে ১৪৬ বছর পর হযরত নূহ (আ.) এর জন্ম হয়।[৯১] হযরত কাতাদাহ (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) এর সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আ.) ছিলেন পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল।[৯২] ওয়াহাব (র.) বলেন হযরত নূহ (আ.) হলেন হযরত আদম (আ.) এর দশম অধ:স্তন বংশধর।[৯৩] আর এ দশ জনের প্রত্যেকেই ছিলেন মুমিন।[৯৪] তিনি বলেন, নূহ (আ.) যখন তার জাতির প্রতি প্রেরিত হন তখন তার বয়স ছিল ৫০ বছর। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। আর আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র.) বলেন, তখন তার বয়স ছিল ৩৫০ বছর।[৯৫] আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত নূহ (আ.) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে: ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে তখন তার বয়স ছিল ৫০ বছর, কারো মতে ৩৫০ বছর, কারো মতে ৪৮০ বছর।

আল্লামা কুরতুবী (র.) তার তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ.) এর মোট বয়স নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বলা হয় যে, তার মোট বয়স তাই যা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ ৯৫০ বছর। কাতাদাহ (র.) বলেন, তিনি মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেয়ার

---

৮৭. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৩ খৃ., প্রথম খ., পৃ. ১৭৪।

৮৮. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারু এহয়াইত তোরাছ, প্রথম সংস্করণ ১৪০৮ হি., খ. ০১, পৃ. ১১৩; সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৭৪; ফাহিম আজম, ***হযরত নূহ (আ.) এর জীবনী***, islamic linker. প্রকাশ ২৫/০১/২০১৭। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া***, আল-কাহেরা: মাতবাআয়ে দারুত তা'লীফ, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৮ হি., খ. ১, পৃ. ৭৪ ; আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান আত-তামীমী (র.), ***সহীহ ইবনে হিব্বান***, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪০৮ হি., খ. ১৪, পৃ. ৬৯ ।

৮৯. মূল: আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদ: মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, ঢাকা ১১০০: সোলেমানিয়া বুক হাউজ, মুদ্রন: জানুয়ারী ২০১৭, পৃ. ৪৪।

৯০. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারু এহয়াইত তোরাছ, ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি., খ. ০১, পৃ. ১১৪।

৯১. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১৩; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), *কাছাছুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৭৪; সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

৯২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল-কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিছরিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্বরণ, খ. ১৮, পৃ. ২৯৮; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১৪ ।

৯৩. নূহ-উইকিপিডিয়া, বাইবেলের বর্ণনা।

৯৪. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৩।

৯৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ২৯৮।

পূর্বে তাদের মধ্যে ছিলেন ৩০০ বছর, তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন ৩০০ বছর এবং প্লাবনের পর তাদের মধ্যে ছিলেন ৩৫০ বছর, মোট ৯৫০ বছর। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নূহ (আ.) নবুয়ত পেয়েছেন ৪০ বছর বয়সে, তিনি তার কাওমের মধ্যে ছিলেন ৫০ কম ১০০০ বছর আর পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার পর জীবিত ছিলেন ৬০ বছর, এমনকি মানুষের সংখ্যা অনেক হয়ে গেল এবং তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। তার থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি নবুয়ত পেয়েছেন ২৫০ বছর বয়সে, তিনি তার কাওমের মধ্যে ছিলেন ৫০ কম ১০০০ বছর আর তুফানের পর তিনি জীবিত ছিলেন ২০০ বছর। ওয়াহাব (র.) বলেন, হযরত নূহ (আ.) এর মোট বয়স ছিল ১৪০০ বছর। কা'বে আহবার বলেন, তিনি তার কাওমের মধ্যে ছিলেন ৫০ কম ১০০০ বছর আর তুফানের পর তিনি জীবিত ছিলেন ৭০ বছর, মোট ১০২০ বছর। আওন ইবনে শাদ্দাদ বলেন, নূহ (আ.) নবুয়ত পেয়েছেন ৩৫০ বছর বয়সে, তিনি তার কাওমের মধ্যে ছিলেন ৫০ কম ১০০০ বছর আর তুফানের পর জীবিত ছিলেন ৩৫০ বছর, সুতরাং তার সর্বমোট বয়স হয়েছিল ১৬৫০ বছর। হযরত হাসান (র.) থেকেও এরূপই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যখন মালাকুল মাউত নূহ (আ.) এর রূহ কবজ করার জন্য আসল তখন তাকে জিজ্ঞেস করল হে নূহ! দুনিয়াতে তুমি কতদিন জীবিত ছিলে? তিনি জবাবে বললেন, নবুয়ত পাওয়ার পূর্বে ৩০০ বছর, আমার কাওমের মধ্যে ছিলাম ৫০ কম ১০০০ বছর এবং তুফানের পর ছিলাম ৩৫০ বছর, সর্বমোট ১৬০০ বছর। মালাকুল মাউত তাকে আবার প্রশ্ন করল দুনিয়াকে কেমন পেলে? তিনি জবাবে বললেন, দুনিয়া একটি ঘরের মত যার দুটি দরজা রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন উহার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম আর অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, নূহ (আ.) কে যখন নবুয়ত দেয়া হয় তখন তার বয়স ছিল ২৫০ বছর, অতঃপর তিনি তার কাওমের মধ্যে ছিলেন ৫০ কম ১০০০ বছর আর তুফানের পর তিনি জীবিত ছিলেন ২৫০ বছর।[৯৬]

হযরত নূহ (আ.) নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে তার গোটা সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ এবং বিশুদ্ধ ধর্মীয় আলো হতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল। তারা প্রকৃত রবের পরিবর্তে স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিসমূহের পূজা করছিল।

নূহ (আ.) এর জাতি ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করত তার সঠিক তথ্য কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কুরআনের সূরা হুদের ৪০ নং আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা বর্তমান ইরাকের মসূলের নিকটবর্তী কোন এক এলাকায় বসবাস করত। কেননা সে আয়াতে বলা হয়েছে যে, নৌকা জূদী পর্বতে স্থির হল। জূদী পর্বতের তুর্কি নাম কুদি বা কুর্দি। এ পর্বতমালা ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত । সে হিসেবে বুঝা যায় নূহ (আ.) এর জাতি তুরস্কে বসবাস করত। এ ছাড়াও তুরস্কের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নূহ (আ.) এর নৌকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার দাবী করেছে দেশটি। ব্যাবিলনের প্রাচীন নিদর্শনাবলীতে বাইবেল পূর্ব যেসব প্রাচীন শিলালিপি ও প্রস্তর ফলক পাওয়া গেছে সেসব থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।[৯৭]

---

৯৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

৯৭. আতাউর রহমান খসরু, *কোথায় ছিল নূহ (আ.) এর ঘরবসতি*, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, প্রকাশ ১০ই অক্টোবর ২০১৯ খৃ.।

হযরত নূহ (আ.) ইরাকের মূসেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন।[৯৮] কুরআনুল কারীমের ইঙ্গিত ও বাইবেলের বর্ণনা মোতাবেক হযরত নূহ (আ.) এর জাতি বর্তমান ইরাকের বাবিল নগরীতে বসবাস করত। বাবিল এর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বাইবেল হতে এবং প্রাচীন শিলালিপি হতে ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯৯] আল্লামা আবুল হাছান (র.) এর বর্ণনামতে, নূহ (আ.) এর এলাকা ছিল ইরাকের কূফা নগরী। বলা হয় যে, নূহ (আ.)-ই এখানে সর্বপ্রথম বসবাস করেন। এক বর্ননা মতে প্লাবনের পর তিনি ও তার সাথীবর্গ খাদ্য পানীয়ের সন্ধানে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাদের বসতি ছিল দিজলা ও ফোরাত সংলগ্ন এলাকায়।[১০০]

তাবাক্বাতে ইবনে সা'দের বর্ণনা মোতাবেক প্লাবন শেষে নৌকা যখন জূদী পর্বতে অবস্থান করল তখন হযরত নূহ (আ.) তার সাথীগণকে নিয়ে উহার পাদদেশে একটি গ্রামে অবতরণ করেন। সেখানে তারা সকলে ঘর-বাড়ী তৈরি করল। অতঃপর উহার নামকরণ করা হল (سوق الثمانين) সূক সামানীন। অতঃপর যখন সূক সামানীনে তাদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না তখন তারা সেখান থেকে বাবিলে স্থানান্তরিত হয়ে বসতি স্থাপন করেন, যা ফোরাত (فراة) এবং সুরাত (صراة) এর মধ্যবর্তী স্থান। যার দৈর্ঘ্য ১২ ফারসাখ এবং প্রস্থ ১২ ফারসাখ। অর্থাৎ ইহার আয়তন হল ১৪৪ বর্গ ফারসাখ। সেখানে তাদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাদের সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে। তারা সকলে ছিলেন মুসলিম ।[১০১] মূসিল এর উত্তরে জাযীরা ইবনে ওমর এর আশে পাশে আর্মেনিয়া সীমান্তে আরারাত পর্বতের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এখনও নূহ (আ.) এর বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করা যায়। নাখচিওয়ান শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও প্রসিদ্ধ আছে যে, উক্ত শহর নূহ (আ.) পত্তন করেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে, প্লাবনের পর নূহ (আ.) উক্ত অঞ্চলে অবতরণ করেন এবং খাদ্য-পানীয়ের জন্য দজলা ও ফুরাত মধ্যবর্তী কূফায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১০২]

হযরত নূহ (আ.) দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী চৌদ্দ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের অধিবাসী সুমেরীয় মূর্তি পূজকদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। কারো কারো মতে তাদের আবাস অঞ্চলের আয়তন ছিল ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) বর্গ কিলোমিটার।[১০৩] তাওরাত কিতাবে বলা হয়েছে, 'জূদী' 'আরারাত' পর্বত শ্রেণির মধ্যে অন্যতম একটি পর্বত। 'আরারাত' সেই অঞ্চলের নাম যাহা 'দজলা' ও 'ফোরাত' নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী 'দিয়ারে বিকর' হতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।[১০৪] হযরত নূহ (আ.) এর দাওয়াত ও তাবলীগ সে অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল যা 'দজলা' ও 'ফোরাত' নদীর

---

৯৮. ফাহিম আজম, ***হযরত নূহ (আ.) এর জীবনী***, islamic linker. প্রকাশ ২৫/০১/২০১৭।

৯৯. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২২৭।

১০০. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ. ২২৭।

১০১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আল-বাগদাদী, ***আত-তাবাক্বাতুল কুবরা***, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১০ হি., ১৯৯০ খৃ., খ. ০১, পৃ. ৩৬।

১০২. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২২৭।

১০৩. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২১৫।

১০৪. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনুবাদ: মাওলানা নূরুর রহমান, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পূর্ণমুদ্রন: নভেম্বর ২০১২, ১ম খ., পৃ. ৬৫।

মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ দুটি নদী আরমেনিয়া পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হয়ে ইরাকের নিম্নাঞ্চলে এসে মিলিত হয়েছে, অতঃপর পারস্য উপসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। আরমেনিয়ার এ পাহাড়টি 'আরারাত' অঞ্চলে অবস্থিত। পবিত্র কুরআনুল কারীমে যাকে 'জূদী' পাহাড় বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

চিত্র ১ : নূহ (আ.) এর জাতির এলাকা :

- মানচিত্রে ইরাকের হলুদ চিহ্নিত "আল মাওসিল" নগরীতে ছিল নূহ (আ.) এর জাতির বসবাস। কারো কারো মতে, নূহ (আ.) এর এলাকা ছিল ইরাকের কূফা নগরী। তবে তারা কূফা বলতে যে ভুখণ্ডটিকে বুঝাতে চেয়েছেন, রাসূল (স.) এর হাদীসের বিশ্লেষন অনুযায়ী তা মসূলকেই বুঝায়, (সূত্র: *ইরাকের মসূল যুদ্ধ নিয়ে হাদীসের আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী*, *islamicastrolgy.blogspot.com*)।

চিত্র ২ : নূহ (আ.) এর জাতির এলাকা :

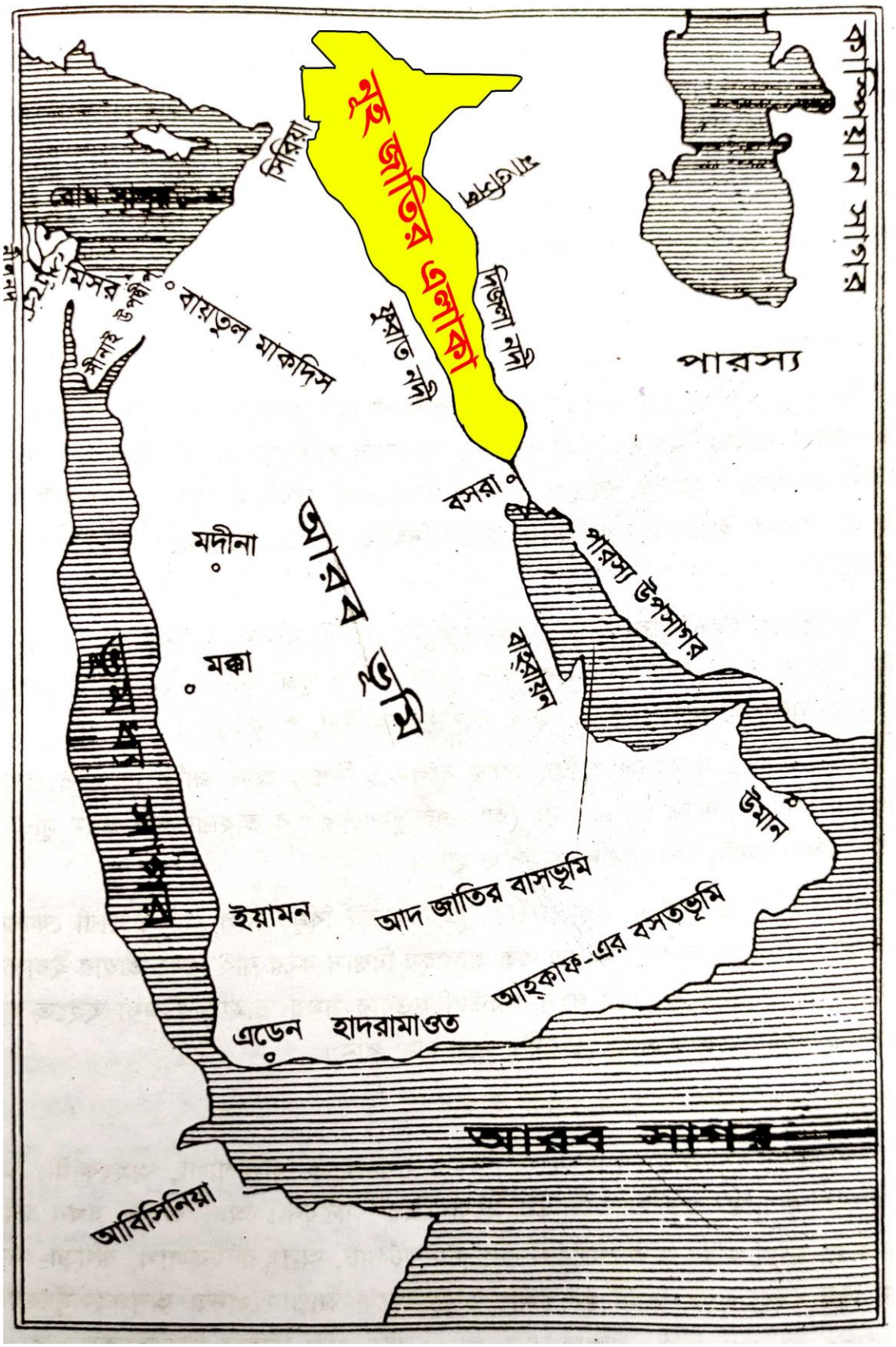

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত 'দজলা' ও 'ফোরাত' নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল মূলত নূহ (আ.) এর দাওয়াতের কেন্দ্রস্থল, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসূল। সূত্র: সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫১।

২য় পরিচ্ছেদ
পৃথিবীতে শিরকের সূচনা

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার স্থির করা, সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। আল-মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, الشرك : النصيب। তথা শিরক হল সমকক্ষ স্থির করা ; اعتقاد تعدد الآلهة। তথা একাধিক ইলাহে বিশ্বাসী হওয়া, এর বহুবচন أَشْرَاكٌ ।[১০৫] পরিভাষায়- আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং তার সিফাতের সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। শিরক একটি জঘন্য গুনাহ যা আল্লাহ তা'আলা সাধারণত ক্ষমা করেন না। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ সাব্যস্ত করা অথবা তার সাথে দেব-দেবী বা অন্য কিছুর উপাসনা করা হল মৌলিক শিরক। আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, শিরক হল আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর এভাবেও বলা যায় যে, শরীয়তে শিরক হল বান্দা তার ইবাদাতের কোন অংশকে গায়রুল্লাহর জন্য প্রায়োগ করা চাই তা মূর্তি, প্রতিমা, গাছ, পাথর, মানব, জিন, কবর, আসমানী কোন দানব অথবা প্রাকৃতিক কোন শক্তির উদ্দেশ্যে হোক না কেন? এ থেকে স্পষ্ট হল, যে ব্যক্তি তার ইবাদাতের কোন একটি প্রকার যেমন দু'আ, জবাই, মানত, নামায, সাহায্য চাওয়া, ভয়, আশা, ভরসা ইত্যাদি গায়রুল্লাহর জন্য প্রয়োগ করল সে শিরক করল।[১০৬]

শায়খ আবদুর রহমান আস-সাদী (র.) বলেন, শিরকের হাকীকত হল যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা হয় তেমনিভাবে মাখলুকের ইবাদাত করা অথবা যেমনিভাবে আল্লাহকে সম্মান করা হয় তেমনিভাবে মাখলুককেও সম্মান করা অথবা মাখলুকের জন্য রুবূবিয়াত বা উলূহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য স্থির করা। শিরক দুই প্রকার। যথা: ১. শিরক ফির রুবূবিয়্যাত ২. শিরক ফিল উলূহিয়্যাত। শিরক ফির রুবূবিয়্যাত হল যেমন দুই খোদায় বিশ্বাসী ফিরকার শিরক। তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে, ভালোর জন্য একজনকে রব স্থির করে আবার মন্দের জন্য অপরজনকে রব স্থির করে। আর শিরক ফিল উলূহিয়্যাত হল যেমন মুশরিকদের শিরক। যারা আল্লাহর ইবাদাত করে আবার গায়রুল্লাহরও ইবাদাত করে। তারা আল্লাহ ও মাখলুকের মাঝে অংশীদার সাব্যস্ত করে। আবার উলূহিয়্যাতের কোন কোন বৈশিষ্ট্যে তারা মাখলুককে আল্লাহর সমান ক্ষমতাবান মনে করে।[১০৭] ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাকে ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তখন তিনি তাদেরকে ইখলাসেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এভাবে বলেছেন, তোমরা তার সাথে কাউকে শরীক করো না। কেননা যে আল্লাহর সাথে অন্যকে ইবাদাতে অংশীদার করে সে মুশরিক, মুখলিস নয়।[১০৮]

---

১০৫. ইবরাহীম মোস্তফা ও অন্যান্য, ***আল মুজামুল ওয়াসীত***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০।

১০৬. ড. হামূদ বিন আহমদ বিন ফারজ আর রুহায়লী, ***মানহাজুল কুরআনিল কারীম ফী দাওয়াতিল মুশরিকীনা ইলাল ইসলাম***, মদীনা মুনাওয়ারাহ: আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ, উমাদাতুল বাহাস আল-ইলমি বিল জামিআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি., ২০০৪ খৃ., খ. ০১, পৃ. ১০৭।

১০৭. আবদুর রাযযাক বিন আবদুল মুহসিন আল-বদর, ***আশ-শায়খ আবদুর রহমান বিন সাদী ওয়া জুহুদুহু ফী তাওযীহিল আকীদাহ***, রিয়াদ: আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১৮ হি., ১৯৯৮ খৃ., খ. ০১, পৃ. ১৭৮।

১০৮. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.), ***তাফসীরে কাবীর***, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৭৫।

যেমন তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন: তাদেরকে আল্লাহর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ইবাদাত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।[১০৯]

হযরত ইদরিস (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর প্রায় সাড়ে চারশত বছর পর্যন্ত কোন নবী প্রেরিত হয়নি। এ দীর্ঘ সময়ে মানুষ হযরত ইদরিস (আ.) এর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক্ব এবং নাস্‌র ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করতে থাকে।[১১০]

ইমাম কুরতুবী (র.) ইবনে আব্বাস ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ.) এর জাতি এ মূর্তিগুলির পূজা করত। তাদের পর আরবরাও এ মূর্তিগুলির পূজা করেছিল। জমহুর মুফাসসিরগণের বক্তব্যও এমনই। আবার তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আ.) এর ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক্ব ও নাসর নামক পাঁচজন ছেলে ছিল যারা ছিল খুবই ইবাদতগার । এদের অনেক ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। এদের মধ্য থেকে যখন একজনের ইন্তেকাল হল তখন তাদের অনুসারীরা খুবই বিচলিত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে শয়তান এসে তাদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য তার প্রতিকৃতি বানিয়ে দিব। তোমরা যখন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন তোমাদের তার কথা স্মরণ হবে এবং তাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করবে। অতঃপর সে সীসা এবং স্বর্ণ দিয়ে তার প্রতিকৃতি তৈরি করে তাদের মসজিদে স্থাপন করে দিল। এভাবে এক এক করে পাঁচ সন্তানের প্রত্যেকে ইন্তেকাল করলেন এবং শয়তান প্রত্যেকের প্রতিকৃতি তৈরী করে তাদের মসজিদে স্থাপন করে দিল। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হতে হতে একসময় তারা ইবাদাত বান্দেগী থেকে একেবারে দূরে সরে পড়ল। তখন শয়তান এসে তাদেরকে বলল, কী হল তোমাদের? তোমরা ইবাদাত করছ না কেন? তখন তারা বলল, আমরা কিসের ইবাদাত করব? শয়তান বলল, কেন? তোমরা তোমাদের উপাস্যদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্যদের ইবাদাত করবে যেগুলো তোমাদের মসজিদে দেখতেছ। অতঃপর তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে গেল এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই মূর্তিগুলোর উপাসনা শুরু করে দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য নূহ (আ.) কে প্রেরণ করেন। আবার মুহাম্মদ ইবনে কায়স এবং মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন, এই পাঁচ জনের প্রত্যেকে হযরত আদম (আ.) ও নূহ (আ.) এর মধ্যবর্তী সময়কার নেককার বান্দা ছিলেন। এদের অনেক ভক্ত-অনুরক্ত ও অনুসারী বিদ্যমান ছিল। এদের ইন্তেকালের পরে শয়তান এসে তাদের অনুসারীদের জন্য এ সকল নেককারদের প্রতিকৃতি তৈরি করে তাদের ইবাদাতখানায় স্থাপন করে দিল যেন তারা তা দেখে তাদের দ্বীনের উপর মুজাহাদার কথা স্মরণ করতে পারে এবং মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে পারে। অতঃপর যখন ঐ যুগের সকলে মারা গেল এবং নতুন প্রজন্মের আগমন ঘটল তখন তারা বলাবলি করতে লাগল হায়! আমরাতো কিছুই বুঝতে পারছি না যে আমাদের বাপ দাদাগণ এ মূর্তিগুলো দিয়ে কী করত? তখন শয়তান এসে বলল, তোমাদের বাপ দাদাগণ এ মূর্তিগূলোর পূজা করত, ফলে তারা দয়াপ্রাপ্ত হত এবং তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হত। অতঃপর তারা মূর্তিগুলির পূজা আরম্ভ করে দিল আর তখন থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়ে গেল। ইমাম ছালাবী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এ নামগুলি ছিল হযরত

---

১০৯. আল-কুরআন, ৯৮:৫।

১১০. আল-কুরআন, ৭১:২৩।

নূহ (আ.) এর জাতির নেককার লোকদের। এরা যখন একে একে সবাই মারা গেল তখন শয়তান এসে তাদের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিল যে, তোমরা এদের প্রত্যেকের বসার মজলিসে এদের সূরতে একটি করে মূর্তি স্থাপন কর। তারা তাই করল। তখন তারা মূর্তিগুলোর পূজা করত না। কিন্তু এক সময় যখন ঐ মানুষগুলি সব মারা গেল আর পরবর্তী প্রজন্ম এ মূর্তিগুলির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়ল তখনই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলির পূজা আরম্ভ করে দিল। ইমাম মাওয়ারদী (র.) বলেন সর্বপ্রথম পূজা শুরু হয় ওয়াদ্দ মূর্তির। নূহ (আ.) এর জাতির পরে উহার পূজা হয় দাওমাতুল জন্দলে কালব গোত্রের মধ্যে। অতঃপর সুওয়া, ইহা ছিল সমুদ্র তীরবর্তী হুযাইল গোত্রের উপাস্য। অতঃপর ইয়াগুস, ইহা ছিল সাবার মধ্যবর্তী এলাকার গুতাইফ/গাতফান গোত্রের উপাস্য। অতঃপর ইয়াউক্ব, ইহা ছিল বলখের হামদান এলাকার লোকদের উপাস্য। অতঃপর নাসর, ইহা ছিল হিময়ারের যিলকুলা এলাকার লোকদের উপাস্য। আল্লামা ওয়াকেদী (র.) বলেন, ওয়াদ্দ মুর্তিটি ছিল পুরুষ আকৃতির, সুওয়া ছিল মহিলা আকৃতির, ইয়াগুস ছিল সিংহ আকৃতির, ইয়াউক্ব ছিল হাতির আকৃতির। আর নাসর ছিল শকুন পাখি/ ঈগল আকৃতির।[১১১]

ইমাম বাগাভী (র.) বর্ণনা করেন যে, এই পাঁচটি নাম মূলত পাঁচজন মহাপুরুষের। এরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ন বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ (আ.) এর আমলের মাঝামাঝি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ইন্তেকালের পর তাদের ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বান্দেগী ও বিধি-বিধানের প্রতি তাদের আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচনা দিতে থাকে যে, তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা করছ যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে তোমাদের উপাসনালয়ে তোমাদের সামনে রেখে দাও তাহলে তোমাদের উপাসনা আরও পূর্ণতা লাভ করবে এবং ইবাদাতের মধ্যে বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের কুটচাল বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরি করে উপাসনালয়ে তাদের সামনে রেখে দিল। এতে তারা ইবাদাতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এভাবে একে একে তাদের সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আর সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। তারা মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস ভুলে গেল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বুঝাল যে, তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা এবং উপাস্য এ মূর্তিগুলিই ছিল। তারা এ মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এ মূর্তিগুলোর উপাসনা করেই তারা সফলতা অর্জন করেছিল। সুতরাং তোমরাও এগুলোরই উপাসনা কর। তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে গেল এবং মূর্তিগুলোর পূজা আরম্ভ করে দিল। এভাবে পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়ে গেল।[১১২] এক সময় পুরো জাতি মূর্তি পূজায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

---

১১১. ইমাম কুরতুবী (র.), ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ৩০৭- ৩০৯।

১১২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রন প্রকল্প, সউদী আরব, মুদ্রন:১৪১৩ হি., পৃ. ১৪০৮।

৩য় পরিচ্ছেদ
দাওয়াত ও তাবলীগ

বনূ রাসেব জাতি যখন মূর্তিপূজায় আচ্ছন্ন হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সঠিক পথের দিশা প্রদানের জন্য চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী একজন পথ প্রদর্শক ও সত্য রাসূল হিসেবে হযরত নূহ (আ.) কে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আমি নূহ (আ.) কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ কথা বলে প্রেরণ করেছি যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের নিকট মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে। নূহ (আ.) বললেন হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন"।[১১৩] আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত না কর তবে আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রনাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি।[১১৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا অর্থাৎ আমি নূহকে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি অতঃপর তিনি তাদের মাঝে অবস্থান করেন পঞ্চাশ কম এক হাজার অর্থাৎ সাড়ে নয়শ বছর।[১১৫]

হযরত নূহ (আ.) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিরলস পরিশ্রম করেন। তাঁর সাধ্যমত সকল উপায় উপকরণ অবলম্বন করেন। তিনি দিবা-রাত্রি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবান করেন।[১১৬] তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন, অতঃপর ঘোষনা সহকারে এবং গোপনে চুপিসারে দাওয়াত দেন।[১১৭] আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত নূহ (আ.) প্রতিদিন পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান করতেন এবং উচ্চ আওয়াজে বলতেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আনা রাসূলুল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর হুকুমে হযরত নূহ (আ.) এর আওয়াজ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেত। কিন্তু এই সাড়ে নয়শত বছরের নবুয়তকালীন সময়ে স্বল্প সংখ্যক দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির লোক ব্যতীত আর কেহই তাঁর দাওয়াতে কর্ণপাত করেনি। মাত্র চল্লিশ জন পুরুষ ও সমসংখ্যক নারী তাঁর দাওয়াতে ঈমান আনয়ন করেন। তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কাফির ও ধনী শ্রেণির লোকেরা তাঁকে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত বলে আখ্যায়িত করল।[১১৮] তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল[১১৯], উন্মত্ত বলে অপবাদ দিল।[১২০] তারা বলল, সে তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, সে চায় তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতে চাইতেন তবে পিরিশতা-ই পাঠাতেন।[১২১]

---

১১৩. আল-কুরআন, ৭১ : ১-৪।
১১৪. আল-কুরআন, ১১ : ২৬।
১১৫. আল-কুরআন, ২৯ : ১৪।
১১৬. আল-কুরআন, ৭১ : ৫।
১১৭. আল-কুরআন, ৭১ : ৮-৯।
১১৮. আল-কুরআন, ৭ : ৬০।
১১৯. আল-কুরআন, ৭ : ৬৪।
১২০. আল-কুরআন, ৫৪ : ৯।
১২১. আল-কুরআন, ২৩ : ২৪।

হযরত নূহ (আ.) যখনই কালিমার দাওয়াত দিতেন তখনই অভিশপ্তের দল কানে আঙ্গুল দিত যেন তাঁর কোন বাণী তাদের কর্ণকুহরে না পৌঁছে, তারা মুখমন্ডলের উপর কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে মুখ লুকাতো যেন তাঁকে দেখতে না হয় এবং কুফরীর উপর অটল থেকে অহংকার করত।[১২২] কোন কোন কাফের কালেমার আওয়াজ শুনে দৌড়ে পালিয়ে যেত। এসব অভিশপ্ত কাফিরদেরকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানালে তাদের কেউ কেউ অগ্রগামী হয়ে হযরত নূহ (আ.) এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরন করত এমনকি দৈহিক নির্যাতনও করত। মারতে মারতে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলত। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি আবার উচ্চ আওয়াজে বলতেন লোক সকল! তোমরা বল, 'আল্লাহ তা'আলা এক, একক, লা শারীক আর নূহ তাঁর সত্য রাসূল'। তারা জবাবে বলত, আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনব? অথচ তোমার অনুসারীরা হল দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির লোক।[১২৩] তারা দুর্বল ও দরিদ্র ঈমানদারদেরকে তার থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করল। হযরত নূহ (আ.) তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন আমি মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার নই।[১২৪] হযরত নূহ (আ.) বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বুঝালেন যে, তিনি পার্থিব কোন স্বার্থে তাদেরকে আহবান করছেন না। তিনি তাদের নিকট এর জন্য কোন সম্পদ বা বিনিময় চান না। কেননা তার বিনিময় তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে পাবেন।[১২৫] তারা নূহ (আ.) এর কোন যুক্তিই গ্রহণ করল না। তারা তার দাওয়াততো কবুল করলোই না; বরং তাঁকে পাগল বলে অপবাদ দিল এবং এ দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত না হলে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করারও হুমকি দিল।[১২৬] একদিনের ঘটনা; কাফেররা হযরত নূহ (আ.) এর গলায় রশি দিয়ে তাঁকে টানা হেঁছড়া করল। ফলে তিন দিন পর্যন্ত তিনি চৈতন্যহীন হয়ে থাকলেন। এতদসত্ত্বেও সকল দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে তিনি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন।

দাহ্হাক সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় তাকে আটক করে প্রহার করত, তার গলায় ফাঁস দিত। তার সম্প্রদায়ের প্রহারের চোঁটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত তিনি মরে গেছেন। অতঃপর চেতনা ফিরে আসলে তিনি গোসল করতেন এবং কাওমের নিকট গিয়ে আবার তাদেরকে দাওয়াত দিতেন।[১২৭] মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আসরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তার সম্প্রদায় তার গলা টিপে দিত, ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এ দু'আ করতেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার সম্প্রদায়কেও ক্ষমা করুন; কারণ তারা অবুঝ'। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। এভাবে তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দাওয়াতী কাজ করতে থাকেন এবং তাঁর উপর তাদের নির্যাতনও চলতেই থাকে। পূর্ববর্তী

---

১২২. আল-কুরআন, ৭১ : ৭।

১২৩. আল-কুরআন, ২৬ : ১১১।

১২৪. আল-কুরআন, ২৬ : ১১৪ ; ১১ : ৩৬।

১২৫. আল-কুরআন, ১১ : ২৯।

১২৬. আল-কুরআন, ২৬:১১৬ ; ৫৪: ৯।

১২৭. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৯৯ ; হযরত মাওলানা মুফতী মহাম্মদ শাফী (রহঃ), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০৭।

প্রজন্মের তুলনায় পরবর্তী প্রজন্মের নির্যাতন ও অপরাধের মাত্রা আরও চরম আকার ধারণ করল।[১২৮] ইসহাক ইবনে বিশর এবং ইবনে আসাকিরও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

একদিন হযরত নূহ (আ.) স্বজাতির লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি ডাকেন। তখন কাফেররা এসে তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে মারধর করে যে, তাঁর কাপড়চোপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁর কাফের স্ত্রী এসে কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে লোকসকল! নূহ একটা পাগল। তোমরা তাকে এতটা মেরো না। সে যা বলে, পাগলামির কারণেই বলে। সে কিছুই জানে না, বুঝে না। নূহ (আ.) স্ত্রীর এই বেআদবীপূর্ণ উক্তির কারণে এবং তার সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহারে অত্যন্ত দু:খিত হলেন এবং আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানান, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ নূহ ডেকে বলল, হে রব! আমি পরাজিত হয়ে গেছি, অতএব আপনি প্রতিশোধ গ্রহন করুন। [১২৯]

বর্ণিত আছে একদিন নূহ (আ.) এর জাতির এক লোক তার ছেলেকে কোলে নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে হযরত নূহ (আ.) এর নিকট আসল। অতঃপর বলল, বৎস! তুমি এ বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে নাও। সে যেন কখনও তোমাকে ধোকা দিতে না পারে। তুমি কখনও তাকে সত্যায়ন করো না। এর ব্যাপারে আমার বাবা এবং দাদাও বলে গেছেন যে, সে মিথ্যাবাদী ও পাগল। তখন ছেলেটি তার বাবাকে বলল, আমাকে লাঠিখানি দিন। বাবা লাঠিখানি তার হাতে দিল। অতঃপর ছেলেটি বলল, আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিন। বাবা ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে দিল। ছেলেটি হেঁটে নূহ (আ.) এর কাছে গেল এবং লাঠি দ্বারা তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিল।[১৩০] এতে হযরত নূহ (আ.) অত্যন্ত দু:খিত হলেন এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমিতো দেখছ তোমার বান্দারা আমার সাথে কিরূপ আচরণ করছে। তুমি যদি তাদেরকে রাখতে চাও তবে তাদেরকে হিদায়াত দান কর, আর যদি তা না হয় তবে তোমার ফয়সালা করা পর্যন্ত আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দাও। তুমিতো উত্তম ফয়সালাকারী।[১৩১]

মোটকথা, হযরত নূহ (আ.) যখন কাওমের হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়লেন। কুরআনুল কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সাড়ে নয়শত বছরের দাওয়াত ও হিদায়াতের তেমন কোন প্রতিক্রিয়া বুঝা গেল না তখন তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ! আমি স্বজাতিকে রাত-দিন আহ্বান জানিয়েছি; কিন্তু আমার আহ্বানে তারা আরও বেশী করে পালাতে থাকে।[১৩২] হযরত নূহ

---

১২৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ:), *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০৭,

১২৯. আল-কুরআন, ৫৪ : ১০।

১৩০. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৯ ; আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী, *আল-কাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসীরিল কুরআন*, বৈরুত, দারু এহয়াইত তোরাছ আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি., ২০০২ খৃ., খ. ১০, পৃ. ৪৭।

১৩১. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আলূসী, *তাফসীরে রূহুল মা'আনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৭।

১৩২. আল-কুরআন, ৭১ : ৫-৬।

(আ.) আরও বলেন হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তারা আমাকে অমান্য করেছে, আর তারা অনুসরণ করেছে এমন ব্যক্তিদের (নেতাদের) কে যাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। তারা (নেতারা) ভয়ানক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তারা (নেতারা) বলছে যে, তোমরা তোমাদের ইলাহসমূহকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না উদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস ও নাসরকে; অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে।[১৩৩] তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.) কে শান্তনা দিয়ে ওহী পাঠিয়ে দিলেন,وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ অর্থাৎ "আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হল, যারা ঈমান আনার ছিল তারা ঈমান এনেছে আর যারা বাকী রয়েছে তারা কেহই ঈমান আনবে না। অতএব আপনি তাদের কার্যকলাপের জন্য দু:খ করবেন না"।[১৩৪]

অতঃপর জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে নূহ! আপনি দু'আ করুন। আপনার দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। এই কাফের সম্প্রদায় কখনো কোন অবস্থাতেই আপনার উপর ঈমান আনবে না। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট বদদু'আ করলেন।[১৩৫] وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. অর্থাৎ নূহ বলল, হে প্রভু! আপনি যমীনের উপর কাফিরদের একটি ঘরও বাকী রাখিয়েন না, যদি বাকী রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা কেবল পাপাচারী কাফির ই জন্ম দিবে।[১৩৬] তিনি আরও বললেন, رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আপনি আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথী ঈমানদারগণকে পরিত্রান দান করুন।[১৩৭] আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর বদদু'আ কবুল করে নিলেন। তিনি তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ونوحا إِذْ نَادَى من قبل فاستجبنا لَهُ فنجيناه وَأَهله من الكرب الْعَظِيم ". অর্থাৎ আর স্মরণ করুন নূহ (আ.) এর কথা! যখন তিনি আমার নিকট প্রার্থনা করলেন আমি তাঁর প্রার্থনা কবুল করলাম, অতঃপর তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে মহা বিপদ থেকে পরিত্রান দান করলাম।[১৩৮] এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে নৌকা তৈরি করার নির্দেশ দিলেন।[১৩৯] এটি এমন এক নৌকা পৃথিবীতে যার উপমা পূর্বেও ছিল না পরেও নেই।[১৪০]

---

১৩৩. আল-কুরআন, ৭১: ২১-২৪।
১৩৪. আলকুরআন, ১১: ৩৬।
১৩৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামছুদ্দীন আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ৩১২।
১৩৬. আল-কুরআন, ৭১ : ২৭
১৩৭. আল-কুরআন, ২৬ : ১১৭; ৫৪ : ১০।
১৩৮. আল-কুরআন, ২১ : ৭৬; ৩৭ : ৭৬।
১৩৯. আল-কুরআন, ১১ : ৩৭।
১৪০. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), *কাছাছুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৯৪।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
নৌকা তৈরি ও প্রলয়ংকরী মহাপ্লাবন

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত নূহ (আ.) এর দু'আ কবুল করলেন তখন তাকে নির্দেশ দিলেন একটি গাছ লাগানোর জন্য যেন উহা দ্বারা নৌকা তৈরি করতে পারেন। অপর বর্ণনায় আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত হতে একটি ডাল এনে দেন যা হযরত নূহ (আ.) রোপণ করেন। এরপর ১০০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তার পরবর্তী ১০০ বছরে মতান্তরে ৪০ বছরে তিনি নৌকা তৈরি করেন। গাছটি ছিল সেগুন মতান্তরে পাইন গাছ।[১৪১] এ চল্লিশ বছর নূহ (আ.) এর জাতির কাফেরদের স্ত্রীরা সম্পূর্ণ বন্ধ্যা ছিল। তাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি এবং তাদের বংশ বৃদ্ধির ধারা সম্পুর্ণ রুদ্ধ হয়ে থাকে।[১৪২]

নূহ (আ.) এর উল্লিখিত দু'আর পর হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, হে নূহ! আপনি এ গাছ (অর্থাৎ যে গাছ জান্নাতী গাছের ডাল রোপন করার পর হয়েছে) দ্বারা কিশতী তৈরি করুন। নূহ (আ.) বললেন, কিভাবে কিশতী বানাব, আমিতো কাঠমিস্ত্রী নই? জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনার প্রতিপালক বলেছেন, আপনি তৈরি করুন আপনি আমার সামনেই আছেন।[১৪৩] অতঃপর জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি গাছটি কেটে সেটি চিরে তক্তা করুন। তক্তা করা হলে বলব, আপনি কিভাবে নৌকা বানাবেন। নূহ (আ.) গাছ কেটে তক্তা বানালেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ অর্থাৎ আর আপনি আমার সম্মুখে আমার হুকুমে কিশতী নির্মাণ করুন এবং আমার কাছে জালেমদের ব্যাপারে কোন কথা বলবেন না; অবশ্যই এরা নিমজ্জিত হবে। [১৪৪] জিবরাঈল (আ.) নূহ (আ.) কে বললেন, আপনি তক্তা দ্বারা কিশতী নির্মাণ করুন এবং কর্তিত গাছের ডালসমূহ দ্বারা কিশতীর পেরেক লাগান। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.) এর শেখানো মতে প্রথমে গাছ কেটে তক্তা বানালেন। প্রথম তক্তায় হযরত আদম (আ.) এর নাম ও দ্বিতীয় তক্তায় হযরত শীস (আ.) এর নাম লিখেন। এভাবে একলাখ চব্বিশ হাজার নবীর সকলের নাম-ই এই কিশতীতে লিখা হয়। সর্বশেষ তক্তায় খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নাম লিখা হয়।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক জিবরাঈল (আ.) এর দেখানো পদ্ধতিতে হযরত নূহ (আ.) কিশতী তৈরি করেন। নির্মিত কিশতীখানার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাজার গজ এবং প্রস্থ ছিল চারশ গজ।[১৪৫] আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন তাওরাতবিদদের ধারণা, নূহ (আ.) এর নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০

---

১৪১. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, কায়রো: দারুল হাদিস, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ., খ. ০১, পৃ. ১১৩; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬।

১৪২. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২০০।

১৪৩. আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথী (র.), ***তাফসীরে মাযহারী***, পাকিস্তান: মাকতাবাতুর রশীদিয়্যাহ, প্রকাশ ১৪১২ হি., খ. ৫, পৃ. ৮৩ ; হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি., খ. ৪, পৃ. ১৭৪।

১৪৪. আল-কুরআন, ১১: ৩৭।

১৪৫. মূল: আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদ: মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, ঢাকা ১১০০, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, মুদ্রন: জানুয়ারী ২০১৭, পৃ. ৪৪।

হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। আর সেটি তিন তলা বিশিষ্ট ছিল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)ও সুফিয়ান সাওরী (র.) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। [১৪৬] আল্লামা বাগাভী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) হতে নকল করেন, নূহ (আ.) ২ বছর যাবৎ নৌকাটি তৈরি করেন। এটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ গজ, প্রস্থ ছিল ৫০ গজ এবং উচ্চতা ছিল ৩০ গজ আর সেটি তিন তলা বিশিষ্ট ছিল। ১ম তলায় হিংস্র জানোয়ার, ২য় তলায় চতুষ্পদ জন্তু এবং উপরের তলায় প্রয়োজনীয় পাথেয়সহ তিনি ও তার ঈমানদার সাথীগণ ছিলেন। তিনি কাতাদাহ (র.) থেকে নকল করেন উহার দরজা ছিল পার্শ্বের দিকে। আবার তিনি হাসান (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ.) এর নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত, প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। পরিশেষে আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন এখানে প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ গজ।[১৪৭]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আ.) এর নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৬০০ গজ ও প্রস্থ ছিল ৩০০ গজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ গজ ও প্রস্থ ছিল ৬০০ গজ। কেউ কেউ বলেন, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ২০০০ গজ ও প্রস্থ ছিল ১০০ গজ। আর এদের প্রত্যেকেই বলেন উহার উচ্চতা ছিল ৩০ গজ এবং নৌকাটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। নীচ তলায় ছিল চতুষ্পদ ও হিংস্র জানোয়ার, মাঝের তলায় ছিল মানুষ এবং উপরের তলায় ছিল পক্ষীকূল।[১৪৮] যায়েদ বিন আসলাম (রা.) বলেন, নূহ (আ.) গাছ লাগিয়েছেন ও কেটেছেন ১০০ বছরে এবং নৌকা তৈরি করেছেন পরবর্তী ১০০ বছরে। আবার কেউ কেউ বলেছেন গাছ লাগানোর পর তা বড় হয়েছিল ৪০ বছর অতঃপর তা শুকিয়েছেন ৪০ বছর। কা'বে আহবার (র.) বলেন নৌকা তৈরিতে নূহ (আ.) এর সময় লেগেছে ৩০ বছর।[১৪৯] এদিকে নূহ (আ.) কে কিশতী তৈরি করতে দেখে কাফেররা হাসা হাসি ও উপহাস করতে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, **وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ** অর্থাৎ নূহ (আ.) কিশতী তৈরি করছিলেন আর তাঁর সম্প্রদায়ের সর্দাররা যখনই কিশতীর নিকট দিয়ে যেত, তখনি তারা হাসি-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এতে হযরত নূহ (আ.) বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে নিয়ে হাসি-কৌতুক কর তবে আমরাও তোমাদেরকে নিয়ে হাসি-কৌতুক করব। আর তোমরা অতি শিগগিরই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর স্থায়ী আযাব আপতিত হচ্ছে। [১৫০] তাফসীর গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে, নূহ (আ.) এর জাতির কাফেররা তাঁর কিশতী নির্মাণ দেখে এই বলে হাসা-হাসি আর বিদ্রূপ করত যে, শুকনা ভূমিতে নিমজ্জন হতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে! তারা নূহ (আ.) এর কিশতী র্নিমাণ নিয়ে হাসি-কৌতুক করছে; অথচ মৃত্যু তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

---

১৪৬. হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪৪৭। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, প্রাগুক্ত, ***খ.*** ১, পৃ. ১১৩; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৯৭।

১৪৭. ইমাম বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪৮।

১৪৮. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৩-১১৪; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭ ।

১৪৯. হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪৭।

১৫০. আল-কুরআন, ১১ : ৩৮।

কিশতী তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে বললেন, এবার আপনি বায়তুল মামূরের যিয়ারত করুন। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মামূর উঠিয়ে নেবেন। তিনি যেয়ারত করে আসার পর ফেরেশতারা বায়তুল মামূর চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি কিশতীর বিন্যাস ব্যবস্থাপনায় লেগে যান। কোন বর্ণনা মোতাবেক কিশতীখানা ছিল সাত স্তরবিশিষ্ট। প্রথম স্তরে আদম (আ.) এর তাবুত (সিন্দুক),[১৫১] দ্বিতীয় স্তরে নূহ (আ.) ও মুমিনরা ছিলেন। তৃতীয় স্তরে পক্ষীকূল, চতুর্থ স্তরে হিংস্র জীব-জন্তুসকল, পঞ্চম স্তরে পতঙ্গকূল, ষষ্ঠ স্তরে প্রত্যেক প্রজাতির বস্তুসমূহ, সপ্তম স্তরে খাদ্য বীজ, ঘাস এবং সর্বপ্রকার ফল-ফলাদি রাখা ছিল।[১৫২] জিবরাইল (আ.) বললেন হে নূহ! মহাপ্লাবনের আলামত হচ্ছে আপনার ঘরের উনুন হতে গরম পানি বের হতে থাকবে।

দিনটি ছিল রজব মাসের দুই তারিখ। নূহ (আ.) এর স্ত্রী রুটি তৈরি করছিল। এমন সময় জিবরাঈল (আ.) এর কথা মত উনুন থেকে গরম পানি উঠতে শুরু করে। স্ত্রী নূহ (আ.) কে এ সম্পর্কে অবহিত করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ ঘটনা-ই বর্নিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ অর্থাৎ এমনকি যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে শুরু করল, আমি বললাম, সকল প্রজাতির একেক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে এতে (কিশতীতে) উঠিয়ে নাও তবে সে নয় যার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আর যে ঈমান এনেছে তাকে উঠিয়ে নাও, বস্তুত স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত আর কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। [১৫৩]

জিবরাঈল (আ.) প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর একেক জোড়া কিশতীতে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য নূহ (আ.) কে বললেন। এতে নূহ (আ.) জবাব দিলেন, প্রাণীকূলের কোনোটি দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে আর কোনোটি পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে। সবগুলো আমি কি করে একত্র করব? অতঃপর যেসব প্রাণীর বংশধারা অবশিষ্ট থাকা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল, আল্লাহর হুকুমে সেগুলোকে একত্র করার ব্যবস্থা করা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে আল্লাহ তা'আলা ৪০ দিন ৪০ রাত পর্যন্ত লাগাতার বৃষ্টি বর্ষন করেন। ফলে হিংস্র জানোয়ারসমূহ হযরত নূহ (আ.) এর নিকট এসে জড়ো হয় এবং সেগুলোকে তার অনুগত করে দেয়া হয়। অতঃপর হযরত নূহ (আ.) প্রত্যেকটির একেক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেন।[১৫৪] নূহ (আ.) যখন সকলকে নিয়ে নৌকায় আরোহন করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করলেন এবং সকলকে বললেন তোমরা এ দু'আ পাঠ করে নৌকায় আরোহণ কর بِسم الله مجريها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي

---

১৫১. মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি., খ. ০১, পৃ. ৩৫।

১৫২. মূল: আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদ: মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১৫৩. আলকুরআন, ১১ : ৪০।

১৫৪. মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫; মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, বৈরুত: দারুত তোরাছ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৭ হি., খ. ০১, পৃ. ১৮৫।

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহর নামে ইহার গতি ও স্থিতি, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১৫৫]

অতঃপর তাঁর পরিবারের মধ্য হতে যাদের সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে তাঁরা ব্যতীত বাকী সবাই কিশতীতে আরোহণ করে। কিশতীতে মোট কতজন লোক আরোহণ করেছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নূহ (আ.) এর সাথে নৌকায় আরোহনকারী ঈমানদারদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন যাদের একজনের নাম ছিল জুরহুম। ইবনে আব্বাস (রা.) এর অপর বর্ণনায় তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তার তিন পুত্র, তাদের স্ত্রী, তার পত্নী এবং শীছ বংশের অন্য ৭৩ জন ঈমানদারসহ মোট ৮০ জন।[১৫৬] মুকাতিল (র.) বলেন তারা নারী-পুরুষ মিলে ৭২ জন এবং সাথে তার তিন ছেলে ও তাদের স্ত্রীগনসহ মোট ৭৮ জন, এদের অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী।[১৫৭] কা'বে আহবার এর বর্ণনামতে ৭২ জন।[১৫৮] আল্লামা ইবনে ইসহাক (র.) এর মতে মহিলা ব্যতীত ১০ জন। অর্থাৎ নূহ (আ.) ও তার তিন পুত্র সাম, হাম, ইয়াফেছ এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী আরও ছয়জনসহ মোট পুরুষ দশজন। সাথে তাদের স্ত্রীগন মিলে মোট ২০ জন। কাতাদা, ইবনে জুরায়জ এবং মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী এর বর্ণনা মোতাবেক নৌকায় আরোহন করেছিল মোট ০৮ জন; নূহ (আ.), তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র এবং তাদের স্ত্রীগন।[১৫৯] আ'মাশ (র.) এর মতে মোট ০৭ জন; নূহ (আ.), তার তিন পুত্র এবং তিন পুত্রবধূ।[১৬০]

উপরোক্ত মতগুলির মধ্যে শেষ দুটি মত পবিত্র কুরআনের বর্ণনার বিরুধী হওয়ার কারণে গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে প্রত্যেক শ্রেণির যুগলের দুটি, তার পরিবার এবং তার সাথী ঈমানারগণকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৬১] অথচ এ দুটি মতে তার পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ঈমানদারকে উত্তোলনের কথা উল্লেখ নেই। আর বাকী মতগুলির মধ্যে ১ম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে অনুমিত হয়। কেননা হযরত নূহ (আ.) নৌকা থেকে অবতরণের পর যে এলাকায় বসতি স্থাপন করেন ইতিহাসে উহা 'সূক সামানীন' নামে খ্যাত। এতে বুঝা যায় যে, নূহ (আ.) এর নৌকায় আরোহনকারীদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। আর ইহাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

দিনটি ছিল রজব মাসের দশ তারিখ।[১৬২] শুরু হল নূহ (আ.) এর মহাপ্লাবন । আসমান থেকে বর্ষিত হতে লাগল গরম পানি আর ভূমি ফেটে উথলে উঠতে লাগল শীতল পানি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল

---

১৫৫. আল-কুরআন, ১১ : ৪১।

১৫৬. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৮৭।

১৫৭. আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথী (র.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৮৭।

১৫৮. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১০০।

১৫৯. আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথী (র.), ***তাফসীরে মাযহারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৮৭; মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৮৮।

১৬০. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৮৮।

১৬১. আল-কুরআন, ১১ : ৪০।

১৬২. মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৫; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,*** দারু হিজর, ১ম প্রকাশ ১৪১৮ হি., খ. ১, পৃ. ২৭২; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১২।

আলামীন বলেন, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ - وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ অর্থাৎ আর আমি অত্যধিক বর্ষনশীল পানি দ্বারা আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম এবং ভুমি হতে ঝরণাধারা প্রবাহিত করলাম, অতঃপর উভয় পানি একত্র হয়ে গেল এক সিদ্ধান্তকৃত কাজে।[১৬৩] হযরত নূহ (আ.) এর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেস সহ সবাই কিশতীতে আরোহন করল। কিন্তু নূহ পুত্র কিনআন দাম্ভিকতার কারণে কিশতীতে আরোহন করল না। সে বলল, আমি কিশতীতে উঠব না। নূহ (আ.) পুত্র কিনআনকে ডেকে বললেন, কিশতীতে না উঠলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে, অতএব আমাদের সাথে কিশতীতে আরোহন কর। নিম্নোক্ত আয়াতে এ ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ আর নূহ (আ.) তাঁর পুত্রকে ডাকলেন, সে ভিন্ন জায়গায় ছিল। বললেন, বৎস! আমাদের সাথে কিশতীতে আরোহন কর, কাফেরদের সাথে থেকো না। [১৬৪] কুরআনের ভাষায় সে জবাব দিল, قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ সে (কিনআন) বলল, আমি কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, পাহাড় আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।[১৬৫] নূহ (আ.) পুত্র কিনআনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৎস! আজ আর কেউই অবশিষ্ট থাকবে না, আল্লাহর আযাবে সবাই ডুবে মরবে। আল্লাহ যাকে রহমত করবেন কেবল সে-ই আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা পাবে আর এমন ব্যক্তি হবে মুমিন। কুরআনের ভাষায় নূহ (আ.) এর জবাব قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ। অর্থাৎ আজ আল্লাহর হুকুম হতে বাঁচানোর মত কেউ নেই, তবে আল্লাহ যাকে রহম করবেন সেই আজ বাঁচবে। [১৬৬]

নূহ পুত্র কিনআন যে পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছিল পানি সর্বপ্রথম সে পাহাড়ে পৌঁছল। এ দেখে নূহ (আ.) এর অন্তরে পিতৃবাৎসল্য জেগে উঠে। তিনি ভাবলেন কিনআন তো পানিতে ডুবে মারা যাবে। তাই তিনি আসমানের দিকে চেহারা উঠিয়ে নিবেদন করলেন ইয়া রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন আমার পরিজনকে ধ্বংস করবেন না। আমার ছেলে কিনআন তো এক্ষুনি মারা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ অর্থাৎ নূহ (আ. আপন রবকে ডেকে বললেন ইয়া রব! আমার ছেলেতো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা সত্য এবং আপনিই সবচাইতে বড় বিচারক।[১৬৭] উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.) কে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে তিনি তার পরিজনদেরকে রক্ষা করবেন। তাই হযরত নূহ (আ.) স্বীয় পুত্রের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। কিন্তু জবাবে হযরত নূহ (আ.) কে আল্লাহর তরফ থেকে ধমক দিয়ে বলা হল "সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে আপনার এমন আবেদন করা উচিৎ নয় যার খবর আপনি কিছুই জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ প্রদান করছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না।"[১৬৮]

---

১৬৩. আল-কুরআন, ৫৪ : ১৪।
১৬৪. আল-কুরআন, ১১ : ৪২।
১৬৫. আল-কুরআন, ১১ : ৪৩।
১৬৬. আল-কুরআন, ১১ : ৪৩।
১৬৭. আল-কুরআন, ১১ : ৪৫।
১৬৮. আল-কুরআন, ১১ : ৪৬।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এমন ছিল না। নূহ (আ.) পুত্রের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য বশত: সে দিকে লক্ষ্য না করে আল্লাহর নিকট পুত্রের জন্য আবেদন করে বসেন। আল্লাহর ওয়াদা ছিল এরূপ, 'আমি নূহকে বললাম, প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নাও, আর নিজের পরিজনদেরকেও উঠিয়ে নাও তাদের ব্যতীত যাদের ব্যাপারে আল্লাহর আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে'।[১৬৯] নূহ (আ.) এর স্ত্রী এবং পুত্র কাফের হওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই আল্লাহর আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর হযরত নূহ (আ.) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এই বলে "হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা ও রহম না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[১৭০]

যাই হোক, আকাশ হতে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্র পর্যন্ত অবিরত ধারায় বৃষ্টি প্রবাতিহ হতে থাকল। পৃথিবীর সকল প্রস্রবন, নদী-নালা, খাল-বিল ফুঁসে উঠল। এভাবে পানি বাড়তেই থাকল এমনকি পাহাড়ের চুড়ার উপরেও পানি হল চল্লিশ হাত। মুফাসসিরীনে কেরামদের একদল বলেন সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপর পানি হয়েছিল ১৫ হাত, আর আহলে কিতাবদের ধারণাও তাই।[১৭১] আবার কেউ কেউ বলেন পাহাড়ের উপর পানি হয়েছিল ৮০ হাত।[১৭২] নৌকা তাদেরকে নিয়ে তরঙ্গমাঝে পাহাড়ের ন্যায় চলতে লাগল।[১৭৩] উহা তাদেরকে নিয়ে সমগ্র পৃথিবী সফর করল, কোথাও স্থির রইল না। এভাবে ৬ মাস চলতে চলতে উহা হারাম শরীফে এসে পৌঁছল। কিন্তু হারামে প্রবেশ করল না; বরং হারামের চতুর্দিকে এক সপ্তাহ যাবৎ প্রদক্ষিণ করতে থাকল। দীর্ঘ ছয় মাস পর যখন অল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব সমাপ্ত হওয়ার আদেশ হল তখন হযরত নূহ (আ.) এর নৌকাটি জূদী পাহাড়ে গিয়ে স্থির হল।[১৭৪] যেমন আল্লাহ তা'আলার বানী, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ। অর্থাৎ "বলা হল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, আর হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। এরপর বন্যা প্রশমিত হল এবং আল্লাহ পাকের আদেশ পূর্ণ হল আর নৌকাটি জূদী পাহাড়ে গিয়ে থামল এবং ঘোষণা হল যে, ধ্বংস জালিম কাওমের জন্য ।"[১৭৫]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষনা হল- হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন।[১৭৬] তারপর হযরত নূহ (আ.)

---

১৬৯. আল-কুরআন, ১১ : ৪০।

১৭০. আল-কুরআন, ১১ : ৪৭।

১৭১. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), *তারীখুত তাবারী*, বৈরুত: দারুত তোরাছ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৭ হি., খ. ০১, পৃ. ১৮৫; আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১৭। ঐ, *কাছাছুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১০২।

১৭২. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১৭; ঐ, *কাছাছুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১০২।

১৭৩. আল-কুরআন, ১১ : ৪২

১৭৪. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), *তারীখুত তাবারী*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৮৫।

১৭৫. আল-কুরআন, ১১ : ৪৪।

১৭৬. আল-কুরআন, ১১ : ৪৮।

তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে নিরাপদে নৌকা থেকে অবতরণ করেন। অবতরণের দিনটি ছিল মহররমের ১০ তারিখ আশুরার দিন। নৌকায় নূহ (আ.) এবং তার সাথী ঈমানদারগন কত দিন ছিলেন এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা নৌকায় ১৫০ দিন অবস্থান করেছিলেন। আর কাতাদাহ (র.) এবং অন্যান্যরা বলেন, তারা নৌকায় আরোহন করেছিলেন রজব মাসের ১০ তারিখ, নৌকায় ভাসমান ছিলেন ১৫০ দিন এবং নৌকা তাদেরকে নিয়ে জূদী পাহাড়ে অবস্থান করেছিল এক মাস। অতঃপর নৌকা থেকে অবতরন করলেন মহররমের ১০ তারিখ আশুরার দিন।[১৭৭]

প্লাবনে নূহ পত্নী এবং এক পুত্র (কিনআন) সহ সকল কাফির পানিতে ডুবে মারা যায়। তাঁর তিন পুত্র যথাক্রমে সাম, হাম ও ইয়াফেছ এবং মুমিনগণ কিশতীতে আরোহণের ফলে বেঁচে যায়। বর্তমানে সমগ্র জগতের মানবকূল তাঁর এ তিন পুত্রেরই পরবর্তী বংশধর। নূহ (আ.) ছাড়া আর কারও বংশধর এ পৃথিবীতে বাকী থাকেনি।[১৭৮] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) হযরত সামুরা (রা.) এর সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন সাম হল আরবের আদি পুরুষ, হাম হাবসার আদি পুরুষ এবং ইয়াফেছ রোমের আদি পুরুষ। ইমাম তিরমিযী (র.)ও মারফূ সনদে একই রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১৭৯]

৫ম পরিচ্ছেদ

নূহ (আ.) এর প্লাবনের ব্যাপকতা

হযরত নূহ (আ.) এর মহা প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর উপর এসেছিল, না পৃথিবীর কোন এক বিশেষ অংশের উপর এসেছিল তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

আল্লামা আলী শীরীসহ ওলামায়ে ইসলামের একটি দল, ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ, জ্যোতির্বিদ এবং ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে এ প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর উপর সংঘটিত হয়নি; বরং সে অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে হযরত নূহ (আ.) এর জাতি বসবাস করত। যার আয়তন ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার।[১৮০] তাদের যুক্তি হল সে সময় ঐ অঞ্চল ব্যতীত অন্য জায়গায় মানুষের বসবাস ছিল না। আর আযাব যেহেতু শুধু নূহ (আ.) এর জাতির উদ্দেশ্যেই এসেছিল তাই আযাব কেবল তাদের অঞ্চলে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এছাড়া প্লাবন যদি সমগ্র পৃথিবীতে হত তাহলে তার কিছু চিহ্ন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যেত। তাদের অপর যুক্তি হল নূহ (আ.) এর জাতির এলাকা ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে যদি তখন মানুষের বসবাস থেকেও থাকে তবে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা

---

১৭৭. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১২০; মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৯০; ঐ, ***তাফসীরে তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩৩৬; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ফখরুদ্দীন রাযী (র.), ***মাফাতীহুল গায়ব (তাফসীরে কাবীর)***, বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ আল-আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি., খ. ১৭, পৃ. ৩৫৪।

১৭৮. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৯২।

১৭৯. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১৮।

১৮০. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনু. মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৬৫।

নূহ (আ.) কে প্রেরণ করেননি। নূহ (আ.) তাদেরকে সতর্কও করেননি। সুতরাং সতর্ক করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে নূহ (আ.) এর জাতির সাথে ধ্বংস করে দিবেন এটা অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হল তিনি পূর্বসতর্কীকরণ ব্যতীত কোন জাতিকে কখনও ধ্বংস করেন না। আল্লামা আলী শীরী তার নিজের মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমার ধারণা হল তখন সারা পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত না; বরং শুধু ঐ অংশেই বসবাস করত যে অংশে প্লাবন হয়েছিল। ফলে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নূহ (আ.) ও তার সঙ্গী সাথীগণ বাকী রয়েছেন।[১৮১]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) সহ একদল ওলামায়ে ইসলাম, বিচক্ষণ ভূ-তত্ত্ববিদ এবং কোন কোন জড়বাদী ঐতিহাসিকগণের মতে এ প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর উপর ব্যাপক ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জনগোষ্ঠীর উপর আযাব দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা ব্যাপকভাবেই দিয়ে থাকেন। এছাড়া জাযীরা কিংবা আরবের অংশ ছাড়াও অন্যান্য উচ্চ পর্বতসমূহের উপরে কখনও কখনও এমন প্রাণীসমূহের দেহ পিঞ্জর এবং হাড়-গোড় পাওয়া গিয়েছে যা সম্পর্কে ভূ-তত্ত্ববিদগণের অভিমত হল এগুলো জলজ প্রাণী; যা শুধু পানিতেই জীবিত থাকতে পারে। সুতরাং ভূ-গোলকের বিভিন্ন পর্বতের উপর ঐ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব এ কথা প্রমান করে যে, নূহ (আ.) এর প্লাবন সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছিল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ প্লাবনটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পৃথিবীর সমতল-অসমতল, পাহাড়-পর্বত, বসতিশুন্য এবং বালুকাময় সমগ্র এলাকাকে ব্যাপ্ত করেছিল এমনকি ভূ-পৃষ্ঠে ছোট-বড় কোন প্রাণী-ই বাকী রয়নি। এর সপক্ষে তিনি ইবনে আবী হাতেম (র.) এর থেকে দুটি রিওয়ায়াত নকল করেন। রিওয়ায়াত দুটি হল: ইমাম মালেক (র.) যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ যুগের অধিবাসীরা সমতল ভূমি এবং পাহাড় পর্বতে নেতৃত্ব দিত। আর আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন তখন পৃথিবীতে এমন কোনো ভূখন্ড ছিল না যার কোন মালিক এবং অধিকারী ছিল না।[১৮২] এ দুই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষের আবাস ছিল। তাই প্লাবন ও সমগ্র পৃথিবীতেই সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি শুধুমাত্র তার বংশধরদেরকেই পৃথিবীতে বাকী রেখেছি'।[১৮৩] এ আয়াতটি দ্বারাও প্লাবন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হওয়ার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

বাস্তব কথা হল হযরত নূহ (আ.) এর প্লাবনের পরিধি সম্পর্কে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট কোন নস্ নেই। সুতরাং প্লাবন সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে হওয়ার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি নির্দিষ্ট এলাকায় হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যেহেতু নূহ (আ.) কে প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেহেতু প্লাবন ব্যাপকভাবে হয়েছে বলেই অনুমিত হয়। কেননা প্লাবণ যদি নির্দিষ্ট এলাকায় হত তবে অন্যান্য এলাকায় সেসব প্রানী থেকে যেত যা নৌকায় তুলে নেয়ার প্রয়োজন হত না।

---

১৮১. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, মুহাক্কিক: আলী শীরী, দারু এহয়াইত তোরাছ আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খৃ., খ. ০১, পৃ. ১৩৪।

১৮২. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২; ঐ, ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬।

১৮৩. আল-কুরআন, ৩৭ : ৭৭।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
নূহ (আ.) এর জাতি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াবলী

১. উম্মতের দাঈ এবং নবীর উত্তরসূরী আলিম-ওলামাগণ দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার, নির্যাতন ভোগ করার মানসিকতা পোষণ করতে হবে। যেমন হযরত নূহ (আ.) দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তার উম্মতের পক্ষ থেকে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন।

২. হযরত নূহ (আ.) যেমনিভাবে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তার উম্মতের অবাধ্যতা ও নাফরমানী সত্ত্বেও তার দাওয়াতীকাজ চালিয়ে গেছেন, কখনও নিরাশ হননি তেমনিভাবে এ উম্মতের দাঈদেরও দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না।

৩. কাফির সন্তান কোন মুসলিম বাবার আহল তথা পরিবারভুক্ত হতে পারে না কেননা নূহ (আ.) এর পুত্র কিন'আন কাফির হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনে তাকে নূহ (আ.) এর আহল নয় বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

৪. পরিবারভুক্ত বা নিকটাত্মীয় হলেও কোন কাফিরের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিৎ নহে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে তার পুত্র কেনানের জন্য প্রার্থনা করার কারণে ধমক দিয়ে বলেন "সে তোমার আহল নয়"।

৫. কাফির যে-ই হোক না কেন তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। বংশগৌরব তার কোন কাজে আসবে না। যেমন নূহ (আ.) এর স্ত্রী নবীপত্নী হওয়া সত্ত্বেও মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পায়নি এবং কিন'আন নূহ নবীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও এমনকি নূহ (আ.) তার জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করা সত্ত্বেও রক্ষা পায়নি।

৬. ইবাদাতে অন্তরকে নিবিষ্ট করার জন্য ইন্তেকাল করে যাওয়া কোন বুযুর্গ থেকে প্রেরণা পেতে তার ছবি বা প্রতিমা যত্নসহকারে ঘরে অথবা উপাসনালায়ে সংরক্ষণ করা যাবে না। কেননা উহা মানুষকে একপর্যায়ে শিরক তথা মূর্তিপূজার দিকে নিয়ে যায়। যেমনটি হযরত নূহ (আ.) এর জাতির ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এমনিভাবে কোন বুযুর্গের কবরের উপর প্রাসাদ তৈরি করা, সাজসজ্জা করা এমনকি কবরকে অতিরিক্ত সম্মান করা ইত্যাদি পরিহার করা অনস্বীকার্য।

৭. আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজ শিল্পের সূচনা করেন যা ব্যবহার করে মানুষ বর্তমানেও উপকৃত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে।

৮. যুগে যুগে ঈমানদারগণ সমাজের দুর্বল ও গরীব শ্রেণির লোক হয়ে থাকেন। আর বে-দ্বীনরা হয় সমাজের সম্পদশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ। তবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সব সময় দুর্বল ঈমানদারদের পক্ষেই থাকে।

৯. ঈমান হলো সবচেয়ে বড় দৌলত। হক-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত দুর্বল ঈমানদারগণ-ই বিজয়ী হয়ে থাকেন এবং রক্ষা পেয়ে থাকেন আর বে-দ্বীনরা পরাজিত ও ধ্বংস হয়। যেমনটি হযরত নূহ (আ.) এর জাতির মধ্যেও ঘটেছিল।

১০. নবী-রাসূল ও দ্বীনের দাঈগণের উপর অত্যাচার এবং জুলুম করলে তার শেষ পরিণতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও গযব নেমে আসে। আর সেই গযবে অত্যাচারী গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত নূহ (আ.) এর জাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

১১. যখন কোন জাতির ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না এবং তাদের থেকে অনিষ্টতা ছাড়া আর কোন কিছু আশা করা যায় না তখন তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে বদদু'আ করার বৈধতা রয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আ.) তার জাতির জন্য বদদু'আ করেছিলেন।

৩য় অধ্যায়
আদ ও সামূদ জাতি

১ম পরিচ্ছেদ
আদ জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান

হযরত আদম (আ.) এর ইন্তেকালের দীর্ঘদিন পর আরবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী এক জাতির আবাদ হয়েছিল যাদেরকে পবিত্র কুরআনে 'আদ জাতি' বলা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় 'আদ' শব্দের অর্থ 'উচ্চ ও বিখ্যাত' আর ইরাম এবং ইসাম (সাম) শব্দদ্বয়ের অর্থও অনুরূপ। এ অর্থের প্রভাব আরবিতেও বিদ্যমান। আরবিতে এর অর্থ পার্বত্য/পাহাড়ী ও দিক নির্দেশক পাথর যা উচ্চ অর্থই বহন করে। হযরত নূহ (আ.) এর প্লাবনের পর তার অন্যতম পুত্র সাম এর বংশ আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। আদ জাতি ঐ বংশের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল যাদের বিভিন্ন গোত্রকে امم سامية বা সামী জনগোষ্ঠী বলা হত। এ আদ জাতি ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.) এর বংশের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এ জাতিকে আদ-ই ইরাম বলা হত। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আদ ও সামূদ জাতির বংশ তালিকা উপরের দিকে ইরাম এ গিয়ে মিলিত হয় বিধায় ইরাম শব্দটি আদ ও সামূদ উভয় জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৮৪] হযরত হুদ (আ.) এর জাতির নাম আদ জাতি। আদ হযরত নূহ (আ.) এর ৫ম পুরুষের মধ্যে এবং তার পুত্র সাম এর বংশধরের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম। পরবর্তীতে আদ নামক ব্যক্তির বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় আদ নামে খ্যাতি লাভ করে। বংশবৃদ্ধির ফলে আদ একটি বিশাল জাতিতে পরিণত হয়।

আদ আরব দেশের প্রাচীন গোত্র সাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিশেষ শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী একটি দলের নাম। আদ জাতির লোকেরা ছিল সুঠামদেহী ও দীর্ঘ আকৃতির। তারা ছিল প্রচন্ড কায়িক শক্তির অধিকারী। এছাড়া আর্থিক দিক থেকেও তারা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। সায়্যিদ সুলাইমান নদভীর মতে, আরবের সর্বপ্রথম ও প্রাথমিক বাসিন্দা ছিল أمم سامية (উমামে সামিয়া)। তারা বিভিন্ন কারণে আরব ভূমি থেকে বের হয়ে বাবিল, মিশর, শাম, প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আরব ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে أمم بائدة বা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা তারা তাদের দেশ আরব থেকে বের হয়ে অন্যত্র গিয়ে আসমানী গযবে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক তাদেরকে عرب عاربة (খাঁটি ও অবিমিশ্রিত আরব) বলে চিহ্নিত করেন। ইউরোপীয় বংশবিশারদগণ আরবের প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীকে কেবল সামী বলেই অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু আরবগণ তাদের প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীকে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত করেন। যেমন আদ, সামূদ, জুরহুম, লিহ্য়ান, জাদীস ইত্যাদি। এ সকল গোত্রের মধ্যে আদ ছিল সবচেয়ে বৃহৎ গোত্র। আরবদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা আরব ও আরবের বাহিরে বাবিল ও মিশরে বিশাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। উপরোক্ত সকল গোত্রকে আরব ঐতিহাসিকগণ ইরাম ইবনে সাম এর দিকে সম্বন্ধিত করেন। এজন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন বলেন, প্রথমে আদকে আদে ইরাম বলা হত। যখন তারা ধ্বংস হয়ে যায়

---

[১৮৪]. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৪৭।

তখন সামূদকে সামূদে ইরাম বলা হত। এরপর নমরূদকে নমরূদে ইরাম বলা হত।[১৮৫] এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে আদ জাতিকে আদে উলা এবং তাদের পরবর্তী সামূদ জাতিকে আদে সানিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

হযরত হুদ (আ.) ছিলেন আদ জাতির সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শাখা 'খুলুদ' গোত্রের সন্তান। তিনি বংশের দিক থেকে অভিজাত এবং সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সাদা লাল বর্ণের এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার দাড়ি ছিল সুদীর্ঘ।[১৮৬] আল-কুরআনের ভাষ্য, "আর আমি আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হুদ (আ.) কে প্রেরণ করেছি"।[১৮৭] আদ জাতিকে দৈহিক আকার আকৃতি ও শারিরীক শক্তি সামর্থের দিক থেকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৮৮] এ জাতির লম্বা লোকদের দৈর্ঘ্য ছিল চারশত হাত, মধ্যম লোকদের দৈর্ঘ্য ছিল দুইশত হাত এবং যারা একেবারে বেঁটে তাদের দৈর্ঘ্য ছিল সত্তর হাত।[১৮৯] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) হতে তাদের উচ্চতা ১২ হাত তথা ১৮ ফুট বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৯০] আবার আল্লামা কুরতুবী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের লম্বা লোকদের উচ্চতা ছিল ১০০ হাত এবং খাটো লোকদের উচ্চতা ছিল ৬০ হাত।[১৯১] বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, আল্লামা কালবী এবং সুদ্দী (র.) এর মতে তাদের খাটো লোকদের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ হাত এবং লম্বা লোকদের দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ হাত, আর আবু হামযা আল-ইয়ামানী (র.) এর মতে তাদের দৈর্ঘ্য ছিল ৭০ হাত, ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে ৮০ হাত এবং মুকাতিল (র.) এর মতে ১২ হাত।[১৯২] তাদের মত শক্তিশালী আর কোন জাতি তৎকালে পৃথিবীতে ছিল না। তারা এতই বিশালদেহী এবং শারিরীক শক্তিশালী ছিল যে, তারা পাথরের উপর পদাঘাত করলে হাঁটু পর্যন্ত পাথরের মধ্যে গেড়ে যেত। এদের একেকজন লোক বিরাট পাথরের খন্ড হাতে নিয়ে শত্রুগোত্রের উপর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারত। এরা স্থাপত্যশিল্পেও ছিল অনন্য। এরা অনেক সুরম্য ও মজবুত দালান কোঠা তৈরি করত।[১৯৩] শুধু তাই নয়, তারা এমন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মান করেছিল যার সমতুল্য কোন জাতি কোন দেশে নির্মান করতে পারেনি।[১৯৪] তারা সচ্ছলতা, ধন সম্পদ ও শিল্প বিজ্ঞানের বিচারে সমসাময়িক সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। তাদের শান-শওকত ও সার্বিক শক্তিমত্তা তাদেরকে অহংকারী, অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী

---

১৮৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

১৮৬. মোহাম্মদ রশীদ ইবনে আলী রেযা আল-হুসাঈনী, ***তাফসীরুল মানার***, আল হাইআতুল মিছরিয়্যাহ, প্রকাশ ১৯৯০ খৃ., খ. ০৮, পৃ. ৪৪১।

১৮৭. আল-কুরআন, ১১ : ৫১।

১৮৮. আল-কুরআন, ৭ : ৬৯; ৮৯ : ৮।

১৮৯. মূলঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদ: মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

১৯০. মুফতী মহাম্মদ শফী (রহ:), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫৪।

১৯১. ইমাম কুরতুবী (র.), ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৩৪৭।

১৯২. আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল উনদুলূসী (র.), ***আল-বাহরুল মুহীত***, বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রকাশ ১৪২০ হি., খ. ০৫, পৃ. ৮৮।

১৯৩. আল-কুরআন, ২৬ : ১২৯।

১৯৪. আল-কুরআন, ৮৯ : ৭-৮।

বানিয়ে দেয়। আদ জাতির আবির্ভাবের সময়কাল হল আনুমানিক খৃ. পূর্বাব্দ ৩০০০ সাল। তবে তাদের গৌরবময় সোনালী যুগ খৃ. পূর্বাব্দ ২২০০ সাল হতে শুরু করে খৃ. পূ. ১৭০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৯৫]

আদ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল 'আহক্বাফ' অঞ্চল।[১৯৬] ইহা হাযরামাউত ও ইয়েমেনের উত্তরে অবস্থিত। ইহার পূর্বে 'ওম্মান', উত্তরে 'রোবউলখালী', কিন্তু বর্তমানে এখানে বালিকাস্তুপ ছাড়া আর কিছুই নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, তাদের বসতি আরবের সর্বোৎকৃষ্ট বিস্তৃত অংশ হাযরামাউত ও উমানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যা পারস্য উপসাগরের উপকূল হতে ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইয়ামান ছিল তাদের রাজধানী।[১৯৭] আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এর মতে আদ জাতি ছিল একটি আরবী জাতি-গোষ্ঠী। তারা আল-আহক্বাফে বসবাস করত। আহক্বাফ হল বালির পাহাড়। ইহা ইয়েমেনে উমান ও হাযরামাউতের মধ্যখানে অবস্থিত। এ স্থানটি সমুদ্র উপকূলে বিস্তৃত ছিল। তাদের উপত্যকার নাম ছিল মুগীছ।[১৯৮] আল্লামা সুলাইমান নদভী (র.) তাঁর তারীখু আরদিল কুরআন গ্রন্থে 'বিলাদে আহক্বাফ' শিরোনামে লিখেন ইয়েমেন, উমান, বাহরাইন, হাযরামাউত এবং পশ্চিম ইয়েমেনের মধ্যবর্তী যে বিশাল প্রান্তর 'আদ-দুবনা' অথবা 'রোবউল-খালী' নামে পরিচিত বিশেষ করে হাযরামাউত হতে নাজরান পর্যন্ত যে বিশাল অঞ্চল বিস্তৃত সেখানেই আদ জাতির আবাসভূমি ছিল।[১৯৯]

জানা যায় যে, আদ জাতির নির্দিষ্ট বাসস্থান ইয়ামান হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত দক্ষিন আরব এবং পারস্য উপসাগরের তীর ঘেষে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মনে হয় বর্তমান ইয়েমেন, হাযরামাউত, উমান, কাতার আল-আহসা ইত্যাদি স্থানে আদ জাতির বসতি বিস্তৃত ছিল। এদের কেন্দ্রস্থল ছিল আহক্বাফ যা হাযরামাউতের উত্তরে, উমানের পশ্চিমে এবং রোবউল খালীর দক্ষিনে অবস্থিত। বর্তমানে আহক্বাফে বালির টিলা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ঐ যুগে হয়তো আহক্বাফ অঞ্চল সবুজ শ্যামল প্রান্তর ছিল।[২০০] আল্লামা জামীল আহমদ তার রচিত 'আম্বিয়ায়ে কুরআন' গ্রন্থে আদ জাতির আবাসভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, দক্ষিন-পূর্ব আরবে পারস্য উপসাগরীয় উপকূল হতে ইরাক সীমান্ত এবং দক্ষিন-পশ্চিমে (আরবে) হাযরামাওত পর্যন্ত আদ জাতির আবাসভূমি বিস্তৃত ছিল।[২০১] ইমাম বাগাভী (র.) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সনদে বর্ণনা করেন, আদ জাতির আবাসস্থল হল ইয়েমেনের আহক্বাফ অঞ্চল যা আম্মান এবং হাযরামাউতের মধ্যবর্তী একটি বালিকাময় অঞ্চল।[২০২]

---

১৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

১৯৬. আল-কুরআন, ৪৬ : ২১।

১৯৭. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনুবাদ: মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৯২। সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৪৮।

১৯৮. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১২০; ঐ, ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৩৭।

১৯৯. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫০।

২০০. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৪৯।

২০১. প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫০।

২০২. ইমাম বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ২০৪।

চিত্র ১ : আদ জাতির এলাকা :

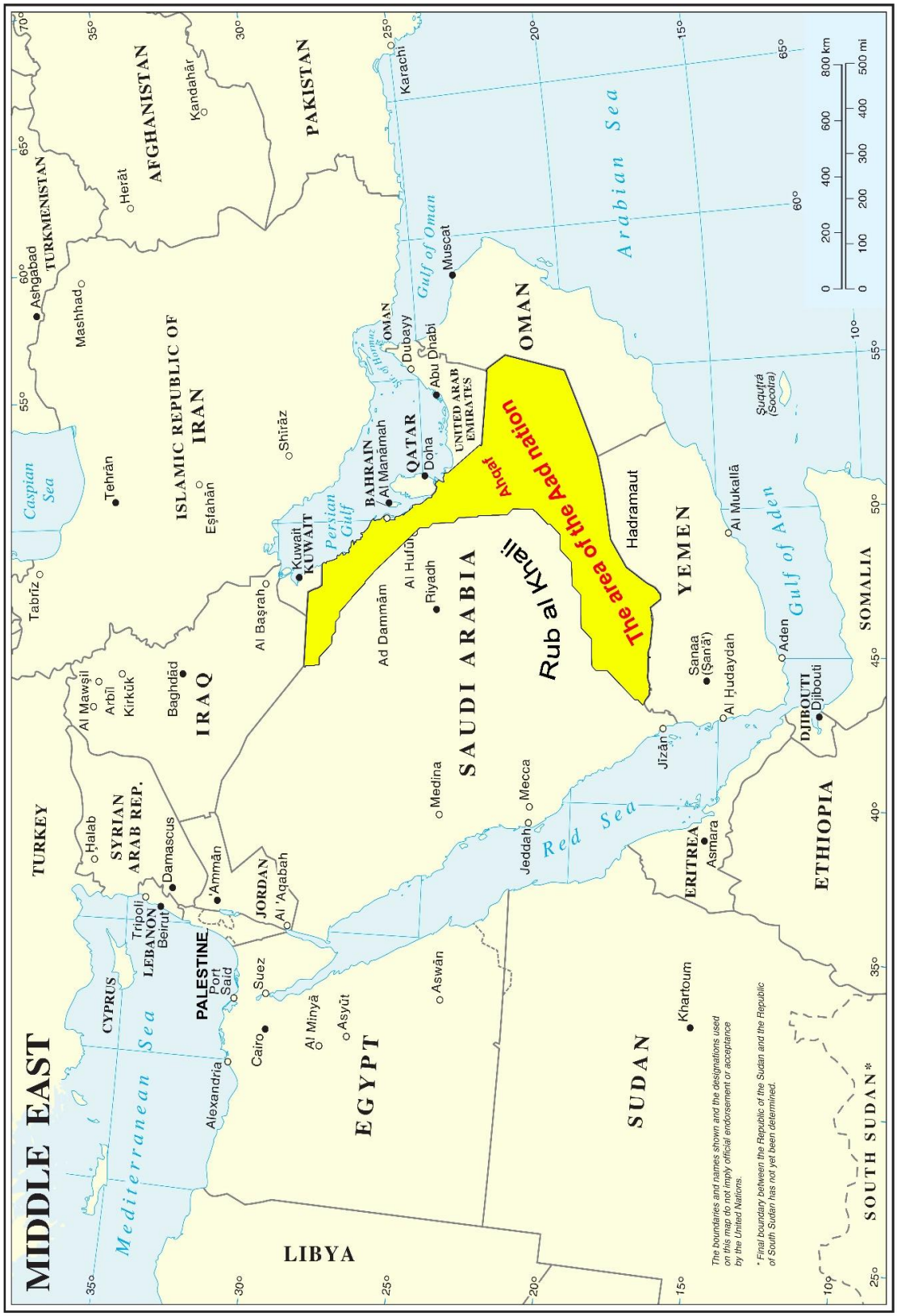

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত 'আহক্বাফ' অঞ্চল ছিল আদ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। আদ জাতির নির্দিষ্ট বাসস্থান ইয়ামান হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত দক্ষিন আরব এবং পারস্য উপসাগরের তীর ঘেষে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এদের কেন্দ্রস্থল ছিল আহক্বাফ যা হাযরামাউতের উত্তরে, উমানের পশ্চিমে এবং রাবউল খালীর দক্ষিনে অবস্থিত।

চিত্র ২ : আদ জাতির এলাকা :

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত 'আহক্বাফ' অঞ্চল ছিল আদ সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। সূত্র: সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫১।

২য় পরিচ্ছেদ

হুদ (আ.) এর দাওয়াত ও আদ জাতির অবাধ্যতা

আদ জাতি নূহ (আ.) এর পরবর্তী জাতি। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর জাতির পরে আদ জাতিকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন।[২০৩] দৈহিক শক্তি, ধন সম্পদ, স্থাপত্যশিল্প, জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি এমন কোন নিয়ামত নেই যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেননি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আদ জাতি এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিবেক ও চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, এ জাতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল মূর্তিপূজায়। নূহ (আ.) এর জাতির মত এরা ছিল মূর্তিপূজা এবং মূর্তি তৈরীতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তর মূর্তিকে তারা তাদের মাবুদ সাব্যস্ত করেছিল। আদ জাতি নূহ (আ.) এর জাতির মূর্তিসমূহ তথা ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ ও নাসর ইত্যাদি মূর্তিসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন, নিশ্চয় হযরত নূহ (আ.) এর তুফানের পর আদ জাতি-ই ছিল প্রথম মূর্তি পূজক। তাদের মূর্তি ছিল তিনটি, যথা ছাদ্দ, ছামূদ এবং হেরা।[২০৪] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তারা এক মূর্তির পূজা করত, উহাকে সামূদ বলা হত এবং আরও একটি মূর্তির পূজা করত, উহাকে আল-হাতার বলা হত।[২০৫] আদ জাতি নিজেদের দৈহিক অহংকারে এবং রাজত্বের জাঁকজমকে এতটাই মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের নিজেদের হাতে নির্মিত মূর্তিসমূহকে মাবুদ বানিয়ে নিয়ে সকল প্রকার শয়তানী কাজ আরম্ভ করে দিল। আর তখনই আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আ.) কে তাদের প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেন। মোটকথা- আদ জাতি মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজায় এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে, তারা কোনক্রমেই হযরত হুদ (আ.) এর দাওয়াত গ্রহণ করেনি, এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে তার ইবাদাত করেনি। তারা তাদের অধিকৃত এলাকায় সদম্ভে বিচরণ করত। তারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিসমূহের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করত। নিজেদের শক্তিমত্তায় তারা কাউকেও পরওয়া করত না।

আদ জাতি ছিল পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, সীমালংঘনকারী, মূর্তি পূজক, এবং অত্যাচারী জাতি। তারা যখন তাদের শক্তিমত্তায় উন্মত্ত হয়ে আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটপাট, অসৎ কার্যকলাপ, ঝগড়া ফাসাদ ও বিশৃংখলায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য হযরত হুদ (আ.) কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। হুদ (আ.) তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, হে আদ জাতি! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার নিয়ামতরাজি দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছেন। তোমরা সবুজ ও সতেজ অঞ্চলের মালিক হয়েছ। গবাদি পশু, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, বাগান, ঝর্ণা, ইত্যাদি সকল জীবনোপকরণ তোমাদের জন্য সহজলভ্য।[২০৬] নূহ (আ.) এর জাতির পর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব দান

---

২০৩. আল-কুরআন, ৭ : ৬৯।

২০৪. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১২১; ঐ, ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, দারু হিজর, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৮৩।

২০৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫২, আবদুল ওয়াহাব আন-নাজার রচিত কাছাছুল আম্বিয়া গ্রন্থ সুত্রে বর্ণিত ; মোহাম্মদ রশীদ ইবনে আলী রেযা আল-হুসাঈনী, ***তাফসীরুল মানার***, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ৪৪১।

২০৬. আল-কুরআন, ২৬ : ১৩৩-১৩৪।

করেছেন। তাই বলে তোমরা আল্লাহর যমীনে অহংকার করবে, দূর্বলের উপর জুলুম করবে, মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিবে, নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, ভাল-মন্দের কোন পার্থক্য করবে না তা হতে পারে না। তোমরা মনে করো না যে আল্লাহর যমীনের উপর তোমাদের জবাবদিহি নেয়ার মত কেউ নেই। তোমরা যদি এ সকল পাপাচার পরিত্যাগ করে তোমাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন কর এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও তবে তিনি তোমাদের শক্তিমত্তা, সচ্ছলতা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আরও উন্নতি দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের কৃতকর্মের সংশোধন না কর তবে মনে রেখ তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদের স্থলে সম্পূর্ণ নতুন এক জাতিকে রাজত্ব দান করবেন।

হুদ (আ.) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার এবং মানুষের উপর সকল প্রকার জুলুম করা থেকে বিরত থাকার দাওয়াত দেন।[২০৭] কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বলল, আপনিতো আমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা আমাদের বাপ দাদার উপাস্য দেব-দেবীগুলো বাদ দিতে পারব না। আর আমরাতো আপনাকে বিশ্বাস করি না; বরং আমাদের ধারণা আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংগতিপূর্ণ কথা বলছেন।[২০৮] হুদ (আ.) নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি বিমুখ। এখন তোমরা এবং তোমাদের দেবতারা সকলে মিলে আমার যা ইচ্ছা ক্ষতি করতে পার কর। এতে আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশও দিও না। আর আমি এত বড় কথা এ জন্য বলছি যে, আমি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখি যার হাতের মুঠোয় রয়েছে সকল কিছু।[২০৯] তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না। হযরত হুদ (আ.) এর জবাবে তাদের দুটি অভিযোগের-ই উত্তর হয়ে গেছে। তিনি এত বড় ক্ষমতাধর একটি জাতিকে তার ক্ষতি করার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। এরপরও তারা তার একটি কেশও স্পর্শ করতে পারেনি। বস্তুত এটা ছিল তার মু'জিযা। এর দ্বারা তাদের সে অভিযোগের জবাব হয়ে গেল যে, আপনিতো কোন মুজিযা দেখালেন না। আর তারা যে বলত, আমাদের কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল হয়ে গেছে। কেননা যদি দেবতাদের কোন ক্ষমতা থাকত তাহলে এত বড় চ্যালেঞ্জ ঘোষণার পর তারা তাকে জীবিত রাখত না।

হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে অবিরাম ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তিনি বললেন, তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক তবে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব আপতিত হবে। তোমরা সমূলে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন। তোমরা যা করছ তোমাদেরই ক্ষতি করছ, আল্লাহর কোন ক্ষতি করছ না। আমার দায়িত্ব হল যথাযথভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া, আমি তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কাফেরের দল কোন কথায়-ই কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর

---

২০৭. মোহাম্মদ রশীদ ইবনে আলী রেযা আল-হুসাঈনী, ***তাফসীরুল মানার***, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ৪৪১।

২০৮. আল-কুরআন, ১১ : ৫৩-৫৪।

২০৯. আল-কুরআন, ১১ : ৫৪-৫৬।

অটল ও অবিচল রইল। তারা অহংকার ও গর্বের সহিত বলতে লাগল, "আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আবার কে"?[২১০] আজ সারা পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে অধিক জাঁকজমক ও ক্ষমতার মালিক আর কে আছে? 'তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান। পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাসই এসব কথাবার্তা বলা, আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না'।[২১১] আমরা এখন আর তোমার প্রাত্যহিক উপদেশ ও নসীহত শুনতে পারছি না। "যদি তুমি প্রকৃতই সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তুমি সত্বর সেই আযাব আনয়ন কর যে আযাবের ওয়াদা তুমি দিচ্ছ"।[২১২]

৩য় পরিচ্ছেদ

আদ জাতির উপর আপতিত আযাব ও তাদের ধ্বংসের বিবরণ

আদ জাতির দুষ্টামি, নবীর প্রতি তাদের শত্রুতা ও বিরোধ যখন চরমে পৌঁছল এবং তা আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানল তখন তিনি আসমানী আযাবের সিদ্ধান্ত নিলেন। অকৃতজ্ঞ আদ জাতির যখন অন্তিম সময় এসে গেল তখন তাদের অন্যায় অপকর্মের শাস্তি শুরু হয়ে গেল। সর্বপ্রথম আযাব দুর্ভিক্ষের আকারে দেখা দিল। আল্লাহ তা'আলা একাধারে তিন বছর পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে রাখলেন। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যতার ফলে তারা মারা যেতে থাকল। এতে আদ সম্প্রদায় ঘাবড়ে গেল, তাদেরকে খুবই দুর্বল মন ও অক্ষম দেখা যেতে লাগল। তখন স্বজাতির প্রতি সমবেদনার জোস হুদ (আ.) কে উদ্বুদ্ধ করল। নিরাশ হওয়ার পর তিনি আরও একবার কাওমকে বুঝালেন যে তোমরা আল্লাহর পথ ধর। আমার উপদেশাবলীর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এটাই ইহকাল এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ। তখন তার সম্প্রদায়ের নেতাগন বলল, সে তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে, তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি-বাঁচি এখানেই, আমরা পুনরুত্থিত হব না। সেতো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আর আমরা তার প্রতি বিশ্বাসী নই।[২১৩] তারা হুদ (আ.) কে আরও বলল, আমরা তোমার অল্লাহর ইবাদাত করব না, আমাদের বাপ-দাদা যে সব মূর্তির পূজা করেছে আমরা সেগুলোরই পূজা করব। তুমি আল্লাহর যে আযাব সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ পারলে তা আমাদের উপর আপতিত কর।[২১৪] নতুবা আমরা তোমাকে হত্যা করব। তখন হযরত হুদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এদের আযাব থেকে রক্ষা করুন, এদের সাথে আমার লড়ার ক্ষমতা নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা হুদ (আ.) এর প্রতি নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার

---

২১০. আল-কুরআন, ৪১ : ১৫।

২১১ . আল-কুরআন, ২৬ : ১৩৬-১৩৮।

২১২. আল-কুরআন, ৭ : ৭০।

২১৩. আল-কুরআন, ২৩ : ৩৮-৩৯।

২১৪. আল-কুরআন, ৭ : ৭০

৭০ জন সাথী নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ কর। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক হযরত হুদ (আ.) তার ৭০ জন সঙ্গী নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন।[২১৫]

এ দিকে আদ জাতির লোকেরা তাদের ছয় জনের একটি দল পানি প্রার্থনার জন্য মক্কাশরীফে প্রেরণ করল। এদের প্রত্যেকে আবার তাদের সাথে একদল করে সঙ্গী-সাথী নিল যাদের সংখ্যা প্রায় সত্তরে পৌঁছবে।[২১৬] তারা সেখানে গিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করল হে আল্লাহ! আমরা আমাদের জাতির জন্য আপনার নিকট পানি প্রার্থনা করছি। অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে সাদা, কালো ও লাল রংয়ের তিন খণ্ড মেঘ উঠে আসল। আকাশ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসল, যে তোমরা এ তিন প্রকারের মেঘ থেকে যে কোন একটি বেছে নাও। তারা ভাবল সাদা এবং লাল মেঘের তুলনায় কালো মেঘে পানি বেশী হবে। তাই তারা কালো মেঘ খণ্ডটি নির্বাচন করে নিল। আল্লাহর হুকুমে কালো মেঘ তাদের সাথে সাথে তাদের এলাকায় এসে পৌঁছল। এদিকে আদ জাতি অত্যন্ত আনন্দিত ও খুঁশি প্রকাশ করতে লাগল যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর সাহায্য আসছে। তারা বলতে লাগল "এটা মেঘ আমাদের উপর বর্ষিত হবে"।[২১৭] তারা ঠাট্টা বিদ্রূপের স্বরে বলতে লাগল, ওহে হুদ! তুমি না বলেছ আমাদের উপর আযাব আসবে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। কই, কোথায় আযাব? এখনতো দেখি আমাদের প্রার্থনা মোতাবেক বৃষ্টি আসছে। তাদের জবাবে হুদ (আ.) বলেন "বরং তোমরা যে জন্য দ্রুত করছ, এটা সে বাতাস যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব। সে তার পালনকর্তার নির্দেশে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে"।[২১৮]

অতঃপর বাতাশ শুরু হয়ে গেল। একাধারে সাত রাত আট দিন পর্যন্ত ঝড় তুফান বইতে লাগল।[২১৯] গাছ পালা উপড়ে পড়ল। দালান বিল্ডিং ধ্বংস হয়ে গেল। বাতাসের প্রবলতায় মানুষ ও সকল জীব জানোয়ার শুন্যে উত্থিত হয়ে একে অপরের সাথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাদের হাড় গোড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে দুমড়ে মুচড়ে উপুড় হয়ে যমীনে পড়ল।[২২০] এভাবে আল্লাহ তা'আলা আদ জাতির মত একটি শক্তিশালী জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) এবং কাতাদাহ (র.) এর মতে এদের শাস্তি শাওয়াল মাসের শেষ দিকে এক বুধবারে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত স্থায়ী হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন জাতি বুধবার ছাড়া অন্য দিনে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না।[২২১]

মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে বাহরে মুহীত গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করেন, যখন আদ জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ হয় তখন হযরত হুদ (আ.) এবং তার সঙ্গীরা একটি কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘুর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হুদ (আ.) ও তার সঙ্গীরা

---

২১৫. মূল আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনু. মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
২১৬. হুসাইন উবনে মাসউদ বাগাভী (র.), তাফসীরে বাগাভী, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ২০৪।
২১৭. আল-কুরআন, ৪৬ : ২৪।
২১৮. আল-কুরআন, ৪৬ : ২৪-২৫।
২১৯. আল-কুরআন, ৬৯ : ৭।
২২০. আল-কুরআন, ৫১ : ৪২।
২২১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৫ পৃ. ৩৪৮; আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল উনদুলূসী (র.), ***আল-বাহরুল মুহীত***, প্রাগুক্ত, খ. ০৯, পৃ. ২৯৬।

ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন, তাদের কোন কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই তার ওফাত হয়।[২২২] তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে, ইমাম বুখারী (র.) তার তারীখ গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত হুদ (আ.) কে হাযরামাউতে একটি লাল বালিকাস্তুপের নিকটে দাফন করা হয়। তার মাথার পাশে একটি কুল বৃক্ষ রয়েছে। আবার ইবনে আসাকির (র.) উসমান বিন আবুল আতিকাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, দামেশকের মসজিদের সামনে হযরত হুদ (আ.) কে দাফন করা হয়। আবুশ শায়খ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত্যুকালে হযরত হুদ (আ.) এর বয়স হয়েছিল ৪৭২ বছর।[২২৩]

আলোচ্য সূরায় বলা হয়েছে আদ জাতি ঝড় তুফানের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। আবার সূরা মু'মিনূনে বলা হয়েছে তারা বিকট আওয়াজে ধ্বংস হয়েছে।[২২৪] এর সমাধানে বলা যায়, হতে পারে দুই প্রকার আযাবই এসেছিল। প্রথমে ঝড় তুফান এসেছিল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তার সাথে বিকট আওয়াজ যুক্ত হয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, মুফাসসিরীনে কেরামগণের ভাষ্য মতে হযরত হুদ (আ.) এবং নূহ (আ.) এর মধ্যে সাত পুরুষের ব্যবধান ছিল। আদ জাতির মধ্যে মোট ১৩ টি কাবীলাহ বা পরিবার ছিল।[২২৫] এ জাতির মধ্যে যারা হযরত হুদ (আ.) এর সাথে ঈমান এনেছিল তাদের সংখ্যা কারো কারো মতে ছিল ৪০০০ আবার কারো কারো মতে ছিল ৩০০০।[২২৬]

৪র্থ পরিচ্ছেদ
সামূদ জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান

সামূদ ছিল আরবের একটি পৌত্তলিক জাতি। এ জাতিকে তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ সামূদ ইবনে আমির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.) এর নামে সামূদ নামকরণ করা হয়। আল্লামা ছালাবী (র.) বলেন, সামূদ ইবনে আদ ইবনে আওছ ইবনে ইরাম ইবনে নূহ (আ.) এর নামে নামকরণ করা হয়। ثمد শব্দটি আরবি, এর অর্থ হল স্বল্প পানি। এ জাতিকে সামূদ নামে নামকরণের কারণ হল, সাধারণত পানি কম হলে বলা হয়ে থাকে ثمد الماء, যেহেতু এ জাতি পানি সংকটে জর্জরিত থাকত, তাই তাদেরকে সামূদ বলা হত।[২২৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ (আ.) কে পাঠালাম।" এ কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, হযরত সালেহ (আ.) এর জাতির নাম 'সামূদ'

---

২২২. মুফতী মহাম্মদ শাফী' (রহ:), ***তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

২২৩. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, ***তাফসীরে ফাতহুল কাদীর***, দামেশক, বৈরুত; দারু ইবনে কাছীর ও দারুল কালিম আত-তাইয়্যেব, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি., খ. ০২, পৃ. ২৫০।

২২৪. আল-কুরআন, ২৩ : ৪১।

২২৫. ইমাম কুরতুবী (র.), ***তাফসীরে কুরতুবী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ২৩৬ এবং খ. ০৯, পৃ. ৫৪।

২২৬. প্রাগুক্ত; আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-উনদুলূসী (র.), ***আল-বাহরুল মুহীত***, প্রাগুক্ত, খ.০৬, পৃ. ১৭০।

২২৭. আল্লামা আলূসী (র.), ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪১৫ হি., খ. ৪, পৃ. ৪০০।

জাতি এবং তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। সামূদ জাতি 'সামের' একটি শাখা এবং এরা হল ঐ সমস্ত মুমিন যারা আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার পর হযরত হুদ (আ.) এর সাথে আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ জাতি অট্টালিকা নির্মাণ শিল্পে বিশেষ দক্ষ ও পারদর্শী ছিল। যেমন কুরআনের ভাষ্য "আর তোমরা স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমীনে স্থান দিলেন। ফলে তোমরা যমীনের নরম অংশের উপর দালান কোঠা নির্মাণ করছ এবং পাথর কেটে পাহাড়ের উপর বাড়ীঘর নির্মাণ করছ।"[২২৮] আদ জাতিকে যেমনিভাবে 'আদে এরাম'[২২৯] বলা হয়েছে তেমনিভাবে আদ জাতির পরবর্তীতে সামূদ জাতিকে 'সামূদে এরাম' বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়।

হুদ (আ.) এর ইন্তেকালের পর তার সঙ্গী-সাথী মুমিনরা প্রায় একশত বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতঃপর তাদের বংশধররা দীর্ঘ বছর পর্যন্ত দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা তাদের দ্বারা আবাদ হয়। তারা সৃষ্টিকূলকে দ্বীন ও ঈমানের পথ প্রদর্শন করে। একদিন অভিশপ্ত শয়তান এসে তাদেরকে বলল তোমরা কার উপাসনা করছ? তারা জবাবে বলল, আমরা আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করি। শয়তান বলল তাকে কি তোমরা দেখতে পাও? তারা জবাব দিল, না। অতঃপর শয়তান তাদেরকে বলল তোমরা পাথর দ্বারা একটি প্রতিমা বানিয়ে তোমাদের উপাসনালয়ে রাখ। তাহলে সেটি কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে গেল এবং একটি প্রতিমা তৈরি করে তাদের উপাসনালয়ে রেখে দিল। কিছুদিন পর শয়তান এসে তাদেরকে বলল, তোমরা এ প্রতিমাটিকে সিজদা কর। শয়তানের কথা মোতাবেক তারা প্রতিমাকে সিজদা করা আরম্ভ করে দিল এবং তারা কাফির হয়ে গেল। তারা মূর্তিপূজকে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং পর্যায়ক্রমে তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে বহু বাতিল মাবুদের পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এরা আদ জাতির মতই মূর্তিপূজা করত।[২৩০]

সামূদ জাতির সময়কাল সম্পর্কে আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার ও মাওলানা হিফজুর রহমান বলেন, এ সম্পর্কে ইতিহাস নীরব থাকার ফলে এ জাতির সময়কাল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তমূলক তথ্য প্রদান করা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ জাতির যুগ হল হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পূর্বেকার যুগ। এরা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বহু পূর্বে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞগণের অভিমতে সামূদ জাতি হল আদ জাতির অবশিষ্ট অংশ আর ইহাই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত।[২৩১] আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন এরা ছিল আদ জাতির পরবর্তী জাতি।[২৩২]

---

২২৮. আল-কুরআন, ৭ : ৭৪।

২২৯. আল-কুরআন, ৮৯ : ৭।

২৩০. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৪৫।

২৩১. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৬৭ ও ২৭০; কাসাসুল কোরআন-হিফজুর রহমান ও কাসাসুল আম্বিয়া-আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার এর সূত্রে বর্ণিত।

২৩২. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৪৫।

সামূদ জাতির আবাস ছিল 'হিজর' নামক এলাকায়।[২৩৩] এ জন্য কুরআনুল কারীমে তাদেরকে 'আসহাবুল হিজর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩৪] হিজায এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'ওয়াদিয়ে কোরা' নামক স্থান পর্যন্ত যে বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর রয়েছে সেটাই সামূদ জাতির আবাসস্থল। বর্তমানে এ এলাকাটি "ফাজ্জুন্নাক্বাহ" নামে পরিচিত। হিজরের এ স্থানটি মাদইয়ান শহর হতে দক্ষিন পূর্ব দিকে এমনভাবে অবস্থিত যে, 'আকাবা' উপসাগর উহার সম্মুখে পড়ে।[২৩৫] আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এরা ছিল আরবে আরিবাহ। এরা হিজর নামক এলাকায় বসবাস করত যা হিজায এবং তাবুকের মধ্যখানে অবস্থিত। রাসূল (স.) যখন মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তাবুকের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন তিনি উহার নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন।[২৩৬] ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, আদ জাতির আবাস ছিল হিজর নামক মরু এলাকায় যা ওয়াদিউল কোরা নামে পরিচিত। উহা হিজায ও শাম এর মধ্যবর্তী স্থানে আঠারো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।[২৩৭] ড. জাওয়াদ আলী নিহায়াতুল আরব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করার পর সামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। আদ জাতির আবাসভূমি আবাদ করে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে। তারা ছিল দশের অধিক গোত্রে বিভক্ত আর তাদের আবাসভুমি ছিল হিজায এবং শামের মধ্যবর্তী স্থান। উহা হল ওয়াদিউল কোরা এর অন্তর্গত হিজর নামক এলাকা।[২৩৮]

---

২৩৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), *সহীহুল বুখারী*, দারু তাওকিন নাজাত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি., খ. ০৪, পৃ. ১৪৮।

২৩৪. আল-কুরআন, ১৫ : ৮০।

২৩৫. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনু মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

২৩৬. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৪৫।

২৩৭. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি., খ. ১২, পৃ. ৫২৭।

২৩৮. ড. জাওয়াদ আলী, ***আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম***, পাদটীকা, দারুস সাকী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২২ হি., ২০০১ খৃ., খ. ০১, পৃ. ৩২৪।

চিত্র ১: সামূদ জাতির এলাকা :

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত 'হিজর' নামক এলাকাটি ছিল সামূদ জাতির আবাস যা হিজায এবং তাবুকের মধ্যখানে অবস্থিত। হিজরের এ স্থানটি মাদইয়ান শহর হতে দক্ষিন পূর্ব দিকে এমনভাবে অবস্থিত যে, 'আকাবা' উপসাগর উহার সম্মুখে পড়ে।

চিত্র ২ : সামূদ জাতির এলাকা :

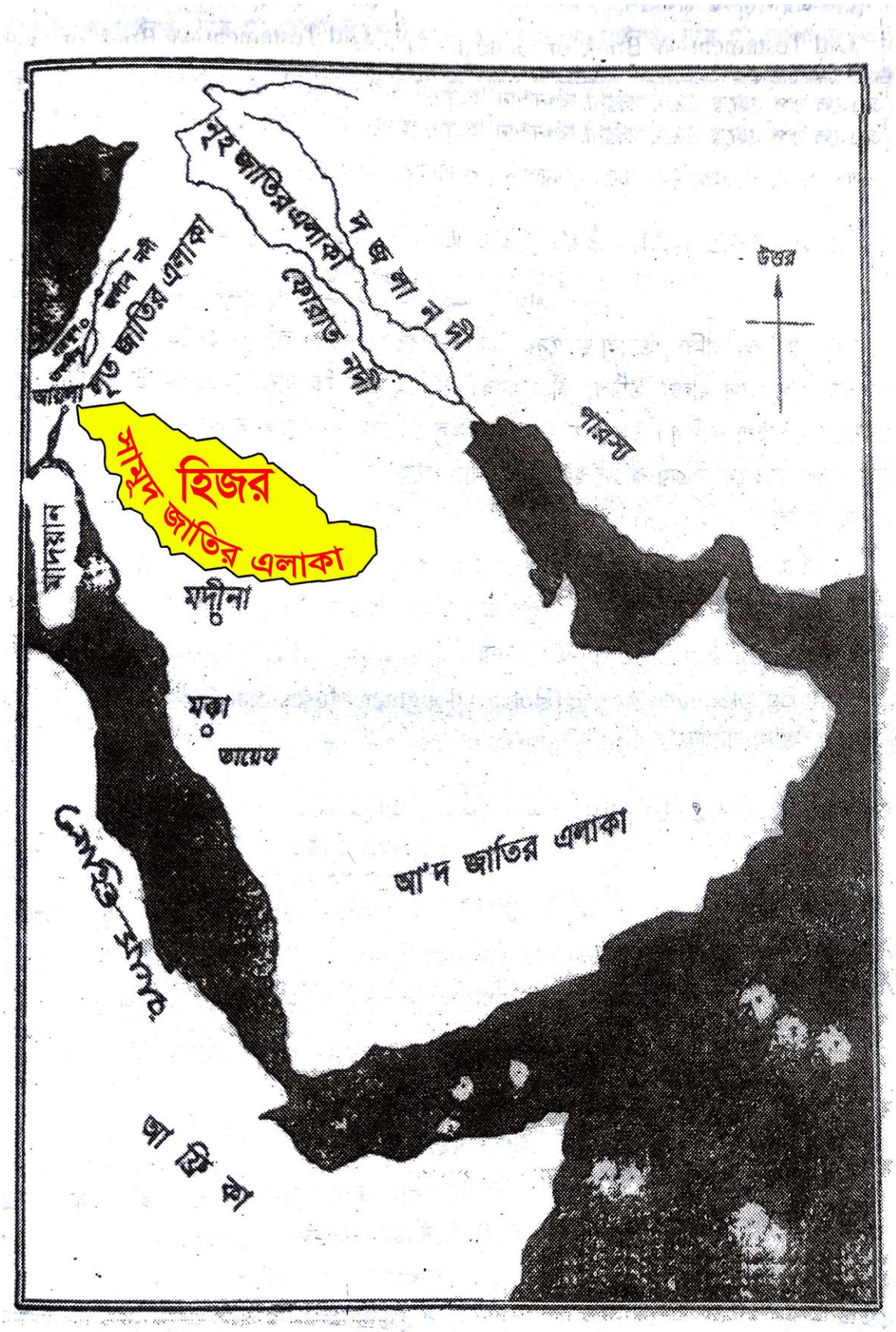

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত 'হিজর' নামক এলাকাটি ছিল সামূদ জাতির আবাস। সূত্র: সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৫৭।

৫ম পরিচ্ছেদ

সালিহ (আ.) এর দাওয়াত ও সামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সামূদ জাতি দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত। এরা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আদ সম্প্রদায়ের ঈমানদার লোকদের পরবর্তী বংশধর। আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলে সামূদ জাতি তাদের আবাসভুমি আবাদ করে এবং তথায় বসবাস করতে থাকে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকলেও কালক্রমে তারা মূর্তিপূজায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। খুবই প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করার কারণে তারা পৃথিবীতে ফিৎনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সালিহ (আ.) কে প্রেরণ করেন। সালিহ (আ.) তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান করেন। তাদেরকে অহংকার ও জুলুম পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করার দাওয়াত দেন। যুবক অবস্থায় প্রেরিত হয়ে দাওয়াতী কাজ করতে করতে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন। এ দীর্ঘকাল দাওয়াতী কাজ করার পরেও তাদের মধ্যকার গুটি কয়েক দূর্বল শ্রেণির লোক ব্যতীত আর কেহই তার দাওয়াতে সাড়া দেয়নি। বরং তারা আল্লাহর একত্ববাদ এবং হযরত সালেহ (আ.) এর নবুয়তকে অস্বীকার করল এবং বলল তুমি যে আল্লাহর নবী তার প্রমাণ কি? তারা সালিহ (আ.) এর নিকট মু'জিযা দাবী করে বলল তুমি যদি বাস্তবেই আল্লাহর প্রেরিত নবী হয়ে থাক তবে আমাদেরকে কোন নিদর্শন দেখাও যাতে আমরা তোমার সত্যতা বিশ্বাস করতে পারি। সালিহ (আ.) বললেন দেখ এমন যেন না হয় যে, নিদর্শন দেখানোর পরেও তোমরা গোমরাহীর উপর অটল থাক। তখন কাওমের সর্দারগন মজবুতির সাথে ওয়াদা করল যে, নিদর্শন দেখানোর পর তারা ঈমান আনবে। অতঃপর সালিহ (আ.) বললেন তোমরা কী নিদর্শন চাও? তাদের সর্দার জুনদা বলল আমাদের জন্য হিজরের পার্শ্বস্থিত এ 'কাছেবাহ' নামক পাথর হতে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের করুন যা বের হয়েই বাচ্চা প্রসব করবে।[২৩৯]

হযরত সালিহ (আ.) দুই রাকা'আত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন। তখন আল্লাহর হুকুমে ঐ বিরাট পাথরটি বিস্ফোরিত হয়ে তা থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের হয়ে আসল। উষ্ট্রীটি ছিল নজিরবিহীন। নিজেই নিজের উদাহরণ। উষ্ট্রীটি পাথর থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ পরই বাচ্চা প্রসব করল। ইহা দেখে জুনদা ও তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক হযরত সালিহ (আ.) এর উপর ঈমান আনল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকেরা তার উপর ঈমান আনার ইচ্ছা করল। কিন্তু তাদের উপাসনালয়ের কিছু অভিজাত লোক যথাক্রমে যুআব ইবনে আমর, তাদের প্রতিমাবলীর তত্ত্বাবধায়ক হবাব এবং গণক রাবাব ইবনে মাইমাআর তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিল। ফলে অধিকাংশ লোকই ঈমান আনা থেকে বিরত রইল। অতঃপর সালিহ (আ.) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হয়ে পড়লেন যে, এদের উপর হয়তো আযাব এসে যেতে পারে। তাই তিনি কাওমের লোকদেরকে সতর্ক করে বললেন দেখ, তোমাদের দাবীর প্রেক্ষিতে এ নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হল তোমরা এ উষ্ট্রীটিকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না, এটি

---

২৩৯. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ:), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭।

স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করবে। তাহলে হয়তো তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পার। এর ব্যত্যয় ঘটলে তোমরা ভয়াবহ আযাবে নিপতিত হবে।[২৪০]

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং তাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাত এ উষ্ট্রীটিও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। একটি আশ্চর্যের বিষয় হল উষ্ট্রীটি যখন পানি পান করত তখন কূপের পানি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যেত। কূপটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত উটনীটি কূপ থেকে মুখ তুলত না যা সালিহ (আ.) এর জাতির জন্য একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। ফলে সালিহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী কূপ থেকে পানি পান করবে আর একদিন তোমরা পানি পান করবে।[২৪১] যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে সেদিন তোমরা উষ্ট্রীর দুধ পান করবে। এ দুধের দ্বারা তোমাদের পানির প্রয়োজন মিটে যাবে। যদি তোমাদের দ্বারা উষ্ট্রীর কোন ক্ষতি হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠিন আযাব আপতিত করবেন। সামূদ জাতি যদিও এ মুজিযা দেখে ঈমান আনল না তথাপিও তারা উষ্ট্রীকে যে কোন ধরনের কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করা থেকে বিরত রইল। কারণ তারা জানত যে, এ মুজিযা সত্য। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে লাগল। লোকেরা একদিন পানি পান করত আর একদিন উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা উপকৃত হত। আর উষ্ট্রীটিও উহার বাচ্চা সহ নির্বিঘ্নে চারণভূমিতে চরে বেড়াত এবং তৃপ্তি লাভ করত।

কাল ক্রমে এই উটনীটি তাদের জন্য কষ্টকর হতে লাগল। উটনীটির বৈশিষ্ট্য ছিল সেটি গ্রীষ্ম কালে উপত্যকার বাহিরে থাকত তখন তাদের গৃহপালিত পশুগুলি উপত্যকার অভ্যন্তরে আশ্রয় নিত। আবার উষ্ট্রীটি শীতকালে উপত্যকার ভিতরে চলে আসত তখন তাদের পশুগুলি উপত্যকার বাহিরে পালিয়ে যেত। এটা তাদেরকে খুব যন্ত্রনা দিত। এটা ছিল সামূদ জাতির জন্য একটি পরীক্ষা যা তাদের জন্য বিরাট মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে সামূদ জাতির মধ্যে দুইজন ধনাঢ্য মহিলা ছিল যাদের একজনের নাম উনায়যা বিনতে গানাম তথা উম্মে গানাম যার অত্যন্ত সুন্দরী রূপসী কয়েকজন মেয়ে ছিল। অপর জনের নাম সাদূফ যে নিজেই ছিল অতি সুন্দরী। এদের অনেক পালিত পশু ছিল। সালিহ (আ.) এর উষ্ট্রীটি তাদের গৃহপালিত পশুগুলির কষ্টের কারণ ছিল। তাই তারা দুজনই সালিহ (আ.) এর ঘোরতর শত্রু ছিল এবং তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করতে অতি উৎসাহী ছিল। তাদের মধ্যে শলা পরামর্শ হতে লাগল যে, উষ্ট্রীটিকে খতম করে দিতে পারলে আমরা ঝামেলা মুক্ত হতে পারতাম। কেননা আমাদের জন্য এবং আমাদের জীবজন্তুগুলোর জন্য এ শর্তটি মানা অসহনীয় যে, আমরা একদিন পানি পান করব আর উষ্ট্রীটি একদিন পানি পান করবে। কিন্তু কেউ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করতে সাহস পাচ্ছিল না। তখন তাদের মধ্যকার 'সাদূফ' নাম্নী রূপসী ও ধনবতী মহিলাটি নিজেকে 'মাসদা' নামক এক যুবকের সামনে পেশ করে বলল তুমি যদি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আমাকে পাবে। উনায়যা নামক অপর ধনবতী মহিলাটি তার সুন্দরী রূপসী কন্যাদেরকে 'কেদার' নামক যুবকের সামনে পেশ করে বলল তুমি যদি উটনীটিকে হত্যা করতে পার তবে আমার যে মেয়ে তোমার পছন্দ হয় তাকে তোমার অধীনে দিয়ে দেব। আর তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত ভোগ করতে পারবে।

---

[২৪০]. আল-কুরআন, ৭ : ৭৩।

[২৪১]. আল-কুরআন, ২৬ : ১৫৫।

তারা এ কাজের জন্য রাজি হয়ে গেল এবং তারা এ কাজে তাদের আরও ৭ জন সাহায্যকারীও ঠিক করে নিল। ফলে ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা হল ৯ জন। তারা পরামর্শ করল যে, উটনীটি যখন পানি পান করার জন্য যাবে তখন তারা পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। যখনই উটনীটি তাদের নাগালের ভিতরে আসবে তখনই তারা উহাকে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবে। যেমন পরামর্শ তেমন কাজ। তারা পূর্ব থেকেই পথে বড় একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রইল। যখনই উষ্ট্রীটি পানি পান করার জন্য যাচ্ছিল তখনই মিছদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল।[২৪২] উষ্ট্রীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন সে এগিয়ে এসে তরবারী দিয়ে তার পা দুটি কেটে দিল আর কেদার তরবারী দিয়ে তার গলা কেটে দিল। এভাবে তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেলল। পবিত্র কুরআনুল কারীম তাকে জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগা আখ্যা দিয়েছে।[২৪৩] কেননা তার কারণেই গোটা জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। এদিকে উটনীর বাচ্চাটি তার মায়ের হত্যাকান্ড দেখে চিৎকার দিয়ে পাহাড়ে পলায়ন করল এবং ঐ পাথরে অদৃশ্য হয়ে গেল যে পাথর থেকে তার মাতা বের হয়েছিল। আল্লামা ইবনে ইসহাক বলেন- উষ্ট্রীটির হত্যাকারী নয়জনের মধ্যে চারজন বাছুরটির অনুসরণ করেছিল। তারা বাছুরটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তা উহার হৃদযন্ত্রে আঘাত হানল। অতঃপর তারা বাছুরটিকে পা ধরে টেনে হেঁচড়ে বের করে আনল এবং হত্যা করে ফেলল।

এ ঘটনা জানার পর হযরত সালিহ (আ.) তার জাতিকে সম্বোধন করে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন যে, পরিশেষে আমি যা আশংকা করেছি তাই ঘটল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা করতে থাক। এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল আর মাত্র ৩ দিন।[২৪৪] এরপর তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথা সর্বজন বিধিত যে, কোন জাতির ধ্বংস যখন ঘনিয়ে আসে তখন আর কোন উপদেশ এবং কোন হুঁশিয়ারি তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়না। হযরত সালিহ (আ.) এর জাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারা উল্টো সালিহ (আ.) কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, এ শাস্তি কোথা থেকে আসবে? কিভাবে আসবে? এর লক্ষণ কী হবে? সালিহ (আ.) বললেন তাহলে তোমরা আযাবের লক্ষণ শুনে নাও। প্রথম দিন তোমাদের মুখমন্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, দ্বিতীয় দিন তোমাদের মুখমন্ডল লাল হয়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন তোমাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে।[২৪৫] আর এটাই হবে তোমাদের জীবনের সর্বশেষ দিন।

সালিহ (আ.) এর কাওমের লোকেরা তাঁর কথা শুনে কোন প্রকার তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল না; বরং ঐ নয় ব্যক্তি যারা উষ্টীটিকে হত্যা করেছিল তারা হযরত সালিহ (আ.) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। তারা চিন্তা করল যদি সালিহ (আ.) এর কথা সত্য হয় তবে আমরা ধ্বংস হওয়ার আগে তাকে ধ্বংস করে দেই না কেন? আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে সে মিথ্যা বলার সাজা ভোগ করুক। সালিহ (আ.) এর একটি ইবাদাত গৃহ ছিল। তিনি সেখানে ইবাদাত বান্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তারা রাতের বেলায় হযরত সালেহ (আ.) কে হত্যা করার জন্য ঐ ইবাদাতখানার দিকে রওয়ানা দিলে আল্লাহ

---

২৪২. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ আল আলূসী, ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৪০৫।
২৪৩. আল-কুরআন, **৯১ : ১২**।
২৪৪. আল-কুরআন, **১১ : ৬৫**।
২৪৫. আল্লামা আলূসী (র.), ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ২৮৯।

তা'আলা পিরিশতাদের দিয়ে তাদেরকে শিলাবৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেন।[২৪৬] এদিকে তাদের সঙ্গী সাথীরা তাদের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে সালেহ (আ.) কে বলল তুমি তাদেরকে হত্যা করেছ। এই বলে তারা সালেহ (আ.) কে হত্যা করার মনস্থ করল। তখন তার পরিবার পরিজনের লোকেরা বাঁধ সাধল। তারা বলল সালিহ (আ.) তো ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। যদি তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় তবে এর ফলে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তোমরা পরক্ষণে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। ফলে তারা পিছু হটল।

অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম দিন বৃহস্পতিবার তাদের সকলের মুখমন্ডল হলুদ হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পর তারা যখন বুঝতে পারল যে তাদের ধ্বংস নিশ্চিত তখন তারা হযরত সালিহ (আ.) এর প্রতি আরো চটে গেল। তারা হযরত সালিহ (আ.) কে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে ঘুরা ঘুরি করতে লাগল। এরপর দ্বিতীয় দিন তাদের মুখমন্ডল যখন লাল হয়ে গেল তখন তারা তাদের উপর আপতিত আযাব ও গযব নিয়ে আরও আতংকগ্রস্ত হয়ে গেল। তাই তারা সালিহ (আ.) কে হত্যা করার পরিকল্পনা পরিহার করতে বাধ্য হল। তৃতীয় দিন তাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে গেল। তখন তারা তাদের জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে এটাই তাদের জীবনের শেষ দিন। তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার পর যখন চতূর্থ রাত্রি আসল তখন হযরত সালিহ (আ.) ঈমানদারগণকে সাথে নিয়ে জনপদ থেকে বের হয়ে সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে ফিলিস্তিনের রামাল্লা এলাকায় তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন। আর চতূর্থদিন যখন সকাল হল তখন তারা একে অপরের সাথে তাদের চেহারা বিকৃতির কথা বলাবলি করতে লাগল। তারা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আযাবের অপেক্ষা করতে থাকল। তারা কাফনের কাপড় পরে সুগন্ধি নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে একবার অকাশের দিকে তাকায় আরেকবার যমীনের দিকে তাকায়, কারণ তারা জানে না কোন দিক থেকে তাদের উপর আযাব আসবে। এমতাবস্থায় চতুর্থ দিন সকালে যখন সূর্যের আলো প্রখর হয়ে উঠল তখন নিচ থেকে ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট আওয়াজ হল। ফলে সবাই এক সাথে ধ্বংস হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সামূদ জাতির মত একটি শক্তিশালী জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

আল্লামা সুদ্দী (র.) উষ্ট্রীটির হত্যার ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত সালিহ (আ.) এর নিকট অহী পাঠালেন যে তোমার কাওমের লোকেরা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেলবে। একদিন হযরত সালেহ (আ.) বসা ছিলেন। এমন সময় তার জাতির দশ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তার খেদমতে উপস্থিত হন। তখন হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সংবাদটি জানিয়ে দেন। তারা বলল, আমরা কখনও এমন কাজ করব না। তখন সালিহ (আ.) বললেন এ মাসে এমন একজন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে যে উষ্ট্রীটি হত্যা করে ফেলবে এবং তার হাতেই রয়েছে তোমাদের গোটা জাতির ধ্বংস। তখন তারা বলল না, আমরা তা হতে দেব না; বরং এ মাসে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে আমরা সবগুলিকে হত্যা করে ফেলব। ঘটনাক্রমে তার নিকট উপস্থিত দশজনের সকলের স্ত্রী-ই তখন গর্ভবতী ছিল। আল্লাহর হুকুমে দশজনের সকলের স্ত্রী-ই ওই মাসে পুত্র সন্তান প্রসব করে। তাদের দশজনের নয় জনই ওয়াদা মোতাবেক তাদের নবজাত শিশুকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু তাদের একজনের কোন সন্তানাদি

---

[২৪৬]. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৮১।

ছিল না। তাই সে স্নেহাতিশয্যে তার নবজাত সন্তানকে হত্যা না করে রেখে দেয়। তার নাম রাখা হয় কেদার। এ ছেলেটি খুব দ্রুত সময়ে বেড়ে ওঠা শুরু করে। সে এক দিনে ঐ পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যান্য ছেলেরা এক সপ্তাহে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর এক মাসে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যান্য ছেলেরা এক বছরে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে অত্যন্ত সুদর্শন ও বীর-বাহাদুর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে ঐ নয় ব্যক্তি যারা তাদের সন্তানকে হত্যা করেছিল তারা কেদারের বীরত্ব ও বলবিক্রম দেখে ঈর্ষান্বিত ও দুঃখিত হয়ে আফসোসে ফেটে পড়ে। তারা বলা-বলি করতে থাকে যে, আমাদের সন্তানগুলো যদি জীবিত থাকত তাহলে তারাও এমন হত। এ কারণে তারা হযরত সালিহ (আ.) এর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়। কেননা সালিহ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বানীই তাদের পুত্র হত্যার মূল কারণ। তাই তারা হযরত সালিহ (আ.) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তাদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ অর্থাৎ আর শহরে নয় ব্যক্তি ছিল যারা যমীনে দুষ্কৃতি করে বেড়াত এবং কল্যাণকর কোন কাজ করত না।[২৪৭] তারা হযরত সালিহ (আ.) কে হত্যা করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে। তারা পরামর্শ করে যে, আমরা সফরের নামে এলাকা থেকে বের হয়ে যাব। অতঃপর আমরা একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহন করব যাতে লোকজন মনে করে আমরা সফরে গিয়েছি। রাত্রিকালে বের হয়ে আমরা সালিহ (আ.) এর মসজিদে গিয়ে তাকে অক্রমন করে হত্যা করে ফেলব। হত্যার কাজ সম্পন্ন করে আমরা পুনরায় গুহায় ফিরে যাব। পরবর্তীতে আমরা এলাকায় এসে বলব আমরাতো সফরে ছিলাম, আমরা এ হত্যা প্রত্যক্ষ করিনি। এতে তারা আমাদেরকে সত্যবাদী বলে মেনে নিবে। সালিহ (আ.) মসজিদে অবস্থান করতেন। তিনি পরিবার পরিজনের সাথে গ্রামে থাকতেন না। তাঁর মসজিদটিকে বলা হত মসজিদে সালিহ। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যখন এই নয় ব্যক্তি একটি গুহায় অবস্থান নিল তখন আল্লাহর হুকুমে গুহাটি ধ্বসে পড়ল আর তারা সকলে মাটির নীচে চাপা পড়ে মারা গেল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ অর্থাৎ তারা এক চক্রান্ত করেছিল আর আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। কিন্তু তারা উহা বুঝতে পারেনি।[২৪৮] সামূদ জাতির মধ্যে যারা এ চক্রান্ত সম্পর্কে জানত তারা এই নয় ব্যক্তিকে প্রত্যাবর্তন করতে না দেখে ঐ গুহার মুখে এসে দেখল যে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই তারা সেখান থেকে জনপদে পিরে এসে হট্টগোল লাগিয়ে দিল। তারা বলতে লাগল হে লোক সকল! সালিহ শুধুমাত্র ঐ নয় সন্তানকে হত্যা করিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং সে তাদের পিতাদেরকেও হত্যা করে ফেলেছে। ইহার ফলস্বরূপ তারা হযরত সালিহ (আ.) এর উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার উপর ঐক্যমত পোষণ করল। ইবনে ইসহাক বলেন তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার পর সালিহ (আ.) কেও হত্যা করার ব্যাপারে শপথ করেছিল। আল্লামা সুদ্দী (র.) ও অন্যান্যরা বলেন, বেঁচে যাওয়া ঐ দশম সন্তান অর্থাৎ কেদার যখন পরিণত বয়সে উপণীত হল তখন সে অন্যান্যদের সাথে আসন গ্রহণ করত। তারা মদ্যপানে অভ্যস্থ ছিল। একদা তারা মদপানের নেশায় মত্ত হয়ে উঠল। তখন মদ বানানোর জন্য তাদের পানির প্রয়োজন দেখা দিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ছিল উষ্ট্রীর পানি পানের পালা। তারা পানি খুজতে গিয়ে দেখল উষ্ট্রী সব পানি পান করে নিয়েছে। এটা তাদেরকে অত্যন্ত পীড়া দিল। তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে

---

[২৪৭]. আল-কুরআন, ২৭ : ৪৮।

[২৪৮]. আল-কুরআন, ২৭ : ৫০।

বলল আমরা দুধ দিয়ে কী করব? এর থেকে পানি-ই আমাদের জন্য ভাল ছিল। আমাদের জন্তুগুলি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করত, আমাদের কৃষি ক্ষেত তা দ্বারা সিঞ্চিত হত, এটাইতো আমাদের জন্য অধিকতর কল্যানকর ছিল। ইহা শুনে কেদার বলল, আমরা বরং উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেলি। তখন তারা সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হল। অতঃপর সে উহাকে হত্যা করে ফেলল।[২৪৯]

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে 'আবু রেগাল' নামক এক ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ রক্ষা পায়নি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে তাকে রক্ষা করেছিলেন। অবশেষে সে যখন মক্কার হেরেম থেকে বের হয়ে যায় তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও আপতিত হয় এবং সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। রাসূল (স.) সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের কবর দেখান আর বলেন তার সাথে একটি স্বর্ণের ছড়িও দাফন করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়।[২৫০]

সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, "তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূল (স.) সামূদ জাতির ধ্বংস হওয়ার স্থান হিজর নামক এলাকার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমাদের কেউ যেন এ বিধ্বস্ত এলাকার কূপের পানি পান না করে এবং এর পানি সংগ্রহ না করে। তারা বলল আমরাতো উহা দ্বারা আটার খামির করেছি এবং তা সংগ্রহ করেছি। রাসূল (স.) নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা খামির ফেলে দাও এবং পানি ঢেলে দাও। [২৫১] সহীহ বুখারী শরীফের অপর বর্ণনায় আছে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন "তোমরা শাস্তিপ্রাপ্ত এ জাতির জনপদে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করিও না। আর যদি ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করতে না পার তবে প্রবেশ করিও না। যেন তাদেরকে যে শাস্তি পেয়েছে তা তোমাদেরকে না পায়"।[২৫২] অন্য বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নেন এবং দ্রুত ঐ উপত্যকা থেকে প্রস্থান করেন।

স্বজাতির ধ্বংসের পর হযরত সালেহ (আ.) এর সাথে চার হাজার মু'মিন ছিল। তিনি তাদেরকে নিয়ে ইয়েমেনের 'হাযরামাউতে' চলে যান এবং সেখানে তার ওফাত হয়। ফলে ঐ শহরের নাম হয় হাযরামাউত। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি সেখান থেকে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই তার ওফাত হয়। তখন তার বয়স ছিল ৫৮ বছর আর তিনি তার কাওমের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন ২০ বছর। কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে হেরেম শরীফের মধ্যেই তাদের কবর রয়েছে।[২৫৩] ইমাম আবুল কাসেম আল-আনসারী বলেন, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, আমি স্বচক্ষে সিরিয়ার আক্কাহ শহরে হযরত সালিহ (আ.) এর কবর দেখে এসেছি, সুতরাং কিভাবে তা হাযরামাউতে হতে পারে?[২৫৪] তাফসীরে রূহুল মাআনীর বর্ণনা মোতাবেক স্বজাতির ধ্বংসের পর হযরত সালেহ (আ.) সে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে

---

২৪৯. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.), তাফসীরে কাবীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০৫।

২৫০. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ আল আলূসী, ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৪০৫।

২৫১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), ***সহীহুল বুখারী***, দারু তাওকিন নাজাত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি., খ. ০৪, পৃ. ১৪৮, হাদিস নং ৩৩৭৮।

২৫২. ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৯৪, হাদিস নং ৪৩৩।

২৫৩. আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথী (র.), তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৩৭৭-৩৮১।

২৫৪ . আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী, ***আত তাফসীরুল কাবীর***, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ২৩৩।

যান। এ সময় তার সাথে মুমিনদের সংখ্যা ছিল ১২০ জন আর ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার পরিবার।[২৫৫]

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাদের ঘটনাপুঞ্জ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়াবলী

১. নবীগণ, দাঈগণ ও সংস্কারকগণ সাধারণত উপদেশদাতা হয়ে থাকেন। তারা কেবল বিনা স্বার্থে আন্তরিকতার সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যান। তারা সাধারণত শাসক শ্রেণির মধ্যে থাকেন না। অর্থাৎ তাদের ক্ষমতার বল ও প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে না।

২. সমাজের নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বেশীরভাগই শয়তানের দোসর হয়ে থাকে এবং তারা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন সামূদ জাতির নেতৃস্থানীয় নয়জন ব্যক্তি, তারা পুরো সামূদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

৩. সাধারণত সমাজের দুর্বল শ্রেণির লোকেরা নবী-রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়। আর ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা নবী-রাসূলগনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকে।

৪. আল্লাহ তা'আলা সাধারণত বান্দাকে নেয়ামত দান করেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, বান্দা নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করে কি না? যদি শুকরিয়া আদায় করে তবে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন। আর যদি নেয়ামতের কুফরী করে, অহঙ্কার ও সীমালংঘন করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নেন সাথে সাথে তাদেরকে দুনিয়া থেকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। যেমনটি আদ ও সামূদ জাতির ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

৫. নবী ও সংস্কারকগনের বিরূদ্ধে শাসক শ্রেণি অত্যাচার ও নির্যাতন করলে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব ও গযব নেমে আসে যা প্রতিহত করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির থাকে না। আদ ও সামূদ জাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

৬. যে কোন জাতির ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় ফিৎনা হল নারী। আর সামূদ জাতির দু ব্যক্তি যথাক্রমে মিসদা ও কেদার নারীর লোভে পড়ে নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে এবং স্বজাতিকেও ধ্বংস করেছে।

৭. মাদক হল সকল পাপের মূল। মাদকাসক্ত হয়ে মানুষ যে কোন ভয়ংকর কাজ করতেও দিধাবোধ করে না। কারণ তখন তার বিবেক শক্তি হারিয়ে যায়। কেদার ও তার মজলিসের লোকেরা মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়েই মূলত আল্লাহর উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল যা সামূদ জাতির ধ্বংসকে তরান্বিত করে।

---

[২৫৫]. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ আল আলূসী, ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৪০৫।

৮. অর্থই সকল অনর্থের মূল। অবিশ্বাসীরা মূলত দুনিয়াবী স্বার্থেই হক্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। সামূদ জাতির দুই ধনাঢ্য মহিলা তাদের পশুপাল ও ফসলাদির স্বার্থেই আল্লাহর উষ্ট্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল এবং উহাকে হত্যা করার জন্য মিসদা ও কেদারকে সে কাজে প্রলুব্ধ করেছিল।

৯. অহংকারীদের অন্তর হয় কঠিন। যেমন ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক তারা শুধু উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং তারা তার বাছুরটিকেও হত্যা করে ফেলেছে, যা চরম নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ।

১০. অহংকারীদের জুলুমের যেমন কোন সীমা থাকে না তেমনি তারা বিপদ দেখলেও নমনীয় হয় না; বরং তাদের অহংকারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন হযরত সালেহ (আ.) এর ঘোষণা মোতাবেক প্রথম দিন তাদের চেহারা যখন হলুদ হয়ে গেল তখন তারা নমনীয় না হয়ে, তাওবা না করে বরং সালেহ (আ.) কে হত্যা করতে উদ্ধত হয়েছিল যা চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন।

১১. সমাজের মুষ্টিমেয় দুষ্ট লোকদের কারণে পুরো সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই সমাজবাসীকে নিজেদের বাঁচার জন্য ঐ মুষ্টিমেয় লোকদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে অথবা তাদের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা হকের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত বাস্তবায়িত হতে দেন না; বরং তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে তার সমুচিৎ জবাব দিয়ে থাকেন। যেমন সালিহ (আ.) কে হত্যা করতে যাওয়া লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা মাটি চাপা দিয়ে এবং পাথরের বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১৩. হক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা হকের-ই বিজয় দিয়ে থাকেন আর বাতিলের পরাজয় হয়ে থাকে।

১৪. আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির উপর আসমানী আযাব ও গযব নাযিল করলে উহা থেকে নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারীগণকে রক্ষা করেন। যেমন হযরত সালিহ (আ.) ও তার অনুসারীগণকে আল্লাহ তা'আলা কাওমের উপর আপতিত আযাব থেকে রক্ষা করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
লূত (আ.) এর জাতি ও মাদইয়ানবাসী

১ম পরিচ্ছেদ
লূত (আ.) এর জাতি ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান

হযরত লূত (আ.) ছিলেন পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত ২৫ জন মহান নবীর একজন। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ভ্রাতুষ্পুত্র তথা তার সহোদর ভাই হারানের পুত্র। ইবরাহীম (আ.) এর পিতা তারেখ এর বয়স যখন ৭৫ বছর তখন তার যথাক্রমে ইবরাহীম, নাহূর ও হারান নামক তিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে আবার হারানের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যার নাম লূত। তাদের মাতৃভূমি ছিল ইরাকের বসরা নগরীর বাবিল শহরে। লূত (আ.) এর পিতা হারান স্বীয় পিতা তারেখ এর জীবদ্দশায় তাদের জন্মস্থান বাবিল শহরেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন ঐতিহাসিকদের নিকট এটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ অভিমত। হাফেজ ইবনে আসাকির হিশাম ইবনে আম্মার এর সনদে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর জন্মস্থান দামেস্কের বারযাহ নামক জনপদ বলে উল্লেখ করার পর তিনি নিজেই বলেন, তবে বিশুদ্ধ মতে তার জন্ম বাবিল শহরে। হযরত লূত (আ.) এর শিশুকালেই তার পিতা হারান মৃত্যুবরণ করেন, তাই তিনি পিতৃব্য ইবরাহীম (আ.) এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে থাকেন। ঐ সুবাদে তিনি নিঃসন্তান ইবরাহীম (আ.) এর অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে তার অন্তরের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তিনি তার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যান, সম্ভবত এ কারণেই তার নাম লূত রাখা হয়। কেননা অভিধানে لوط (لاط) الشيء بالشيء বাবে নাসারা থেকে, এর অর্থ হলো لصق به অর্থাৎ তার সাথে জড়িয়ে গেল, মিলে গেল। যেমন বলা হয় لاط الشيء بقلبي অর্থাৎ বস্তুটি আমার অন্তরের সাথে মিলে গেল।[২৫৬] যেহেতু হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে মিলে গিয়েছিলেন তাই তার নাম রাখা হয় লূত।

অতঃপর তারেখ স্বীয় পুত্র ইবরাহীম, ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহ ও লূত (আ.) কে সাথে নিয়ে কালদানীদের এলাকা বাবিল থেকে কিনআনীদের এলাকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে হাররান নামক এলাকায় উপনীত হন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। সেটা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দেশ। অতঃপর তারা হাররানে বসতি স্থাপন করেন।[২৫৭] এ শহরটি ছিল নক্ষত্র ও মূর্তি পূজার প্রাণকেন্দ্র। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পরিবারও ছিল মূর্তিপূজায় লিপ্ত। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে। নমরূদ তাকে অগ্নিকুণ্ডলীতে পুড়ে মারার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। তার পিতা তাকে গৃহ থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পরিবারের মধ্যে শুধুমাত্র তার সহধর্মিনী সা'রা (আ.) এবং স্বীয় ভাতিজা লূত (আ.) ব্যতীত আর কেউ তার উপর ঈমান আনেনি। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে নিয়ে দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত

---

২৫৬. ইবরাহীম মোস্তফা প্রমূখ, ***আল-মুজামুল ওয়াসীত***, দেওবন্দ, কুতুবখানায়ে হুসাইনিয়াহ, জানুয়ারী ২০০৩ খৃ., পৃ. ৮৪৬।

২৫৭. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৬১।

ইবরাহীম (আ.) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন যা বাইতুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত। হাকিম নিশাপুরী তার মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন গ্রন্থে কা'বে আহবার থেকে বর্ণনা করেন যে, লূত (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবী এবং ইবরাহীম (আ.) এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ছিলেন শুভ্র, চমৎকার মুখাবয়ববিশিষ্ট সরু নাসিকা, কর্ণদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, লম্বা আঙ্গুল বিশিষ্ট, উজ্জল দন্তবিশিষ্ট এবং হাস্যোজ্জল। তাঁর হাসিতে গাম্ভীর্যপুর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটত।[২৫৮]

হযরত লূত (আ.) যখন তার চাচা ইবরাহীম (আ.) এর সাথে বাবিল থেকে সিরিয়ায় হিজরত করে জর্দানে অবস্থান নেন তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.) কে নবুয়ত দান করে তাকে জর্দান ও বাইতুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' এলাকায় প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূদ, আরূম, সাউর ও সা'বূর অথবা সুগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল।[২৫৯] পবিত্র কুরআনে এদেরকে একত্রে 'মু'তাফেকাহ'[২৬০] ও 'মু'তাফেকাত'[২৬১] (উল্টানো জনপদবাসী) শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এসব শহরের মধ্যে সাদূমই ছিল কেন্দ্রস্থল বা রাজধানী। হযরত লূত (আ.) সাদূমেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার জমিন ছিল খুবই উর্বর। এখানে সকল প্রকার ফসল ও ফলের প্রাচুর্যতা ছিল। মৌলিক বিবেচনায় হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায় তার স্বগোত্রীয় ছিল না। কেননা হযরত লূত (আ.) বাবিল থেকে হিজরত করে হাররানে আসেন আর সেখান থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাদূমে নবীরূপে প্রেরণ করেন। সুতরাং পবিত্র কুরআনে যে, সাদূমবাসীকে হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়[২৬২], লূতের ভাতৃবৃন্দ[২৬৩], তাঁর জাতি[২৬৪] এবং লূত (আ.) কে তাদের ভ্রাতা[২৬৫] বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেটা মূলত এ জন্য যে, তাকে তাদের হিদায়াতের জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

জর্দানের যেখানে বর্তমানে বাহরে মাইয়্যেত বা বাহরে লূত অবস্থিত সেখানেই সাদূম ও আমূরা গোত্রদ্বয়ের বস্তিগুলো বিদ্যমান ছিল। ঐ এলাকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস যে, বর্তমানে যা সমুদ্ররূপে দৃষ্ট হচ্ছে উহা কোন এক কালে শুকনা ভূমি ছিল। আর উহার উপর শহর বিদ্যমান ছিল। সাদূম এবং আমূরা সম্প্রদায়ের বসতি এখানেই ছিল। প্রথম থেকে ইহা সমুদ্র ছিল না। পরবর্তীতে যখন লূত (আ.) এর জাতির উপর আযাব আসল এবং ভূখন্ডটিকে উল্টিয়ে দেয়া হল তখন উহা প্রায় চারশত মিটার নিচে চলে গেল এবং উহার উপর পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল তখন উহা সমুদ্ররূপ ধারণ করল। এ জন্যই এর নাম 'বাহরে মাইয়্যেত'(Dead sea) বা 'বাহরে লূত' রাখা হয়েছে।

---

২৫৮. আবু আবদুল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আন নিশাপুরী, ***আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৬১২, হাদিস নং ৪০৫৭।

২৫৯. আবু আবদুল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আন নিশাপুরী, ***আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হি., ১৯৯০ খৃ., খ. ০২, পৃ. ৬১২, হাদিস নং ৪০৫৮।

২৬০. আল-কুরআন, ৫৩ : ৫৩।

২৬১. আল-কুরআন, ৯ : ৭০; ৬৯ : ৯।

২৬২. আল-কুরআন, ১১ : ৭০,৭৪; ২২ : ৪৩।

২৬৩. আল-কুরআন, ৫০ : ১৩।

২৬৪. আল-কুরআন, ৭ : ৮০।

২৬৫. আল-কুরআন, ২৬ : ১৬১।

চিত্র ১: লূত (আ.) এর জাতির এলাকা :

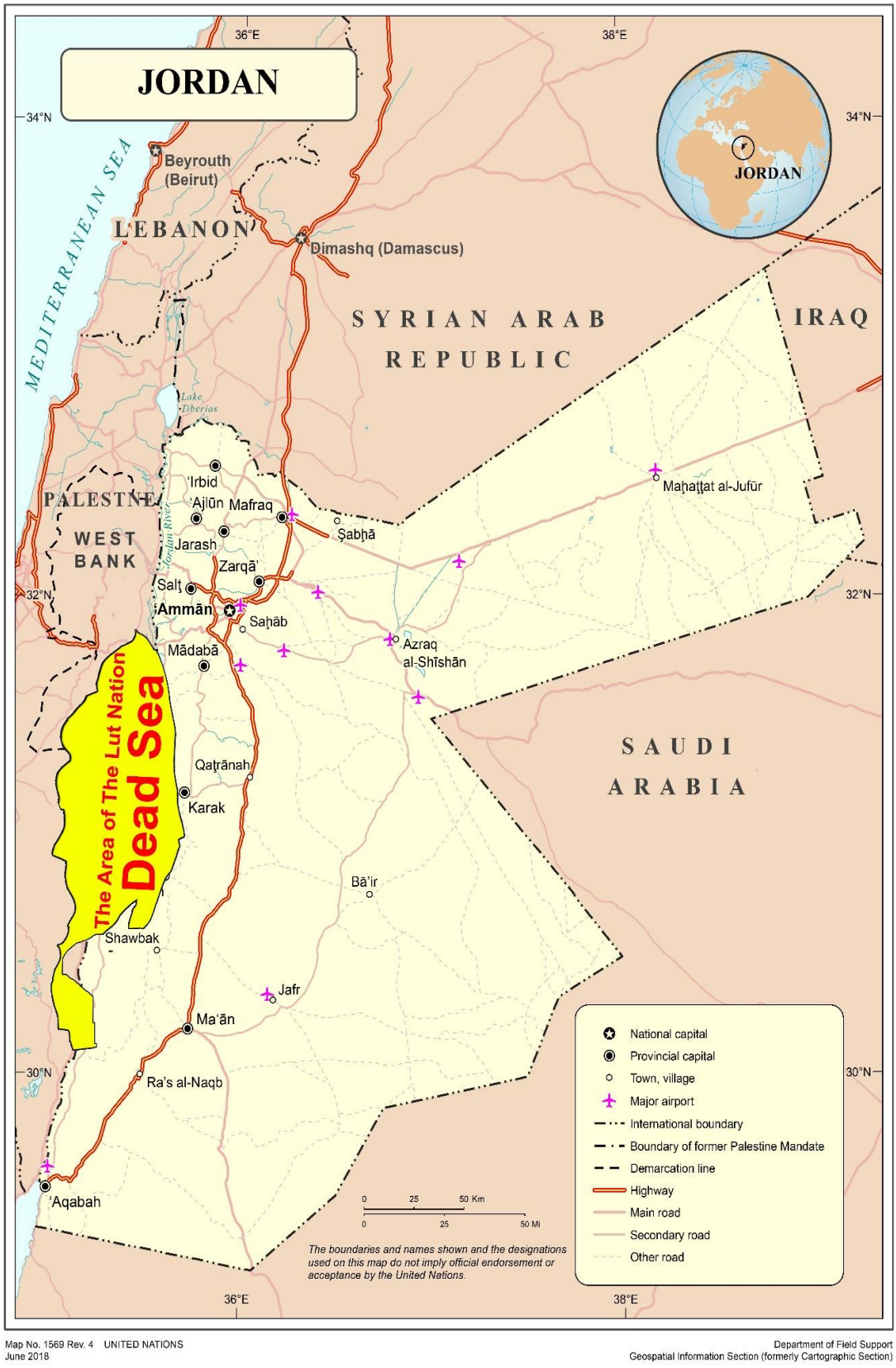

- আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.) কে জর্দান ও বাইতুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' এলাকায় প্রেরণ করেন। জর্দানের যেখানে বর্তমানে 'বাহরে মাইয়্যেত (Dead sea) বা বাহরে লূত' অবস্থিত সেখানেই সাদূম গোত্রের বস্তিগুলি বিদ্যমান ছিল। মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত অঞ্চলটি ছিল লূত জাতির আবাসস্থল।

চিত্র ২: লূত (আ.) এর জাতির এলাকা :

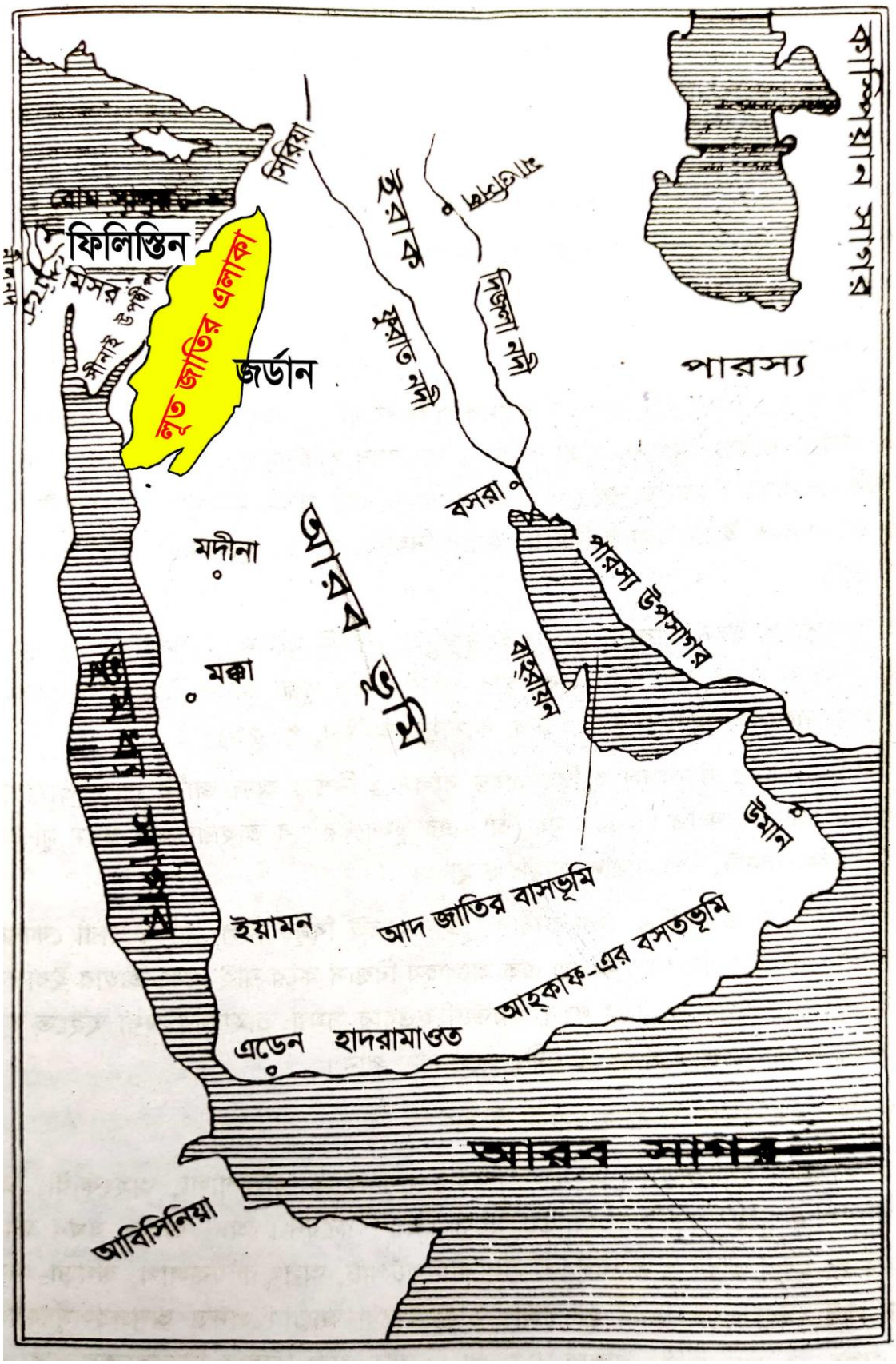

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত অঞ্চলটি ছিল লূত জাতির আবাসস্থল। সূত্র: সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫১।

২য় পরিচ্ছেদ
সমকামিতা ও পৃথিবীতে তার সূচনা

সমকামিতা শব্দটি বাংলা। এটি সংস্কৃত শব্দ সম+কাম এ দুটি শব্দে গঠিত। সংস্কৃত শব্দ সম এর অর্থ হল সমান, অনুরূপ আর কাম শব্দের অন্যতম অর্থ হল যৌন চাহিদা, রতিক্রিয়া, যৌন তৃপ্তি। অতঃপর এ দুই শব্দ সংযোগে উৎপন্ন 'সমকামিতা' শব্দ দ্বারা অনুরূপ বা সমান বা একই লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণকে বুঝায়। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Homosexuality। এটি গঠিত হয়েছে গ্রিক Homo এবং ল্যাটিন Sexus শব্দের সমন্বয়ে। গ্রীক ভাষায় হোমো বলতে বুঝায় সমধর্মী বা একই ধরণের আর সেক্সাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। ১৮৬৯ সালে কার্ল মারিয়া কাটবেরী সডোমী আইনকে তিরস্কার করে ইংরেজীতে প্রথম 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে জীববিজ্ঞানী গুস্তভ জেগার এবং রিচার্ড ফ্রেইভার ভন ক্রাফট ইবিং ১৮৮০ এর দশকে তাদের 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' গ্রন্থে Heterosexual (বিসমকামী) এবং Homosexual (সমকামী) শব্দ দুটো দ্বারা যৌন পরিচয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেন যা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী যৌন পরিচয়ের শ্রেণিবিভাজন হিসেবে ব্যাপক পরিসরে গৃহীত হয়।[২৬৬] সমকামিতার আরবী প্রতিশব্দ হল, لواطة বা لواط যার মূল ধাতু হল لاط – لوط । এর অর্থ হল মিলিত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, লূত (আ.) এর জাতির অপকর্ম করা। যেমন বলা হয় لَاطَ فُلَانٌ لِوَاطًا অর্থাৎ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ (সে লূত আ. এর জাতির অপকর্ম করল)।[২৬৭] তবে সমকামিতার আরবী প্রতিশব্দ لواطة বা لواط কথাটি আল-কুরআনে সরাসরি আসেনি বরং হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের অপকর্মটিকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছে। যথা:

১. الفاحشة বা অশ্লীল কাজ। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ। অর্থাৎ আর প্রেরণ করেছি লূতকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর আর কেউ করেনি।[২৬৮]

২. اتيان الرجال বা পুরুষে উপগত হওয়া। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ। অর্থাৎ কি? তোমরাইতো পুরুষে উপগত হচ্ছ এবং তোমরাইতো রাহাজানি করছ।[২৬৯]

৩. الْمُنْكَرَ বা ঘৃণ্যকর্ম। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ অর্থাৎ তোমরাইতো প্রকাশ্য মজলিসে ঘৃণ্যকর্ম করে থাক।[২৭০]

---

২৬৬. উইকিপিডিয়া-*সমকামিতা, শব্দতত্ত্ব*, সুত্রঃ bn.wikipedia.org/wiki/mgKvwgZv.

২৬৭. ইবরাহীম মোস্তফা প্রমূখ, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ: কুতুবখানায়ে হুসাইনিয়াহ, জানুয়ারী ২০০৩ খৃ., পৃ. ৮৪৬।

২৬৮. আল-কুরআন, ২৯ : ২৮।

২৬৯. আল-কুরআন, ২৯ : ২৯।

২৭০. আল-কুরআন, ২৯ : ২৯।

৪. الخبائث বা অপবিত্র কাজ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ অর্থাৎ আর আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যারা অপবিত্র কাজ করত। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী এক মন্দ সম্প্রদায়।[২৭১]

সমকামিতা (Homosexuality) বা সমপ্রেম বলতে সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ, যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন আচরণকে বুঝায়। যৌন অভিমুখিতা হিসেবে সমকামিতা বলতে বুঝায় মূলত সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি আবেগীয়, রোমান্টিক ও যৌন আকর্ষণের একটি স্থায়ী কাঠামো বিন্যাস। যৌনতাড়না বা প্রবৃত্তির চাহিদার দিক থেকে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১. সমকামী: সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি যারা যৌনতাড়না অনুভব করে। ২. উভকামী: যারা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি যৌনতাড়না অনুভব করে ৩. বিসমকামী: যারা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন তাড়না অনুভব করে। সমকাম, নারীর প্রতি নারীর (Lesbianism) বা পুরুষের প্রতি পুরুষের (Gay) যৌন আকর্ষনকে বুঝায়। বিসমকাম, নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর যৌন আসক্তিকে বুঝায়। আর উভকাম হল একজন নারী পুরুষের প্রতি যেমন আসক্ত তেমনি নারীর প্রতিও আসক্ত হয় আবার একজন পুরুষ নারীর প্রতি যেমন আসক্ত তেমনি পুরুষের প্রতিও আসক্ত হয়। সমকামীদেরকে আবার কয়েকভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ ১. gay বা পুরুষ সমকামী। ২. Lesbian বা নারী সমকামী। ৩. Shemale বা হিজড়া সমকামী। ৪. Bisexual বা দ্বৈত যৌন জীবন। হিজড়া আর বাইসেক্সুয়ালরা মূলত উভকামী তবে তাদের মধ্যে সমকামী বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট থাকে।

হযরত লূত (আ.) সাদূম এসে দেখতে পেলেন যে এখানকার লোকেরা এমন এক অশ্লীল কাজে লিপ্ত যাতে দুনিয়ার কোন জাতি ইতিপূর্বে লিপ্ত হয়নি। অর্থাৎ নিজেদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য তারা স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে শ্মশ্রুবিহীন বালকদের সাথে মেলামেশা করত।[২৭২] যার প্রচলন তখনও পর্যন্ত দুনিয়ার কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয়নি। ইসলামী শরীয়তে এ অপকর্মটিকে 'লাওয়াতাত' বলা হয়। এ সাদূমবাসীরাই এ অপবিত্র কর্মটির আবিষ্কার করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ আর প্রেরণ করেছি লূতকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর আর কেউ করেনি।[২৭৩] এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে পৃথিবীতে এ জঘন্যতম ঘৃন্য অপকর্ম লূত (আ.) এর জাতির পূর্বে আর কেউ করেনি। এছাড়াও দুনিয়ার এমন কোন মন্দ কাজ ছিল না যা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।

লূত (আ.) এর কাওমের মধ্যে সমকাতির সূত্রপাত হওয়ার কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে হাকিম নিশাপুরী তার মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে বিষয়টি তাদেরকে

---

[২৭১]. আল-কুরআন, ২১ : ৭৪।
[২৭২]. আল-কুরআন, ৭ : ৮১।
[২৭৩]. আল-কুরআন, ২৯ : ২৮।

নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কুকর্ম করতে প্ররোচিত করেছিল তা হল এই, তাদের আবাসিক এলাকার ভিতরে ফল-ফলাদির বাগান ছিল এবং আবাসিক এলাকার বাহিরে রাস্তার পার্শ্বেও ফল-ফলাদির বাগান ছিল। একদা তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, তোমরা রাস্তার পার্শ্বের বাগানের ফল পথিকদেরকে খেতে নিষেধ করলে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যেত। তারা বলল, আমরা কিভাবে তাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করব? (কেননা লূত সম্প্রদায়ের উপর মেহমানদারী করা অপরিহার্য ছিল যেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর শরীয়তে মেহমানদারী করা অপরিহার্য ছিল) তখন তারা পরস্পর বলতে লাগল তোমরা এ নীতি অবলম্বন কর যে, তোমাদের অপরিচিত কোন লোক তোমাদের জনপদে আসলে তোমরা তার মালপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে নাও এবং তার সাথে কুকর্ম কর। ইহা করলে তোমাদের এলাকা দিয়ে আর কোন লোক যাতায়াত করবে না। তাতে তোমাদের রাস্তার পার্শ্বের বাগানের ফল ফলাদি রক্ষা পাবে। অতঃপর শয়তান অত্যন্ত সুদর্শন ও সুশ্রী এক বালকের বেশে নিকটবর্তী পাহাড় থেকে পথিকরূপে তাদের নিকট আবির্ভূত হল। তারা তাকে দেখিবামাত্র তার সাথে কুকর্ম করল এবং তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। কিছুক্ষন পর শয়তান চলে গেল। এরপর থেকে কোন অগন্তুকের আবির্ভাব হলেই তারা তার সাথে কুকর্ম করত। এভাবে সমকামিতা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল এমনকি নারীদের প্রতি আসক্তি হারিয়ে ফেলে তারা দিন দিন সমকামিতায় এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়ল যে একপর্যায়ে সমকামিতা তাদের মধ্যে মহামারী আকার ধারণ করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি হযরত লূত (আ.) কে প্রেরণ করেন।[২৭৪]

মহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রানীকেই যৌন চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। সে চাহিদা সুচারুরূপে নিবারণের জন্য তিনি দিয়েছেন একটি উপযুক্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। ইসলামী শরীয়তে যার নাম দেয়া হয়েছে বিবাহ বন্ধন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন মানুষ যেমনিভাবে তার যৌন ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে এর মাধ্যমে সন্তানাদি লাভ করার ও পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তারের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে। এ বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা, নিরাপদ যৌন জীবন এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। এর বিপরীতে নারী পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনকে বাদ দিয়ে সমলিঙ্গের মানুষের সাথে যৌন বাসনা চরিতার্থ করা ইসলামী শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং এ ঘৃন্য অপকর্মের আবিস্কারক সাদূমবাসীকে আল্লাহ তা'আলা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে।[২৭৫] উমাইয়া খলিফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক বলেন, যদি পবিত্র কুরআনে হযরত লূত (আ.) এর জাতির কথা উল্লেখ করা না হত তাহলে অমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এ ধরণের কাজ করতে পারে।[২৭৬]

---

২৭৪. আবু আবদুল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আন-নিশাপুরী, ***আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৬১২, হাদিস নং ৪০৫৮।

২৭৫. আল-কুরআন, ৭ : ৮১-৮৪।

২৭৬. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***তাফসীরে ইবনে কাছীর***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১১৩৪।

সমকামিতার দণ্ড সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে, وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে দুজন এ অন্যায় কাজ (যিনা অথবা সমকামিতা) করবে তাদের দুজনকেই শাস্তি দাও। অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদের ছেড়ে দাও; নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও দয়াবান।[২৭৭] এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ» অর্থাৎ হযরত ইবনে অব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, যাদেরকে তোমরা হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামিতয়) লিপ্ত দেখবে তাদেরকে তোমরা হত্যা কর, যে করছে তাকে এবং যাকে করা হচ্ছে তাকেও।[২৭৮] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকীল থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির (রা.) কে বলতে শুনেছেন, রাসূল (স.) বলেন, আমি আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিষটা আশংকা করি তা হল লূত (আ.) এর কাওমের অপকর্ম।[২৭৯] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: «ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا» অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়ারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স.) থেকে লূত (আ.) এর কাওমের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তোমরা উপরেরজনকেও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর এবং নীচেরজনকেও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর অর্থাৎ তাদের উভয়কে রজম কর।[২৮০] অন্যত্র মহানবী (স.) বলেন, وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ القَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً» অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত আমর ইবনে আবু আমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলেন, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত যে কাওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হল। তবে এতে তিনি হত্যার কথা উল্লেখ করেন নি। আর তিনি এতে আরও উল্লেখ করেন অভিশপ্ত ঔ ব্যক্তি যে, পশুমৈথুন করল।[২৮১] রাসূল (স.) আরও বলেন, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে ব্যক্তি কোন পুরুষের সাথে সঙ্গম করে অথবা কোন মহিলার পায়ুপথে সঙ্গম

---

২৭৭. আল-কুরআন, ৪ : ১৬।

২৭৮. সুলাইমান ইবনুল আসআছ আল আযদী আস সিজিস্তানী, ***সুনানু আবি দাউদ***, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, খ. ০৪, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং ৪৪৬২; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫৬; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে মূসা আত-তিরমিযী, ***জামে আত-তিরমিযী***, মিশর: শিরকায়ে মাকতাবা ওয়া মাতবাআয়ে মোস্তফা, খ. ০৪, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১৪৫৬।

২৭৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে মূসা আত-তিরমীযী, ***জামে আত- তিরমীযী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ১৪৫৭; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৮৫৬।

২৮০. ইমাম ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৮৫৬, হাদীস নং ২৫৬২।

২৮১. ইমাম তিরমীযী (র.), ***জামে আত-তিরমীযী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১৪৫৬।

করে।[২৮২] মহানবী (স.) বলেন আরো বলেন, " عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ অর্থাৎ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, যখন কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হবে তখন তারা উভয়ে যিনাকারী সাব্যস্ত হবে এবং কোন নারী অপর নারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হবে তারা উভয়ে যিনাকারিনী সাব্যস্ত হবে।[২৮৩] অন্যত্র মহানবী (স.) বলেন, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَعْمَلَتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ، إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّلَاعُنُ، وَلُبْسُ الْحَرِيرِ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ " অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন, আমার উম্মত যখন পাঁচটি কাজে লিপ্ত হবে (অন্য বর্ণনায় আছে আমার উম্মত যখন পাঁচটি কাজকে হালাল মনে করবে) তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। পাঁচটি কাজ হল- ১. যখন পরস্পর ব্যাপকভাবে অভিসম্পাত করবে। ২. রেশমী কাপড় পরিধান করবে। ৩. গায়িকা-নর্তকী গ্রহণ করবে ৪. মদপান করবে ৫. পুরুষ পুরুষে ও নারী নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হবে।[২৮৪]

ইমাম তিরমিযী (র.) তার সহীহ গ্রন্থে লিখেন, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ অর্থাৎ লাওয়াতাতে লিপ্ত (সমকামী) ব্যক্তির শাস্তির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। তাদের একদল বলেন, তার শাস্তি হল পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, চাই সমকামী ব্যক্তি বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। ইহা ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ এবং ইসহাক (র.) এর অভিমত। একদল ফকীহ তাবেয়ী বলেন সমকামিতার শাস্তি হল যিনার শাস্তি। ইহা হল ইমাম হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, আতা ইবনে আবী রাবাহ, ইমাম সাওরী, কূফাবাসী প্রমুখের অভিমত।[২৮৫]

আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থকার বলেন, শাফেয়ীদের এক বর্ণনা মোতাবেক লাওয়াতাতের শাস্তি হল যিনার শাস্তি। এটা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বসরী, কাতাদাহ, ইবরাহীম নাখয়ী, সাওরী, আওযায়ী, আবু তালিব এবং ইমাম ইয়াহইয়া (র.) এর

---

২৮২. আবু ইয়ালা আহমদ ইবনে আলী আল-মুসেলী, ***মুসনাদে আবী ইয়ালা***, দামেস্ক: দারুল মামূন লিত তোরাছ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪ হি., খ. ০৪, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং ২৩৭৮।

২৮৩. আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম প্রকাশ ১৪২৩ হি., ২০০৩ খৃ., খ. ০৭, পৃ. ৩২৪, হাদীস নং ৫০৭৫; ঐ, ***আস-সুনানুল কোবরা***, বৈরুত: লিবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., খ. ০৮, পৃ. ৪০৬, হাদিস নং ১৭০৩৩।

২৮৪. আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং ৫০৮৪, সুলাইমান ইবনে আহমদ আত তাবারানী, ***মুসনাদুশ শামিয়ীন***, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি., ১৯৮৪ খৃ., খ. ০১, পৃ. ২৯৭।

২৮৫. ইমাম তিরমিযী (র.), ***জামে আত-তিরমিযী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ১৪৫৬।

অভিমত। তারা বলেন কুমারী হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে আর বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে; কেননা এটা এক প্রকার যিনা। হানাফীদের মতে, লাওয়াতাতের কোন হদ্দ নেই; বরং তাকে ধমকী প্রদানের উদ্দেশ্যে ইমামের রায় অনুসারে তার উপর তা'যীর ওয়াজিব হবে। এরপর যদি সে বারবার করে তবে শাস্তি হিসেবে তাকে তরবারী দিয়ে নিঃশেষ করে দেয়া হবে, হদ্দ হিসেবে নয়, কেননা এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন নস নেই।[২৮৬] আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন সমকামী ব্যক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত নিকৃষ্টতম ময়লাযুক্ত স্থানে আটকে রাখা হবে।[২৮৭] আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থকার সবগুলি মত উল্লেখের পর রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা লূত (আ.) এর কাওমের ব্যাপারে বলেছেন, لنرسل عليهم حجارة من طين অর্থাৎ আমি যেন তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে পারি।[২৮৮]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে, وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ لَاطَ بِغُلَامٍ لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُعَزَّرُ وَيُودَعُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَتُوبَ وَعِنْدَهُمَا يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا فَيُجْلَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَيُرْجَمُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَلَوْ فَعَلَ هَذَا بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ بِزَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يُحَدُّ إجْمَاعًا كَذَا فِي وَلَوْ اعْتَادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الْإِمَامُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْكَافِي. অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে পায়ুপথে মেলামেশা করে অথবা কোন বালকের সাথে লাওয়াতাত করে তবে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে তার কোন শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড নেই; বরং তাকে ইমামের রায় অনুযায়ী তাযীর তথা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তওবা করা পর্যন্ত তাকে কয়েদ করে রাখা হবে। সাহেবাঈনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) মতে তাকে যিনার শাস্তি প্রদান করা হবে, অর্থাৎ সে যদি অবিবাহিত হয় তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং সে যদি বিবাহিত হয় তবে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে, আর যদি সে তার দাস-দাসী অথবা বিবাহিত স্ত্রীর সাথে এমন কাজ করে তবে সকলের ঐক্যমতে কোন হদ বা দণ্ড নেই, কাফী গ্রন্থে এমনই উল্লেখ আছে। তবে যদি সে সমকামিতায় একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত হোক সর্বাবস্থায় ইমাম তাকে হত্যা করে ফেলবে, ফাতহুল কাদীর নামক কিতাবে এমনই উল্লেখ আছে।[২৮৯]

শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মেই নয় বরং পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই সমকামিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অত্যন্ত কঠিনভাবে উহাকে তিরষ্কার করে উহার বিভিন্ন ধরণের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বাইবেল বলছে ঈশ্বর সমকামিতার মনোভাব দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেননি। সমকামিতা এক ধরণের পাপ। লোকেরা পাপের কারণে সমকামী হয়। (আদিপুস্তক ১৯:১-১৩, লেবীয় ১৮:২২, রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিন্থীয় ৬:৯) রোমীয় ১: ২৬-২৭ এর শিক্ষা হল ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া এবং তাঁকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ

---

২৮৬. আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, *আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল- জাযীরী*, বৈরুত: লিবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., খ. ০৫, পৃ. ১২৭।

২৮৭. প্রাগুক্ত।

২৮৮. প্রাগুক্ত।

২৮৯. লাজনাতু উলামা বিরিআসাতি নিযামুদ্দিন আল-বলখী, *ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া*, দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৩২০ হি., খ. ২, পৃ. ১৫০।

সমকামিতার শাস্তি দেয়া হয়েছে। লোকেরা যখন অবিশ্বাসের কারণে পাপ করতেই থাকে তখন ঈশ্বর লজ্জাপূর্ণ কামনার হাতে তাদের ছেড়ে দেন যেন তারা আরও জঘন্য পাপে ডুবে যায় এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে নিস্ফল ও নৈরাশ্যের জীবন অনুভব করতে পারে। ১ করিন্থিয় ৬:৯ পদে বলা হয়েছে যে, যারা সমকামিতায় দোষী তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাবে না।[২৯০] আব্রাহামীয় ধর্মসমূহের দ্বারা প্রভাবিত সংস্কৃতিসমূহে আইন ও গীর্জা কর্তৃক সডোমিকে ঐশ্বরিক বিধানের পরিপন্থী তথা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য পুরুষদের মধ্যে পায়ুসঙ্গমের নিন্দা খ্রিষ্টধর্মের চেয়েও প্রাচীন। প্লেটোর কাজকর্মেও সমকামিতা অপ্রাকৃতিক হওয়ার ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশেল ফুকোর ন্যায় কিছু দার্শনিকের মতে সমকামিতার এই অভ্যাস ভুল, কারণ প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সমাজে যৌনতার উক্ত ধারণাগুলির অস্তিত্ব ছিল না।

মানব ইতিহাসের প্রায় সমগ্র সময়কাল জুড়ে সমকামী সম্পর্ক ও আচরণ নিন্দিত হয়ে আসছে। আর এটা নির্ভর করছে দেশ ও কাল ভেদে সমকামিতার বহিঃপ্রকাশের রূপ, সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব ও সাংস্কৃতিক মানসিকতার উপর। সমকামী সম্পর্ককে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মনে করা, এর প্রতি সামাজিক সহনশীলতা বা তীব্র অসহনশীলতা, একে এক প্রকার লঘুপাপ মনে করে আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে এর অবদমনে বিভিন্ন শাস্তি এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি বিষয় বিভিন্নভাবে সমাজে সমকামিতাকে প্রভাবিত করেছে। অধিকাংশ সমাজ এবং সরকার ব্যবস্থায় সমকামী আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ সহ (দশ বছর থেকে শুরু করে আমরণ সশ্রম করাদণ্ড) দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশের দণ্ডবিধিতে ৩৭৭ ধারা এবং ১৯টি দেশে সমপর্যায়ের ধারা এবং সম্পূরক ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতিবিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধ। ২০১৫ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর মোট ৭২টি দেশের বিধিমালায় এবং ৫টি দেশের উপ জাতীয় আইনী বিধিমালায় সমকামিতা সরকারীভাবে অবৈধ যার অধিকাংশই এশিয়া ও আফ্রিকাতে অবস্থিত এবং এদের মধ্যে বেশ কিছু দেশে সমকামী আচরণের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু আছে। পাশ্চাত্য ও উন্নত কিছু দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে সমকামী যৌনাচরণের প্রতি সাধারণ মানুষের বৈরীভাব বহাল আছে। অধিকাংশ সমাজে সমকামী যৌনাচরণ একটি অস্বাভাবিক ও নেতিবাচক প্রবৃত্তি হিসেবে লজ্জার ব্যাপার এবং ধিক্কারযোগ্য। ধর্ম, আইনের বিধান এবং সামাজিক অনুশাসনের কারণে সমকামী যৌনসঙ্গম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই একটি অবৈধ ও গুপ্ত আচরণ হিসেবে সংঘটিত হয়। দেশ ও কালভেদে সমকামিতার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাক শিল্পায়ন সংস্কৃতিসমূহের ঐতিহাসিক ও জাতিতত্ত্বগত নমুনার একটি সুপরিকল্পিত সংকলনে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী সমীক্ষাধীন ৪২টি সংস্কৃতির ৪১ শতাংশে সমকামিতার প্রবল বিরোধিতার নমুনা পাওয়া গেছে। ২১% এর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে আর ১২% জানিয়েছে তারা এমন কোন ধারণার সাথে পরিচিত নয়। সমীক্ষাধীন ৭০টি জাতির মধ্যে ৫৯% জানিয়েছে সমকামিতা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত বা বিরল আর অবশিষ্ট ৪১% জানিয়েছে তা বিরল নয়। স্পেনীয় বিজেতারা স্থানীয় সমাজে অবাধ সডোমি উদযাপন হতে দেখে ভীত হয়ে তা নির্মূল করার জন্য জনসমাগমে মৃত্যুদন্ড, পুড়িয়ে মারা এবং কুকুর দিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত বোয়ার

[২৯০]. সুত্রঃ আতিকুর রহমান নগরী, ***দৈনিক ইনকিলাব***, প্রকাশ ৪ জানুয়ারী ২০১৯।

বনাম হার্ডউইক মামলার রায়ে জানায় যে, রাষ্ট্র সডোমিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারে। চীনে মধ্যযুগে খ্রীষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ফলে তাং বংশের শাসনামলে সমকামিতার প্রতি বিরূপতার সূচনা হয় যা মাঞ্চু আমলে পাশ্চাত্যকরণ ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা লাভ করে। জাপানে সমলৈঙ্গিক বিবাহ আইন সম্মত নয়। জাপান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী সেখানে এ বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কও নেই। সিঙ্গাপুরে ২০১৪ সালের জুন মাসে ২০,০০০ লোকের একটি দল সমকামী অধিকারের নামে বিক্ষোভ দেখায়। ঐ বছরই সিঙ্গাপুর হাইকোর্ট সডোমি বিরোধী একটি ধারা সংস্কারের দাবী বাতিল করে যে ধারায় দোষী ব্যাক্তির ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রকাশ্যে সমকাম নিষিদ্ধ ও সমকামী বিয়ে অবৈধ। ইন্দোনেশিয়ায় যেখানে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মুসলিম সেখানে মুসলমানদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের দ্বারাও সমকামিতার শাস্তির দাবী উত্থাপিত হয়েছে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের সরকার একটি শরীয়াহভিত্তিক সমকামিতা বিরোধী আইন পাশ করে যাতে সমকামী ব্যক্তির শাস্তিস্বরূপ ১০০ চাবুকাঘাত ও ১০০ মাসের কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয় যে আইনটি ২০১৫ সালের শেষের দিকে কার্যকর করা হয়। ভারতের প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলোর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকে সমকামিতার বিরোধী বলে মনে করা হয়। ২০১৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতের সুপ্রিমকোর্ট সমকামিতাকে অবৈধ ঘোষণা করে।

বাংলাদেশে রয়েছে সমকামিতার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা। এদেশের ৯২% মুসলিম জনসংখ্যার ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বাংলাদেশী সমাজের মানসিকতার ফলে উক্ত বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের বাইরের ব্যক্তিবর্গ যেমন পুলিশ, মুসলিম সংগঠনসমূহ, সমকামবিদ্বেষী সভ্য সমাজ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার দেয়া হলেও তাতে নৈতিক অবক্ষয়ভিত্তিক বিধি-নিষেধ রয়েছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পায়ুমৈথুন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যার শাস্তি ১০ বছর থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে। দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাটি হল এই, Unnatural offences-- Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. **Explanation**-- penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী অথবা জন্তুর সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম করে তবে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে অথবা নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। সাথে অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। **ব্যাখ্যাঃ** এ ধারায় বর্ণিত অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যৌন সহবাসের নিমিত্তে লিঙ্গপ্রবেশই যথেষ্ট হবে। এ ধারার ব্যাখ্যায় পায়ুসঙ্গমজনিত যে কোন যৌথ যৌন কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য পরস্পর সম্মতিক্রমে বিপরীতকামী পায়ুমৈথুন ও মুখকামকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হতে পারে।

১৮০০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপ ভ্রমনকারী দুজন আরব যথাক্রমে রিফালাহ আল-তাহতাভী ও মুহাম্মদ আল-সাফফার এই ঘটনায় অত্যন্ত অবাক হন যে, ফরাসিগণ অনেক সময় তরুন বালক

সম্পর্কে ভালোবাসার কবিতাকে সামাজিক রীতিনীতি ও নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য সুচিন্তিতভাবে ভুল অনুবাদ করে তার বদলে তরুণী বালিকার কথা লিখেছেন। এতে বুঝা যায় ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা সমকামিতাকে ঘৃণার চোখেই দেখত। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবদেশেই সমকামিতাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইহাকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বহু মুসলিম দেশ রয়েছে যেগুলোতে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের সাজা প্রদান করা হয়। যেমন সৌদি আরব, ইরান, সুদান, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, কাতার, ব্রুনাই, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইরাকের কিছু অংশ।[২৯১] এছাড়া মরক্কো ইসলামী আইন অনুসরন করে। এ আইন অনুযায়ী সমকাতিা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ দেশে প্রকাশ্যে সমকামীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও সমালোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশে সমকামী সম্প্রদায়ভুক্ত কারো পরিচয় যদি প্রকাশ পেয়ে যায় তবে সে দূরাগ্রহ, সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যান ও সামাজিক ঝুঁকিতে থাকে এমনকি তার পুলিশ কতৃক নিরাপত্তা পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মত উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলোতেও সমকামীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের তিরস্কার ও হয়রানী পরিলক্ষিত হয়। ভারতে সমকামী সম্পর্কে জড়াতে গেলে পরিবার থেকে বাধা আসে, সামাজিকভাবে নিন্দিত হতে হয়, বিভিন্ন হুমকির শিকার হতে হয় তাদের। বাংলাদেশে সমকামীদের অবস্থা ভারতের চেয়েও আরও করুন। ২০১৬ সালে ঢাকায় সমকামী অধিকারকর্মী জুলহাজ মান্নান ও মাহবুব তনয়কে হত্যার পর থেকে বাংলাদেশে সমকামীরা নিজেদের আরও লুকিয়ে ফেলেন। পেনাল কোডের ৩৭৭ ধারা অনুসারে বাংলাদেশে সমকামিতা একটি অপরাধ। তাই ২০১৭ সালে ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে ২৭ জন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র সমকামী হওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব ১০ এর অধিনায়ক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর বিবিসিকে জানিয়েছেন কেরানীগঞ্জের আটিবাজার এলাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে কিছু তরুন বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে জড়ো হয়। এমন খবর পেয়ে র‍্যাব সদস্যরা কমিউনিটি সেন্টারটি ঘেরাও করে। র‍্যাব সদস্যরা জানান তাদের কাছে কিছু মাদক পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় যে, তারা সমকামিতার সাথে জড়িত। তাদের কাছে সমকামিতার কাজে ব্যবহৃত কিছু জিনিষ যেমন কনডম, লুব্রিকেন্ট জেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। আটককৃতদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং তাদের অধিকাংশই ছাত্র।[২৯২] পাকিস্তানেও সমকামী সম্প্রদায়কে খুবই নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। সমলিঙ্গের মানুষ একসাথে থাকতে হলে তাদের যৌন অভিরুচি গোপন করেই থাকতে হয়। এক কথায় সমকামিতা আবহ কাল ধরেই অসামাজিক বিবেচিত হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ হলো এটি এমন একটি ঘৃণ্য যৌনাচরণ যার মাধ্যমে সন্তানের জন্মদান সম্ভব নয়। ফলে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বংশ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল ধর্ম সমকামী যৌনাচরণ নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমান সমাজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমকামী যৌনাচরণ এক প্রকার যৌনবিকৃতি হিসেবে পরিগণিত।

তবে দেশ ও কালভেদে সমকামিতার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে মানুষ যখন ক্রমেই ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, পারিবারিক শৃঙ্খলাকে গুরুত্বহীন মনে করে, নৈতিক চরিত্রে স্খলন দেখা দেয় ঠিক তখন থেকেই এ

---

[২৯১]. *সমকামীদের মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বিপক্ষে বাংলাদেশ* | বিশ্ব | DW| ০৬/১০/২০১৭; *দেশ বা অঞ্চল অনুযায়ী সমকামী অধিকার*, bn.m.wikipedia.org.

[২৯২]. *বিবিসি বাংলা*, ১৯ মে, ২০১৭।

পৃথিবীর মানুষরূপী কিছু কুলাঙ্গারের নিকট সমকামিতা নামক ঘৃণ্য অপকর্মটি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। তারা ধীরে ধীরে এ ঘৃণ্য অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তাদের এই অপকর্মের রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক আইনী বৈধতা নেয়ার জন্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আন্দোলন শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিকরা সমকাম প্রবণতাকে মনোবিকলনের তালিকা থেকে বাদ দেয়। ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্ব ফেডারেশন সমকাম প্রবণতাকে স্বাভাবিক বলে দাবী করে। যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে, 'রাষ্ট্র সডোমিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারে' শীর্ষক ১৯৮৬ সালের রায়টি বাতিল করে দিয়ে সমকামিতার অবৈধতা তুলে নেয়। সিঙ্গাপুরে ২০১৪ সালের জুন মাসে ২০,০০০ লোকের একটি দল সমকামী অধিকারের নামে বিক্ষোভ দেখায়। তারা সডোমি বিরোধী একটি ধারা সংস্কারের দাবীতে আন্দোলন করে যে ধারায় দোষী ব্যাক্তির ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের বেশ কিছু দেশে সমকামী যৌনাচারণের অবৈধতা তুলে নেয়া হয়। নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাসহ বেশ কয়েকটি দেশ সমকামী ব্যক্তিদের বিবাহও আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম ২০০১ সালে সমলিঙ্গের বিয়েকে আইনগত বৈধতা প্রদান করে নেদারল্যান্ড। ২০১৫ সালের তথ্যানুযায়ী বৈধতাপ্রদানকারী এই দেশ সমূহের সংখ্যা ১৮ যার অধিকাংশই আমেরিকা এবং ইউরোপে অবস্থিত। ২০১১ সালে জাতিসংঘের 'হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল'ও সমকামিতার পক্ষে একটি ঐতিহাসিক সনদ পাশ করে।[২৯৩] এছাড়াও ২০০৯ সালের ২রা জুলাই দিল্লী হাইকোর্টের একটি রায়ে জানানো হয়েছে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্মতিক্রমে সমকামিতার আচরণ অপরাধের আওতায় পড়ে না। স্টোনওয়াল দাঙ্গার পর থেকে সমকামী ব্যক্তিরা এলজিবিটি সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সমকামীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ, স্বীকৃতি, আইনী অধিকার দান এবং একই সঙ্গে সমলিঙ্গের বিবাহ, দত্তকগ্রহণ, সন্তানপালন, বৈষম্য বিরোধী আইন প্রয়োগ, পরিসেবা ও স্বাস্থ্য পরিসেবায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার প্রদানের দাবী উত্থাপন। এ ছাড়া ইসরাইলের রাজধানী তেলআভিভকে 'মধ্যপ্রাচ্যের পুরুষ সমকামী রাজধানী' নামে ডাকা হয় যা বিশ্বের সমকামীদের প্রতি সবচেয়ে বন্ধুসুলভ শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশ আমাদের বাংলাদেশেও সমকামিতার দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে। এদেশে সডোমীদের কিছু দোসরের উত্থান ঘটে যারা রক্ষণশীল এই মুসলিম দেশে বিভিন্নভাবে সমকামিতা নামক ঘৃণ্য অপকর্মকে প্রসারের জন্য মরিয়া হয়ে কাজ শুরু করে দেয়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এলজিবিটি সংক্রান্ত জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বৃহত্তর উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। ঐ সময়ে রেংগ্যু নামক এক উপজাতীয় ব্যক্তি বাংলাদেশের সমকামীদের জন্য প্রথম অনলাইন গ্রুপ 'গে বাংলাদেশ' সৃজন করে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের বাংলাদেশে সমকামিতা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচার এবং সমকামিতা এতটাই সিদ্ধ হচ্ছে যা আমাদের মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে। বর্তমানে দেশের বৃহত্তম সমকামী সংগঠন হলো 'বয়েজ অফ বাংলাদেশ'। এটি ২০০৯ সাল থেকে ঢাকায় এলজিবিটি সচেতনতা বর্ধক অনুষ্ঠান করে আসছে। এই দল বাংলাদেশে একটি সুসংহত এলজিবিটি সমাজ গড়তে চায় এবং ৩৭৭ ধারার অবসান চায়। 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' (বিওবি) এবং তাদের একটি ম্যাগাজিন 'রূপবান'র এর

---

২৯৩. রয়টার্স, ঢাকা: *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৬ মার্চ, ২০১৩।

উদ্যোগে সারা দেশে ৬০০ সমকামী ও উভকামী নারী-পুরুষের উপর চালানো নজিরবিহীন জরিপটির ফলাফল ডিসেম্বর ২০১৪ ঢাকায় প্রকাশ করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের সকলের বয়স ৪৮ বছরের উপরে। এই জরিপের ৬৬% উত্তর দাতা জানায় তারা সমলিঙ্গের বিয়ে চায়। ৩৩% উত্তরদাতা জানায় সামাজিক অনুশাসন ও তিরস্কারের কারণে তারা ভিন্নলিঙ্গের বিয়েতেও রাজি। জরিপে বলা হয়েছে ৫৯% উত্তরদাতা জানিয়েছে, তারা সমাজ জীবনে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ৫২% জানিয়েছেন তারা বৈষম্য ও হেনস্থার মুখে দেশত্যাগ করতে ইচ্ছুক। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব পাবলিক হেলথের' ডিন সাবিনা ফাইয রশীদ বলেছেন, বাংলাদেশে পুরুষ সমকামী (Gay) এবং নারী সমকামী (Lasbian) জনগোষ্ঠীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে কিছুটা বদলেছে। তিনি বলেন, এখন মানুষ অনেক খোলামেলা ভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে।[২৯৪] পাশাপাশি ২০১০ সালে 'মুক্তমনা ব্লগ' এর অন্যতম অবদানকারী অভিজিৎ রায় 'সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' নামে একটি বই প্রকাশ করে যাতে বাংলাদেশ এলজিবিটি জনগণ ও তাদের মানবাধিকার নিয়ে প্রথম স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ২৮ জুন ২০১৯ খৃ. বাংলাদেশে সমলিঙ্গের বিয়েকে আইনগত বৈধতার দাবীতে বাংলাদেশ সমকামী আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে দুপুর ১২.০০-১৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত একটি সেমিনারের আয়োজন করে যার আহবায়ক ছিল শাম্মী হক।[২৯৫] গত ১লা জানুয়ারী ২০১০ খৃ. 'ডেইলী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, 'আইসিডিডিআরবি' নামক একটি সংস্থা বাংলাদেশে সমকামিতা প্রসারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা এবং এনজিও নিয়োগ করতে চাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, এ প্রজেক্টে যে অর্থ ব্যয় হবে তা গ্লোবাল ফান্ড নামক সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে দান করেছে। এই প্রজেক্টের ১৫০ কোটি টাকা আইসিডিডিআরবি পরিকল্পনা মোতাবেক পুরুষে-পুরুষে যৌনকর্মের সরঞ্জাম ক্রয় করতে এবং বাংলাদেশে পুরুষে-পুরুষে বিবাহ আইনগতভাবে বৈধতা দানের আন্দোলনে ব্যয় করবে। ২০১৮ সালে উদযাপিত ঈদুল ফিতরের পরবর্তী ৪র্থ দিবসে আরটিভিতে রাত ১১.০৫ মিনিটে গ্রামীণফোনের আর্থিক স্পন্সরে 'রেইনবো' নামক একটি নাটক প্রচারিত হয় যাতে সমকামিতাকে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত করা হয়। নাটকটি প্রচারের পর দেশের সভ্য সমাজে সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল রাষ্ট্রে সমকামীদের এহেন কর্মকান্ড সত্যিই একটি সভ্যজাতির জন্য অশনি সংকেত।

৩য় পরিচ্ছেদ

লূত (আ.) এর দাওয়াত ও তার জাতির সলিল সমাধি

পবিত্র কুরআনুল কারীম হযরত লূত (আ.) এর জাতির প্রধানত তিনটি পাপ কার্যের কথা উল্লেখ করেছে। যথাঃ ১. পুংমৈথুন (সমকামিতা) ২. রাহাজানি (লুটতরাজ) ৩. প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা।[২৯৬] তাদের সমকামিতা নামক দুষ্কর্মের বিষয়টি ছিল অস্বাভাবিক, আর তা দুটি কারণে। ১. তাদের এ কুকর্মের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না বরং তারাই সর্বপ্রথম এ কুকর্মের আবিষ্কার করেছে। ২. এ কুকর্মটি তারা প্রকাশ্য মজলিসে করত যা ছিল বেহায়াপনার চূড়ান্ত পর্যায়, কেননা মানুষ সাধারনত গুনাহের কাজ করে

---

২৯৪. *বিবিসি বাংলা*, ১৮ ই ডিসেম্বর ২০১৪।

২৯৫. সূত্র: *দৈনিক সকাল*, ২৯ জুন ২০০১৯।

২৯৬. আল-কুরআন, ২৯ : ২৯।

গোপনে। নারীদের প্রতি তাদের কোন যৌন আকর্ষণ ছিল না। তারা সমকামিতায় এত বেশী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তারা কোন সুন্দর বালক দেখলে তার সাথে সমকাম করার জন্য পাগলপারা হয়ে যেত আর তারা এ অপকর্ম করে প্রকাশ্যে গর্ব করে বেড়াত। সাদূমবাসীদের আরেকটি অভ্যাস ছিল, যদি কোন বহিরাগত ব্যবসায়ী অথবা বণিকদল সাদুমে আসত তখন তারা এক অভিনব পদ্ধতিতে তাদের পণ্য সামগ্রী লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত।[২৯৭] পদ্ধতিটি হল তারা মাল দেখার বাহানায় প্রত্যেক ব্যক্তি অল্প অল্প করে হাতে নিত এবং তা নিয়ে চলে যেত। নিরীহ বণিক ইহা দেখে অস্থির হয়ে বসে থাকত। সে যদি তার পণ্যসামগ্রী লুণ্ঠন হওয়ার অভিযোগ করে কান্নাকাটি করত তখন তাদের মধ্য থেকে দুই এক জন লুণ্ঠন করে নেয়া দুই একটি বস্তু দেখিয়ে বলত আমি শুধু ইহাই নিয়েছি। নাও এই তোমার মাল নিয়ে যাও। তখন ব্যবসায়ী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলত যেখানে আমার সমস্ত মাল লুণ্ঠিত হয়ে গেছে সেখানে আমি ইহা নিয়ে কী করব? যাও তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর অন্য একজন এসে সেও সামান্য কিছু দেখিয়ে বলত আমি কেবল ইহাই নিয়েছি, তখন ব্যবসায়ী তাকেও ক্রোধে তদ্রূপ বলে দিত। এভাবে তারা ব্যবসায়ীর সমস্ত মালই হজম করে ফেলত এবং তাকে ভাগিয়ে দিত।

এ জাতি ছিল জুলুমবাজ জাতি। এদের জুলুমের একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে তা হল: একবার হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত সা'রা (আ.) তাদের বাঁদীর পুত্র 'আলইয়ারায দেমাশকী' কে সাদূমে পাঠালেন। তিনি যখন বস্তির নিকটে পৌঁছলেন তখন তাকে বিদেশী মনে করে জনৈক সাদূমী তার মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারল। তাতে আলইয়ারাযের মাথা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তখন সাদূমী আলইয়ারাযকে বলল, আমার পাথরের আঘাতে যে তোমার মাথা লালবর্ণ ধারণ করেছে সে জন্য তুমি আমাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। এ দাবী করে সাদূমী তাকে সাদূমের আদালতে নিয়ে গেল। বিচারক বাদীর জবানবন্দী শুনে বলল, নিশ্চয়ই আলইায়ারায সাদূমীকে পাথর মারার পারিশ্রমিক দিতে হবে। ইহা শুনে আলইয়ারায অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং একটি পাথর নিয়ে বিচারকের মাথায় ছুঁড়ে মারলেন অতঃপর বললেন এ পাথর মারার জন্য আমি তোমার নিকট পারিশ্রমিক পাওনা আছি, সুতরাং আমার পাওনা পারিশ্রমিক তুমি সাদূমীকে দিয়ে দাও।

আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য হযরত লূত (আ.) কে প্রেরণ করেন। লূত (আ.) এ জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দিলেন এবং সমকামিতা নামক অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন। তিনি এই নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার জন্য তাদেরকে তিরষ্কার করলেন এবং সম্মান ও পবিত্রতার জীবন যাপন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন। বিনয়, নম্রতা এবং হেকমতের সাথে যত উপায়ে বুঝানো সম্ভব ছিল সকল উপায়ে তাদেরকে বুঝালেন। কিন্তু তা তাদের উপর কোন ক্রিয়া করেনি। তাদের অধিকাংশই এ ঘৃণ্য কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়নি; বরং তারা জবাবে বলল "এদেরকে এ শহর থেকে বের করে দাও; এরা নিঃসন্দেহে পবিত্র লোক।"[২৯৮] তারা পবিত্র লোক বলে হযরত লূত (আ.) এবং তার অনুসারীদেরকে তিরষ্কার ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত। হযরত লূত (আ.) পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির অপকর্মসমূহ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির ঘটনা উল্লেখ করে তাদেরকে অত্যন্ত সুন্দর ভাষা ও নসীহতের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে থাকেন। একদা হযরত লূত (আ.) তাদেরকে একটি পূর্ণ

---

২৯৭. আল-কুরআন, ২৯ : ২৯।

২৯৮. আল-কুরআন, ৭ : ৮২।

জনসমাবেশে নসীহত করে বললেন তোমাদের কি এতটুকু অনুভুতিও নেই যে, পুরুষদের সাথে নির্লজ্জতার সম্পর্ক, লুটতরাজ এবং এ জাতীয় কার্যাবলী নেহাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ; অথচ তোমরা এগুলো জনসম্মুখে করে যাচ্ছ এবং লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে তা প্রচার করে গৌরববোধ করছ।[২৯৯] জাতির লোকেরা হযরত লূত (আ.) এর উপর্যুপরি নসীহতে বিরক্ত হয়ে গেল। তারা ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে হযরত লূত (আ.) কে বলল তোমার এ সমস্ত উপদেশ বন্ধ কর। তোমার খোদা যদি আমাদের এ সমস্ত কাজে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে তুমি যে আযাবের কথা বলতেছ তা আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।[৩০০]

এদিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মাঠে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক হযরত ইবরাহীম (আ.) এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে দেখে আনন্দিত হলেন এবং তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাদের সামনে ভুনা গোস্ত পেশ করলেন, কিন্তু তারা খেতে অসম্মতি জানাল। এতে ইবরাহীম (আ.) শঙ্কিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন এরা কোন শত্রু কি না? যার কারণে তারা খানা খেতে অসম্মতি প্রকাশ করতেছে। তখন তারা বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না, আমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা। আমরা হযরত লূত (আ.) এর জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সাদূম যাচ্ছি আর আপনাকে একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদানের জন্য এখানে এসেছি। অতঃপর যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পারলেন যে, এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা তখন তাঁর শঙ্কা দূর হয়ে গেল। এবার তিনি ফিরিশতাদের সাথে হযরত লূত (আ.) এর জাতির পক্ষ হয়ে বিতর্ক করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা এমন একটি জাতিকে ধ্বংস করবে? যেখানে আমার ভাতিজা লূত বিদ্যমান রয়েছে। সে তো আল্লাহর নবী এবং হানীফ ধর্মের অনুসারী। তখন ফিরিশতারা বলল, আমরা ইহার সবকিছুই জানি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.) এর জাতিকে তাদের অবাধ্যতা, নাফরমানী, অপকর্ম, নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতার কারণে ধ্বংস করে দিবেন। তবে লূত (আ.) ও তার পরিবারের লোকদেরকে রক্ষা করবেন, তার স্ত্রী ব্যতীত। কেননা সে তাদের অপকর্মে সহায়তা করার কারণে এবং তাদের আক্বীদা পোষণ করায় তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩০১]

অতঃপর ফিরিশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে বিদায় নিয়ে সাদূমে পৌঁছলেন এবং হযরত লূত (আ.) এর নিকট মেহমান হলেন। তারা সুশ্রী, সুন্দর এবং নব্যযুবকের আকৃতিতে ছিলেন। হযরত লূত (আ.) মেহমানদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে, না জানি তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার মেহমানদের সাথে খারাপ আচরণ করে বসে; কারণ তারা তখনও পরিচয় দেননি যে, তারা আল্লাহর ফিরিশতা। ইতিমধ্যে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা আগন্তুকদের সম্পর্কে জেনে গেল। কোন কোন বর্ণনায় আছে তার স্ত্রী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আগন্তুকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দিল, অতঃপর তারা লূত (আ.) এর বাড়ি ঘেরাও করল এবং লূত (আ.) এর নিকট দাবী করল যে, তুমি এদেরকে আমাদের নিকট সোপর্দ করে দাও। হযরত লূত (আ.) সম্প্রদায়ের লোকদেরকে যথাসাধ্য

---

[২৯৯]. আল-কুরআন, ২৯ : ২৯।

[৩০০]. আল-কুরআন, ২৯ : ২৯।

[৩০১]. আল-কুরআন, ২৯ : ৩১-৩২।

বুঝালেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন একজন ব্যক্তিও নেই যে মানবতার পরিচয় দেয় এবং সত্যকে বুঝে। তোমরা কেন এ লানতে পতিত হয়েছ যে তোমরা তোমাদের যৌনতা চরিতার্থ করার জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতি তথা নারীদেরকে বাদ দিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বালকদেরকে গ্রহণ করছ। তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে বললেন যদি তোমাদের কামনা বাসনা পূরণ করতেই হয় তবে আমার সুন্দরী রূপসী কন্যাগণ রয়েছে আমি তাদেরকে তোমাদের নিকট বিবাহ দিব। তারা তোমাদের জন্য পবিত্র। তোমরা তাদের সাথে তোমাদের কামরিপু চরিতার্থ করতে পারবে। তারপরও তোমরা আমার মেহমানদের সাথে কোন ধরনের অসদাচরণ করো না। তারা বলল হে লূত! তুমি খুব ভাল করেই জান যে, তোমার কন্যাদের মধ্যে আমাদের কোন আগ্রহ নেই আর তুমি অবশ্যই জান যে আমরা কী চাই।[৩০২] তখন হযরত লূত (আ.) বললেন আহ! কতই না ভাল হত যদি আমার শক্তি থাকত তোমাদেরকে বাধা দেয়ার অথবা আমি মজবুত কোন শক্তির সাহায্য পেতাম।[৩০৩] অতঃপর হযরত লূত (আ.) এর পেরেশানী দেখে ফিরিশতাগণ বলল, আপনি পেরেশান হবেন না। আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত আযাবের ফিরিশতা। আপনার ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, এরা কখনও আপনাকে কাবু করতে পারবে না। আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সাথে নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরেই এ এলাকা থেকে বের হয়ে যান আর অপনাদের মধ্য থেকে কেউ যাতে এদিক সেদিক না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত, কেননা তাকে সে আযাবে পাবে যে আযাবে এ এলাকাবাসীকে পাবে। নিশ্চয় তাদের জন্য আযাবের নির্ধারিত সময় হল ভোর বেলা আর ভোর খুবই নিকটে।[৩০৪]

অতঃপর হযরত লূত (আ.) ফিরিশতাদের নির্দেশনা মোতাবেক রাতের প্রথম প্রহরে ঐ এলাকা ছেড়ে নিরাপদ এলাকায় বের হয়ে গেলেন। এদিকে যখন আযাবের নির্ধারিত সময় এসে গেল তখন প্রথমে এক ভয়ংকর গর্জন (আওয়াজ) তাদেরকে পাকড়াও করল অতঃপর হযরত জিবরাইল (আ.) তার ডানা দিয়ে ঐ জনপদকে শূন্যে উঠিয়ে উল্টিয়ে ছেড়ে দেন ফলে জনপদের সকল মানুষ মাটির নিচে চলে যায়, তার উপর আবার আল্লাহ তা'আলা পাথরের বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন।[৩০৫] এভাবে আল্লাহ তা'আলা সাদূম বাসীকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। আর হযরত লূত (আ.) এবং (লূত আ. এর স্ত্রী ব্যতীত) তার পরিবারবর্গকে আযাব থেকে রক্ষা করেন।[৩০৬]

যৌন ক্ষুধা গরু-ছাগল আর কুকুর-বিড়ালেরও আছে তাই বলে কি আপনি কখনও দেখেছেন যে, একটি ষাঁড়কে অপর ষাঁড়ের সাথে অথবা একটি কুকুরকে অপর কুকুরের সাথে যৌনক্ষুধা নিবারন করতে? না, তাদেরকে সাধারণত এমনটি করতে দেখা যায় না; বরং ষাঁড়কে সবসময় গাভীর সাথে এবং কুকুরকে কুকুরনীর সাথেই মেলামেশা করতে দেখা যায়। এ নিয়মে পৃথিবীতে যত জীব জন্তু রয়েছে তারা সবাই বিপরীত লিঙ্গের সাথেই যৌন চাহিদা নিবারণ করে থাকে। কিন্তু আশরাফুল মাখলূকাত মানুষের মধ্যে এমন কিছু কুলাঙ্গার রয়েছে যারা চতুষ্পদ জানোয়ার থেকেও আরও নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দেয়। তারা

---

৩০২. আল-কুরআন, ১১ : ৭৯।
৩০৩. আল-কুরআন, ১১ : ৮০।
৩০৪. আল-কুরআন, ১১ : ৮১।
৩০৫. আল-কুরআন, ১৫ : ৭৩-৭৪।
৩০৬. আল-কুরআন, ২৬ : ১৭০-১৭১।

তাদের যৌন চাহিদা নিবারণ করতে সমলিঙ্গের মানুষের নিকট গমন করে। মূলত এদেরকেই পবিত্র কুরআনে চতুষ্পদ জানোয়ারের থেকেও অধম বলা হয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রে তারা কেবল মানবতার সীমাই লংঘন করেনি বরং পশুত্বের সীমাও লংঘন করে আরও নিচে নেমে গেছে। 'Eat drink and mery' অর্থাৎ 'খাও, পান কর এবং পুর্তি কর' এ বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে তারা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। পুরুষ যদি পুরুষের সাথেই যৌনক্ষুধা নিবারণ করে তাহলে নারীর প্রতি তার যে আকর্ষণ তা আর বাকী থাকবে না, ফলে মানব বংশবিস্তার ব্যাহত হবে। অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তোমাদের নারীরা তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। তোমাদের যেভাবে মন চায় তোমরা চাষাবাদ কর। চাষাবাদের জায়গা হল মহিলাদের লজ্জাস্থান। কেননা চাষাবাদ মানে উৎপাদন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এখানে সন্তান উৎপাদন করার কথা বলেছেন। সন্তান উৎপাদনের জন্য পুরুষ কতৃক মহিলাদের সাথে তাদের লজ্জাস্থানে মেলামেশা করতে হবে, পায়ুপথে নয়। কেননা পায়ুপথ সন্তান উৎপাদনের পথ নয় বরং উহা ময়লা নিঃসরনের পথ। একজন পুরুষ পুরুষের সাথে এবং একজন নারী নারীর সাথে মেলামেশা করলে যেমন কোন সন্তান জন্ম হবে না তেমনি একজন পুরুষ নারীর পায়ুপথে মেলামেশা করলেও সন্তান হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ফলে সমকামিতার মাধ্যমে যৌন চাহিদা নিবারণ করলে মানব বংশ বিস্তারের পথ রুদ্ধ হবে। বিপন্ন হবে মানবতা এবং পৃথিবী পড়বে মহা জনবল সংকটের কবলে। পাশাপাশি এ সমকামিতার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়বে এইড্স নামক মরণব্যাধি। তা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো সমকামিতা নামক কুকর্মকে বাদ দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিজ্ঞানসম্মত ও চমৎকার বিধান বিবাহ পদ্ধতিতে ফিরে আসা। তাহলেই মানবস্বাস্থ্যও রক্ষিত হবে এবং মানুষের বংশ বিস্তার পদ্ধতিও নিশ্চিত থাকবে।

আল্লামা এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম তার রচিত 'ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস রোগের উৎস ও প্রতিকার' নামক গ্রন্থে এইড্স রোগের প্রধানত তিনটা উৎস উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল ব্যভিচার, সমকামিতা ও মাদক।[৩০৭] সমকামিতা এইড্স রোগের অন্যতম কারণ। এর মাধ্যমে এইড্স ভাইরাস এক সমকামী থেকে অন্য সমকামীর শরীরে প্রবেশ করে এবং তাকে মুত্যুর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সমকামিতা হচ্ছে অপবিত্র ও নোংরা কাজ। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও রুচি বিরোধী। পক্ষান্তরে বিবাহ হচ্ছে পবিত্র কাজ, বিবাহের মাধ্যমে সম্পাদিত যৌন সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 'তাদের জন্য তথায় রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে'।[৩০৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 'তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে, তাদের পবিত্র স্ত্রীগণ থাকবে এবং থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি'।[৩০৯] এই দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। বিবাহের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক হয়ে উঠে পাক ও পবিত্র।

---

৩০৭. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, ***ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস রোগের উৎস ও প্রতিকার,*** আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই ২০০৯, পৃ. ০৯।

৩০৮. আল-কুরআন, ২ : ২৫।

৩০৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৫।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
মাদইয়ানবাসী ও তাদের আবাস

মাদইয়ান মূলত কোন স্থানের নাম নহে বরং এটি একটি গোত্রের নাম। এ গোত্রের নামানুসারে এ বস্তিটির নামকরণ করা হয়েছে মাদইয়ান। এ গোত্রটি মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পুত্র মাদইয়ানের বংশ হতে উদ্ভূত। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর তিন জন স্ত্রী ছিলেন। যথাঃ ১. সারাহ ২. হাজেরা ৩. কাতুরা। এদের মধ্যে ৩য় স্ত্রী 'কাতুরা'র ঘরে মাদইয়ান নামক এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, তার নামানুসারে এ গোত্রের নাম হয় মাদইয়ান। আবার ঐতিহাসিকগণ এ বংশকে 'বনী কাতুরা' নামেও অভিহিত করে থাকেন। মাদইয়ানের মাতা কাতুরার নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়। মাদইয়ান তার পরিবার পরিজন সহ নিজের বৈমাত্রেয় ভাই হযরত ইসমাঈল (আ.) এর পার্শ্বেই হেজাযে বসবাস করতেন। এ বংশ পরবর্তীকালে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। শুআইব (আ.) যেহেতু এ বংশের লোক ছিলেন এবং তাদের নিকটই নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন তাই তাদেরকে 'কাওমে শুআইব'ও বলা হয়। ঐতিহাসিক তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ১৬ কিংবা ১৭ শতাব্দীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত শুআইব (আ.) কে জর্দানের মাদইয়ান শহরে প্রেরণ করেন, যা হিজাজের উত্তর পশ্চিমে সিরিয়ার কোন এক পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আবদুল ওয়াহাব নাজার বলেন এরা মুল্‌কে হেজাযে শামের সহিত মিলিত এমন এক স্থানে বসত করত যার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির বরাবর অবস্থিত। পবিত্র কুরআনে এদের অবস্থান সম্পর্কে দুটি বক্তব্য রয়েছে। যথাঃ-

১. তারা 'ইমামে মুবীন' এর উপর বসবাস করত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা উভয় কাওমই এক মহাসড়কের উপর বসত করত"।[৩১০] আরব দেশের ভূগোল অনুযায়ী যে মহাসড়ক দিয়ে হেজাযের ব্যবসায়ীগন শাম, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন এবং মিশর পর্যন্ত ভ্রমন করত এবং যা লোহিত সাগরের তীর দিয়ে চলে যেত পবিত্র কুরআনে সে সড়কটিকেই ইমামে মুবীন বলা হয়েছে। গ্রীষ্ম এবং শীত উভয় মৌসুমেই কুরাইশদের ব্যবসায়ীদের এটাই ছিল বিখ্যাত ও মহাসড়ক যা স্থলভাগের সহিত জলভাগের সীমাকেও যুক্ত করে দিয়েছে।
২. তাদেরকে 'আসহাবে আইকাহ' নামেও অভিহিত করা হয়।[৩১১] আরবি ভাষায় সবুজ ঝোঁপঝাড়কে 'আইকাহ' বলা হয়, যা সবুজ ও সতেজ বৃক্ষলতার কারণে বন-জঙ্গলের আকার ধারণ করেছে।

এ দুটি বক্তব্য হিসেবে মাদইয়ান সম্প্রদায়ের বাসস্থান সহজেই জানা যাবে। তা হল মাদইয়ানের গোত্রটি লোহিত সাগরের পূর্ব তীর এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করত যাকে শাম দেশের সহিত যুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যেতে পারে। হিজাযবাসীরা শাম, ফিলিস্তিন এবং মিশর যাতায়াতকালে আসহাবে মাদইয়ানের বস্তিগুলি পথে পড়ত যা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। আল্লামা শিহাবুদ্দীন আল হামাভী তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুজামুল বুলদানে লিখেন, মাদইয়ান জনপদটি

---

৩১০. আল-কুরআন, ১৫ : ৭৯।
৩১১. আল-কুরআন, ২৬ : ১৭৬।

লোহিত সাগরের উপকূলে তাবুকের বিপরীত দিকে ওয়াদিউল ক্বোরা ও সিরিয়ার মাঝে অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেন এটি মদিনা এবং সিরিয়ার মাঝখানে অবস্থিত।[৩১২]

আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আইকাহ কে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি নামে উল্লেখ করা হলেও অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা ও গবেষকের মতে এরা মূলত এক ও অভিন্ন সম্প্রদায়। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এর ধারণামতে, এ বস্তিতে 'আইকাহ' নামে একটি বৃক্ষ ছিল। হযরত শুআইব (আ.) এর জাতির লোকেরা এ গাছটির পূজা করত তাই তাদেরকে 'আছহাবে আইকাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ কারণে যে সমস্ত জায়গায় মাদইয়ানবাসীকে আছহাবে আইকাহ নামে উল্লেখ করা হয়েছে সে সমস্ত জায়গায় হযরত শুআইব (আ.) কে তাদের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়নি; কেননা আছহাবে আইকাহ ছিল তাদের ধর্মীয় উপাধি আর হযরত শুআইব (আ.) তাদের ধর্মীয় ভাই ছিলেন না। আবার যে সমস্ত জায়গায় তাদেরকে মাদইয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে সে সমস্ত জায়গায় হযরত শুআইব (আ.) কে তাদের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা মাদইয়ান হল তাদের বংশীয় উপাধি। সুতরাং এটাই প্রবল মত যে, আছহাবে আইকাহ এবং মাদইয়ান মূলত একই জাতির দুটি নাম। পৈত্রিক দিক থেকে তাদেরকে মাদইয়ান এবং ধর্মীয় ও আবাসস্থলের দিক থেকে তাদেরকে আছহাবে আইকাহ বলা হয়েছে।[৩১৩]
আবার কেউ কেউ বলেন, আহলে মাদইয়ান এবং আসহাবে আইকাহ একই গোত্রের দুটি শাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্ত্রী কাতুরার গর্ভজাত সন্তান আরব ও ইসরাইলের ইতিহাসে বনূ কাতুরা নামে খ্যাত, এই বনূ কাতুরা উত্তর আরবে তায়মা, তাবুক এবং আল-উলার মাঝখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আবার তাদেরই একটি গোত্র হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পুত্র মাদইয়ান এর দিক থেকে মাদায়েনী বা আহলে মাদইয়ান নামে খ্যাত। তারা উত্তর হিজায হতে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান হতে সিনাই উপদ্বীপের শেষ সীমা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল যাদের কেন্দ্রস্থল ছিল মাদইয়ান শহর। সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও উভয় সম্প্রদায় কাছাকাছি বসবাস করত। তাই প্রমাণিত হয় যে, উভয় সম্প্রদায় একটি বড় গোত্রের দুটি শাখা। আম্বিয়ায়ে কুরআন গ্রন্থের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আসহাবু মাদইয়ান হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্ত্রী কাতুরার গর্ভজাত সন্তান মাদইয়ান এর বংশধর আর আসহাবুল আইকাহ কাতুরার গর্ভজাত সন্তান ইয়াকযান এর বংশধর। এতে বুঝা যায় উভয় সম্প্রদায় মূলত একই বংশের দুটি শাখা।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, একই সম্প্রদায়ের শহর কেন্দ্রিক বসবাসকারী লোকদেরকে আসহাবু মাদইয়ান বলা হত, কেননা মাদইয়ান ছিল তাদের কেন্দ্রস্থল আর ঐ বংশের যারা গ্রামে বনাঞ্চলে বসবাস করত তাদেরকে বলা হতো আসহাবুল আইকাহ, কেননা আসহাবুল আইকাহ অর্থ হলো বনাঞ্চলের অধিবাসী।

---

৩১২. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আল হামাভী, ***গ্রন্থ মুজামুল বুলদান,*** বৈরুত: দারু ছাদির, ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ., খ. ০৫, পৃ. ৭৭।

৩১৩. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনু. মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৪৬।

চিত্র ১: হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির এলাকা:

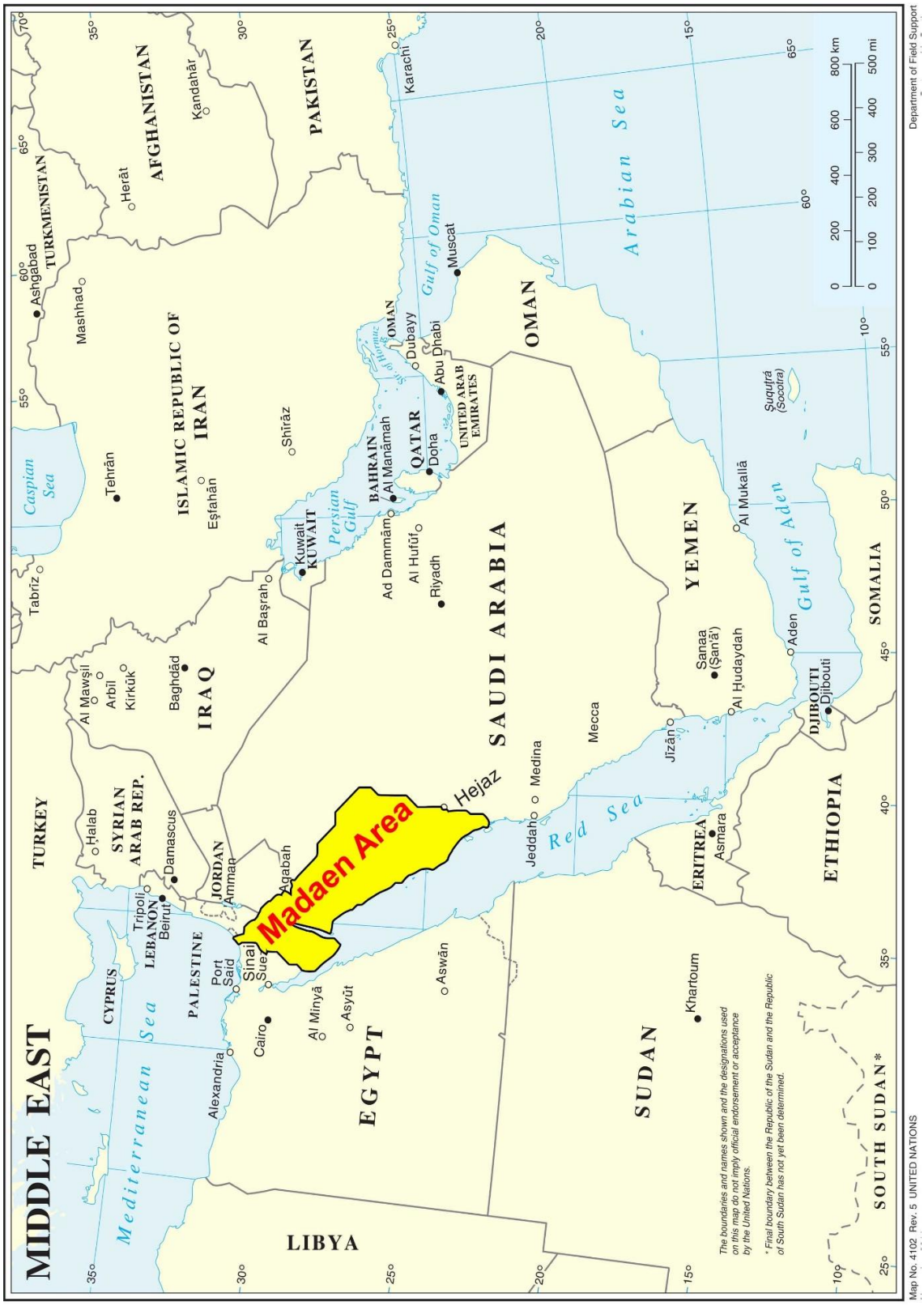

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত অঞ্চলটি ছিল শু'আইব (আ.) এর জাতির আবাসস্থল। তারা উত্তর হিজায হতে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই উপদ্বীপের শেষ সীমা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল যাদের কেন্দ্রস্থল ছিল 'মাদইয়ান' শহর।

চিত্র ২ : হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির এলাকা:

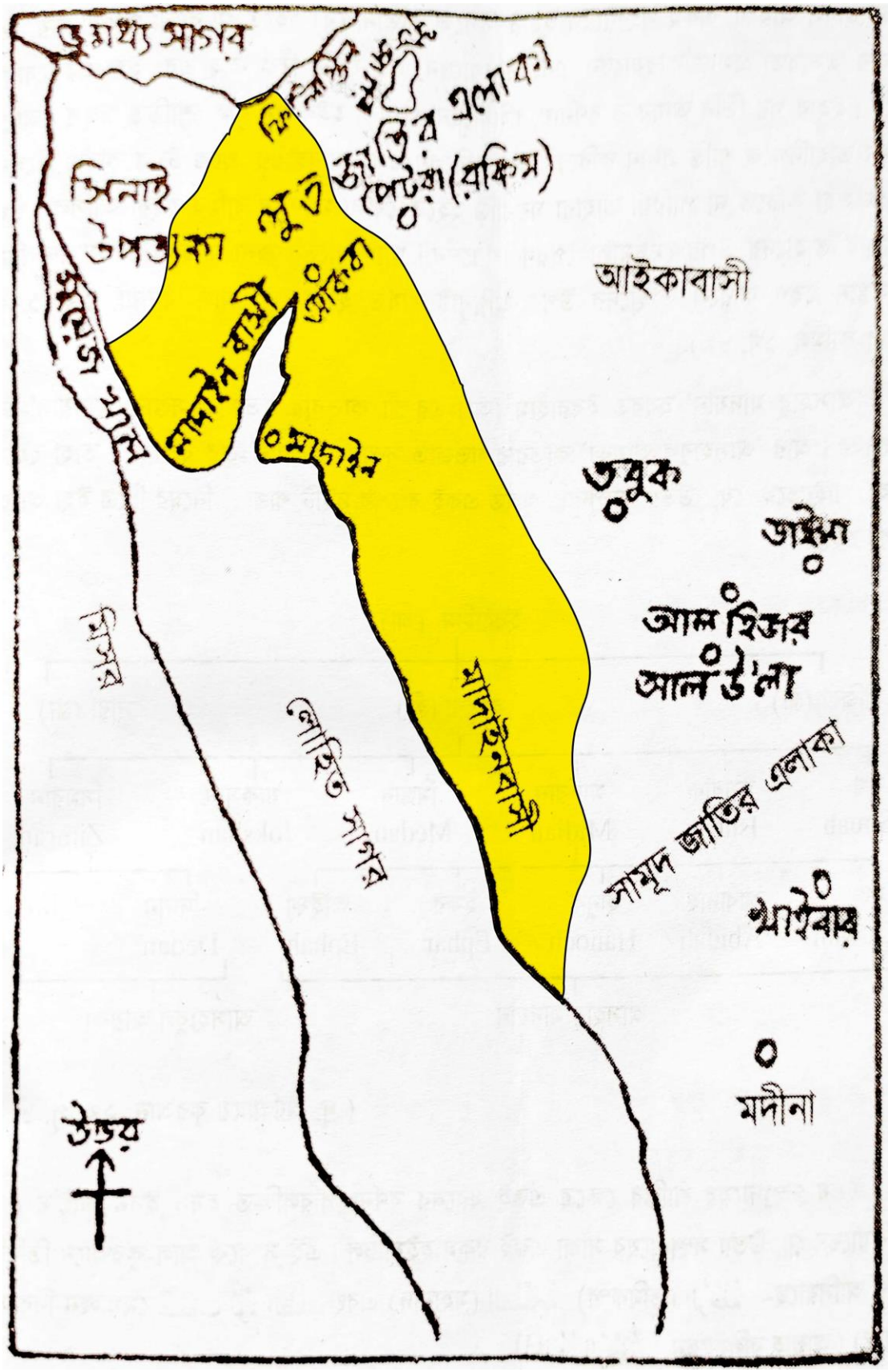

- মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত অঞ্চলটি ছিল শু'আইব (আ.) এর জাতির আবাসস্থল। সূত্র: সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৬১।

৫ম পরিচ্ছেদ
শু'আইব (আ.) এর দাওয়াত ও মাদইয়ানবাসীর ধ্বংস

মানুষের উপর সাধারণত দুই ধরণের পালনীয় কর্তব্য থাকে। যথা: ১. আল্লাহর অধিকার ২. বান্দার অধিকার। আল্লাহর অধিকার তথা নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করা না করার সাথে আদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের লাভ-ক্ষতি সম্পৃক্ত নয়; কিন্তু বান্দার হক যেমন জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের নিরাপত্তা, মান মর্যাদার নিরাপত্তা, বাকস্বাধীনতা এবং সামাজিক সুবিচার ইত্যাদির সাথে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের লাভ ক্ষতি সম্পৃক্ত। তাই কোন সমাজে এগুলো বিঘ্নিত হলে সে সমাজ আর মানুষ বসবাসের উপযোগী থাকে না। মাদইয়ান জাতি আল্লাহর হক এবং বান্দার হক কোনটিরই তোয়াক্কা করত না। তারা যেমনিভাবে আল্লাহর হক বিনষ্ট করে মূর্তিপূজা করত তেমনিভাবে বান্দার হক বিনষ্ট করে অপরের সম্পদ গ্রাস করতেও কোন প্রকার দিধাবোধ করত না। এ জাতি বিভিন্ন ধরণের নাফরমানি এবং পাপকাজে নিমজ্জিত ছিল। তন্মধ্যে প্রধানত তিনটি অপরাধ হল-

১. মূর্তিপূজা। অর্থাৎ তারা এক আল্লাহর সাথে শিরক করত এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। তারা গাছ পূজা, পাথর পূজা, অগ্নি পূজা ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল যার কারণে হযরত শু'আইব (আ.) সর্বপ্রথম তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবান করেছেন।[৩১৪] তাদেরকে পবিত্র কুরআনে কাফির বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[৩১৫] তাদের সবচেয়ে বড় দেবতার নাম ছিল বা'ল। (old testament Gi Book of numbers 22:41, 25:3) তারা সকলে এ দেবতার পূজা করত।
২. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ওজনে কম দেয়া। তাদের মধ্যে একটি বড় দল ছিল ব্যবসায়ী। ইতিহাসে তারাই সর্বপ্রথম ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এদের ব্যবসা ছিল দুর্নীতি এবং প্রতারণায় পরিপূর্ণ। তারা যখন অন্যদের থেকে ক্রয় করত তখন ওজনে বেশী নিত আর যখন অন্যের নিকট বিক্রি করত তখন ওজনে কম দিত।[৩১৬]
৩. ডাকাতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির লোকেরা জনচলাচলের পথে ওঁৎ পেতে বসে থেকে মানুষের সহায় সম্পদ লুণ্ঠন করত[৩১৭] এবং ধোকা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করত।[৩১৮]

পাপাচার এবং নাফরমানি হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির শুধুমাত্র গুটিকয়েক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং গোটা জাতি-ই ধ্বংসের ঘুর্ণিপাকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তারা নিজেদের অসৎ কাজে এতই মত্ত ছিল যে, মূহুর্তের জন্যও তাদের এ অনুভব হত না যে, তাদের কাজসমূহ গুনাহের কাজ; বরং তারা তাদের কর্মসমূহকে গর্বের বিষয় বলে মনে করত। তারা তাদের শান্তি, সচ্ছলতা, ধন-দৌলতের প্রাচুর্যতা, বাগ-বগিচার উর্বরতা, শক্তি এবং সামর্থ ইত্যাদিকে তাদের ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার এবং বংশগত প্রাপ্তি বলে মনে করত। এক মূহুর্তের জন্যও তারা এ চিন্তা করত না যে, এগুলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর দান। তারা মনে করত এগুলো সব তাদেরই অর্জন, তাই তারা নিশ্চিন্তে তাদের

---

৩১৪. আল-কুরআন, ৭ : ৮৫।
৩১৫. আল-কুরআন, ৭ : ৯০।
৩১৬. আল-কুরআন, ১১ : ৮৫।
৩১৭. মূলঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনু. মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।
৩১৮. আল-কুরআন, ১১ : ৮৫।

অন্যায় এবং অবাধ্যতা করেই বেড়াত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য এবং অসৎ কার্যাবলী ও পাপাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরই মধ্য থেকে একজন সৎ, যোগ্য, আমানতদার, পরহেযগার ও চরিত্রবান লোককে মনোনীত করে তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন আর তিনিই হচ্ছেন হযরত শু'আইব (আ.)।

হযরত শু'আইব (আ.) তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের কথা বলেন। পাশাপাশি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ওজনে কম-বেশ করা এবং মানুষের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তাদের এভাবে দাওয়াত দেন, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ- وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর তোমরা ওজন ও মাপে কম করো না। আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আর আমি তোমাদের উপর এমন এক দিনের আযাবের ভয় করছি যা হবে বেষ্টনকারী। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মাপ ও ওজন পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন কর এবং লোকদের দ্রব্য দিতে তাদের ক্ষতি সাধন করো না। আর ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ করে সীমালংঘন করো না।[৩১৯]

হযরত শু'আইব (আ.) এর আহবানে সাড়া না দিয়ে কাফেররা তার জবাবে বলল, হে শু'আইব! মাল সামগ্রী আমাদের, পরিমাপে কম দেব, না বেশী দেব, তা একান্ত আমাদের ব্যাপার, তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। অতঃপর শু'আইব (আ.) বললেন এতদিন তোমরা তোমাদের এসব অসৎ কার্যাবলীর মন্দ পরিণাম জানতে না। কিন্তু এখন তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন এবং নির্দেশ এসে পৌঁছেছে। এখন যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদাত না কর এবং ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম-বেশ কর তবে তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব আপতিত হবে। তাদের প্রতি হযরত শু'আইব (আ.) এর সতর্কবাণী পবিত্র কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ -وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতি তোমাদের জেদ যেন এমন না হয় যে, এর কারণে তোমাদের উপর ঐরূপ বিপদ এসে পড়ে যেরূপ বিপদ হযরত নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়, হুদ (আ.) এর সম্প্রদায় এবং সালেহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের উপর এসেছিল। এছাড়া হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে খুব বেশী দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার নিকট তওবা কর; নিশ্চয় আমার রব অতিশয় দয়ালু এবং প্রেমময়।[৩২০] কিন্তু হযরত শু'আইব (আ.) এর আহবানে সাড়া না দিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে হুমকি ধমকী দিতে লাগল। তারা বলল, يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ

---

[৩১৯]. আল-কুরআন, ১১ : ৮৪-৮৫; ৭ : ৮৫

[৩২০]. আল-কুরআন, ১১ : ৮৯-৯০।

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ অর্থাৎ হে শু'আইব! আমরা তোমার অনেক কথাই বুঝি না। আর আমরা তোমাকে আমাদের মাঝে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমার আত্মীয় স্বজন না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলতাম। আমাদের নিকট তোমার কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই।[৩২১]

হযরত শু'আইব (আ.) অত্যন্ত মার্জিতভাষী এবং স্থানোচিত বক্তা ছিলেন। তিনি সুমধুর বাণী, সুন্দর সম্ভাষণ, বর্ণনা পদ্ধতি এবং বাকচাতুর্যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যার কারণে তাফসীরকারকগণ তাকে খতীবুল আম্বিয়া উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) হযরত শু'আইব (আ.) এর নাম উল্লেখকালে তাকে খতীবুল আম্বিয়া বলে আখ্যায়িত করতেন।[৩২২] অতএব সম্প্রদায়ের হুমকি ধমকির পরেও হযরত শুআইব (আ.) নরমে গরমে অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় তাদেরকে পুনঃ পুনঃ দাওয়াত দিতেই থাকলেন। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, একমাত্র তারই ইবাদাত কর, আমাকে সত্য নবী বলে স্বীকার কর, আমার কথা মেনে নাও এবং আমার কথায় সাড়া দাও; কিন্তু তার হিদায়াতের বাণীগুলো এ হতভাগ্য জাতির কোন উপকারে আসল না। গুটিকয়েক দুর্বল লোক ব্যতীত আর কেহই তার ডাকে সাড়া দিল না। তারা নিজেরা তাদের অসৎ কার্যাবলীর উপর বলবৎ রইল এবং অন্যদেরকেও সৎ পথ থেকে বাধা দিতে থাকল। তারা পথে পথে বসে থাকত এবং হযরত শু'আইব (আ.) এর নিকট আগমনকারীদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা প্রদান করত আর সুযোগ পেলেই মানুষের সম্পদ লুটপাট করত। তারা বলল হে শুআইব! দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি হবে, হয়তো আমরা তোমাকে এবং তোমার ঈমান আনয়নকারী সঙ্গী সাথীদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দিব অথবা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ধর্মে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। হযরত শু'আইব (আ.) প্রতিউত্তরে বললেন, যদি আমরা তোমাদের ধর্মকে মিথ্যা ও বাতিল বলে মনে করি তাহলেও কি আমাদেরকে তোমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে? আর এটাতো বড় জুলুমের কথা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের মিথ্যা ও বাতিল ধর্ম থেকে নাজাত দেয়ার পর আবার তোমাদের ধর্মে ফিরে যাওয়ার অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া যা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, আমরাতো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখব।

হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির লোকেরা তার এবং তার সঙ্গী সাথীদের দৃড় সংকল্প এবং মনোবল দেখে তাদের কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। তারা তাদের জাতির লোকদের বলতে লাগল, সাবধান! তোমরা শু'আইবের কথা মান্য করো না। যদি তার কথা মত চল তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত শু'আইব (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করি। আমি আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমানও পেশ করছি। এছাড়া আমি তোমাদেরকে হিদায়াত ও নসীহত করার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিকও দাবী করছি না এবং তোমাদের নিকট দুনিয়ার কোন স্বার্থও দাবী করছি না। তারপরও তোমরা অবাধ্যতা ও বিরোধিতার কোন দিকই বাকী রাখনি। তোমরা সর্বাত্বক বিরোধিতা করে যাচ্ছ। আমার আশংকা হচ্ছে যে, যদি তোমরা অমান্য করতেই থাক তাহলে আল্লাহর আযাব এসে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। জাতির লোকেরা একথা শুনে অত্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে বলল, يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا

---

৩২১. আল-কুরআন, ১১ : ৯১।

৩২২. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাছীর (র.), *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,* প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৪২৯।

نَشَاءُ অর্থাৎ হে শু'আইব! তোমার নামাজ কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, তুমি আমাদেরকে এসে বল, আমরা যেন এই মূর্তিসমূহকে ত্যাগ করি যাদের পূজা আমাদের পূর্ব পুরুষরাও করত অথবা আমাদের ধনসম্পদে আমাদের ইচ্ছামত লেনদেন পরিত্যাগ করি?[৩২৩]

তোমার কথামত যদি আমরা ওজনে কম দেয়া পরিত্যাগ করি এবং লেন-দেন আমাদের ইচ্ছামত না করি তাহলেতো আমরা দরিদ্র এবং কাঙ্গাল হয়ে যাব। এতএব এমন ক্ষতি মেনে নিয়ে কি কেউ তোমাকে সত্যিকারের পথ প্রদর্শক বলে মেনে নিতে পারে? তা কখনোই হতে পারে না। তখন হযরত শু'আইব (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত মনে তাদেরকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের এই বেপরোয়া মনোভাবের পরিণতি যেন এমন না হয় যেরূপ পরিণতি হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.), ছালেহ (আ.) এবং হযরত লূত (আ.) এর জাতির হয়েছিল। এখনও সময় আছে তওবা করার এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে মাথা নত করে নিজেদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে নেয়ার; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির লোকেরা এ কথার জবাবে হযরত শু'আইব (আ.) কে বলল, হে শু'আইব! আমাদের বুঝে আসে না যে, তুমি কী বলতে চাচ্ছ? তোমার কথা যদি সত্য হত তবে তুমি আমাদের চেয়ে আরও বেশী প্রাচুর্যতার মধ্যে থাকতে; অথচ তুমি আমাদের চেয়ে অনেক দরিদ্র ও দুর্বল। আমরা শুধু তোমার বংশধরদেরকে ভয় করছি; অন্যথায় আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ছাড়তাম। তখন হযরত শু'আইব (আ.) বললেন, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ তা'আলা থেকেও আমার বংশধরগণ অধিক ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে? অথচ আমার প্রতিপালক তোমাদের সকল কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলেন এই বলে, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমার এবং আমার জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন; নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম ফয়সালাকারী। তিনি তার জাতির লোকদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান তবে তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অপেক্ষায় থাক। অচিরেই আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা এসে যাবে এবং পরিস্কার হয়ে যাবে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী ও আযাবের উপযোগী। তোমরা অপেক্ষায় থাক আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত শু'আইব (আ.) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে শু'আইব (আ.)! আল্লাহ তা'আলা খুব দ্রুত আপনার জাতির প্রতি আযাব নাযিল করবেন; সুতরাং যারা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন তাদেরকে নিয়ে আপনি শহর থেকে বের হয়ে যান। হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পেয়ে হযরত শু'আইব (আ.) স্বীয় পরিবার পরিজন এবং তার উপর ঈমান আনয়নকারী 'এক হাজার সাতশত লোক' কে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন।[৩২৪] অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল।

---

৩২৩. আল-কুরআন, ১১ : ৮৭।

৩২৪. মূলঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদঃ মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির প্রতি তিন ধরণের আযাব নাযিলের বর্ণনা রয়েছে।

১. **বিকট আওয়াজঃ** আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক হযরত শু'আইব (আ.) তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শহর ছেড়ে যখন তিন ক্রোশ দূরে চলে যান তখন হযরত জিবরাইল (আ.) এসে তাকে সংবাদ দিলেন যে আগামী দিন প্রাতঃকালে তার জাতির উপর আযাব আসবে অতঃপর হযরত শু'আইব (আ.) সেখানে প্রাতঃকালে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকেন যে অবস্থায় তার জাতির লোকেরা সবাই ঘুমন্ত। "এমতাবস্থায় তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করল ফলে তারা সকলে নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে রইল। আর তারা এমনভাবে ধ্বংস হল মনে হচ্ছে যেন তারা এ ঘর সমূহে কখনও বসতি-ই স্থাপন করেনি"।[৩২৫]

২. **ভূকম্পনঃ** যখন তারা নিশ্চিন্ত মনে তাদের গৃহে আরাম করছিল ঠিক তখনি ভোর বেলায় এক ভয়ঙ্কর ভূকম্পন শুরু হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন "অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করল ভূমিকম্প। ফলে তারা প্রাতঃকালে তাদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"[৩২৬]

৩. **অগ্নি বৃষ্টিঃ** ভূমিকম্পের পরপরই তাদের উপর শুরু হয় অগ্নিবৃষ্টি। কুরআনের ভাষায় "অতঃপর তারা হযরত শু'আইব (আ.) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ফলে তাদেরকে পাকড়াও করল (অগ্নিবর্ষনকারী) মেঘওয়ালা আযাব; আর নিঃসন্দেহে ইহা এক ভয়ঙ্কর দিবসের আযাব ছিল।"[৩২৭] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন: হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির উপর প্রথমে ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয় যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমনকি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর তারা অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ তা'আলা ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন যার ছায়ায় শীতল বাতাশ বইতেছিল। তারা গরমে জ্ঞানহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করে মেঘের নিচে এসে ভীড় জমাল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হল এবং তার সাথে ভূমিকম্পও হল। ফলে তারা সবাই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প এবং অগ্নিবৃষ্টি উভয় প্রকার আযাবই আপতিত হল।[৩২৮]

প্রাতঃকালে দর্শকগণ দেখল যে, গতকালের অবাধ্য এবং অহঙ্কারী জাতি আজ বিদগ্ধ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত শু'আইব (আ.) এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেন এবং তার অবাধ্য জাতিকে আসমানী গযবে ধ্বংস করে দেন।

---

৩২৫. আল-কুরআন, ১১ : ৯৪, ৯৫।

৩২৬. আল-কুরআন, ৭ : ৯১।

৩২৭. আল-কুরআন, ২৬ : ১৮৯।

৩২৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ:), *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআান*, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
তাদের ঘটনায় আমাদের শিক্ষা

১. শিরক একটি অমার্জনীয় জঘন্য অপরাধ যা আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা লূত জাতি এবং মাদায়েনবাসীকে তার সাথে শরীক করার অপরাধে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

২. পারিবারিক শান্তি এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী বিধান বিবাহ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। যারা এ বিবাহ ব্যবস্থা বাদ দিয়ে সমকামিতা, সমবিবাহ, পশুকামিতা এবং পায়ুপথে সঙ্গম ইত্যাদি পথ বেছে নিবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তারা দুনিয়াতে যেমন আসমানী গযব ও এইডস নামক মরণব্যাধিতে ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি। সমকামিতার অপরাধে আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.) এর জাতি সাদুমবাসীকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. ব্যবসায়িক লেনদেনে জেনে শুনে কম দেয়া মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয় আর অপরাধী দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসে পর্যবসিত হয় যা মাদইয়ানবাসীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। রাসূল (স.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন মদীনাবাসীর মধ্যেও এ অপরাধটি বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা মুতাফফিফীন এর শুরুর আয়াতগুলি অবতীর্ণ করে তাদেরকে এহেন কাজ থেকে সতর্ক করেন। ফলে তারা এ প্রতারণামূলক কাজ থেকে ফিরে আসে।

৪. ডাকাতি, লুণ্ঠন ও ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি অপরাধ সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। এ সকল অপরাধের কারণে মানুষের জান মাল অরক্ষিত হয়ে পড়ে ও সমাজে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে সর্বদা অজানা আতঙ্ক বিরাজ করে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাদইয়ানবাসীর ঘটনা। আদর্শ সমাজ গঠন ও মানবতার কল্যাণে এ সকল অপরাধের মূলোৎপাটন একান্ত প্রয়োজন যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে।

৫. নিজেরা অপরাধ করে সদুপদেশ প্রদানকারীকে তিরস্কার করা এবং তাকে হত্যার হুমকি দেয়া জঘন্যতম অপরাধ। এতে নিজেদের দম্ভ অহংকার আরও বেড়ে যায় এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়, যা জুলুমের নামান্তর, ফলশ্রুতিতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে। যাতে লিপ্ত ছিল হযরত লূত (আ.) এবং হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতি।

৬. বেঈমান যতবড় আল্লাহওয়ালার নিকটাত্মীয়-ই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাকে কোন ধরনের ছাড় দেন না। যেমন হযরত লূত (আ.) এর স্ত্রী বেঈমান হওয়ার কারণে হযরত লূত (আ.) এর খাতিরেও আল্লাহ তা'আলা তাকে কোন ছাড় দেন নি; বরং তাকেও তার জাতির সাথে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৭. নবী-রাসূল, দ্বীনের দাঈ এবং ঈমানদারগণ সাধারণত দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির হয়ে থাকেন। তাই দুর্বলতার কারণে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ বৈ কিছুই নয়। কেননা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা হকের মানদণ্ড হতে পারে না। জনবল এবং ধনবলের গৌরব সাধারণত মানুষকে ধ্বংসের পথে ধাবিত করে। হযরত শু'আইব (আ.) এর জাতির ধ্বংসের পেছনেও এ কারণটি বিদ্যমান ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়
ফিরআউনের গোষ্ঠী ও তাদের সলিল সমাধি

১ম পরিচ্ছেদ
ফিরআউন ও তার জাতির পরিচয়

ফিরআউন শব্দের অর্থ হল সূর্যদেবতা। এটা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয় বরং এটা মিশরের সম্রাটদের উপাধি। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে এ উপাধিধারীরা মিশর শাসন করত আর তাদের সর্বশেষ সম্রাট সেকান্দার শাহের পতনের মাধ্যমে ফিরআউন উপাধিধারী সম্রাটদের পতন ঘটে। ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ দীর্ঘ সময়ে সর্বমোট ৩১ জন ফিরআউন মিশর শাসন করেছে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর যুগে যে ফিরআউন মিশরের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল সে আমালেকা বংশের লোক ছিল। আমালেকা আরবের কোন একটি বংশের শাখাগোত্র। অনেক ঐতিহাসিকের মতে হযরত মূসা (আ.) এর সময়কার ফিরআউনও আমালেকা বংশোদ্ভূত ছিল। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে, কেউ কেউ বলেন 'ফিরআউন' সে সময়কার বাদশাহর মূল নাম আবার কেউ কেউ বলেন এটা আমালেকা বংশের প্রত্যেক বাদশাহর উপাধি। যেমন 'কিসরা' পারস্য সম্রাটদের উপাধি, 'কায়সার' রোম সম্রাটদের উপাধি এবং 'নাজ্জাসী' আবিসিনিয়ার বাদশাহদের উপাধি।[৩২৯] ওহাব (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.) এর সময়কার ফিরআউনের নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান এবং তার উপনাম ছিল আবু মুররাহ।[৩৩০] কারো কারো মতে তার নাম মুসআব বিন রাইয়ান।[৩৩১] আহলে কিতাবদের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) এর সময়কার ফিরআউনের নাম ছিল কাবূস।[৩৩২] আল্লামা সুহাইলী (র.) বলেন কিবতী বংশ এবং মিশরের প্রত্যেক বাদশাহর উপাধি-ই ছিল 'ফিরআউন'।[৩৩৩]

ক্বিবতী বংশ হল মিশরের আদি বাসিন্দা। ফিরআউন ছিল এ ক্বিবতী বংশের লোক আর এ কিবতী বংশ-ই ছিল মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। মধ্যখান দিয়ে এদের থেকে 'হাকসুস' রাজাগণ রাজত্ব কেড়ে নেয় যাদের শাসন ক্ষমতা প্রায় দুই শত বছর স্থায়ী হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) এদের সময়ই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এদের প্রায় দুই শত বছর পর ক্বিবতী বংশের লোকেরা পুনরায় মিশরের শাসন ক্ষমতা দখল করে। তারই ধারাবাহিকতায় হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) এর সময়ে যে ফিরআউন ক্ষমতায় ছিল তার নাম ছিল দ্বিতীয় রেমেসীস।

ফিরআউন ছিল কিবতী বংশের লোক যে বংশের অবস্থান ছিল মিশরে। মিশর শব্দটি আরবি (مصر) শব্দ। প্রাচীন মিশর উত্তর আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন সভ্যতা। নীল নদের নিম্নভূমি অঞ্চলে এ

---

৩২৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৮৩।

৩৩০. প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৮৩।

৩৩১. মূলঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদঃ মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

৩৩২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৮৩; মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআান***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০।

৩৩৩. প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৮৩।

সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ অঞ্চলটি বর্তমানে মিশর রাষ্ট্রের অধিগত। মিশর আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি দেশ। এর বর্তমান রাজধানী কায়রো যার পশ্চিমে লিবিয়া, দক্ষিণে সুদান এবং উত্তর-পূর্বে গাজা উপত্যকার সীমান্ত রয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বে আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগর।[৩৩৪] হযরত মূসা (আ.) এর সময়ে মিশরের রাজধানী ছিল মুমসেফ।[৩৩৫]

---

৩৩৪. সূত্র: ***মিশর***, উইকিপিডিয়া।

৩৩৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৩১২ ও ৪২৬।

চিত্র ১ : ফিরআউন ও তার জাতির অবস্থান:

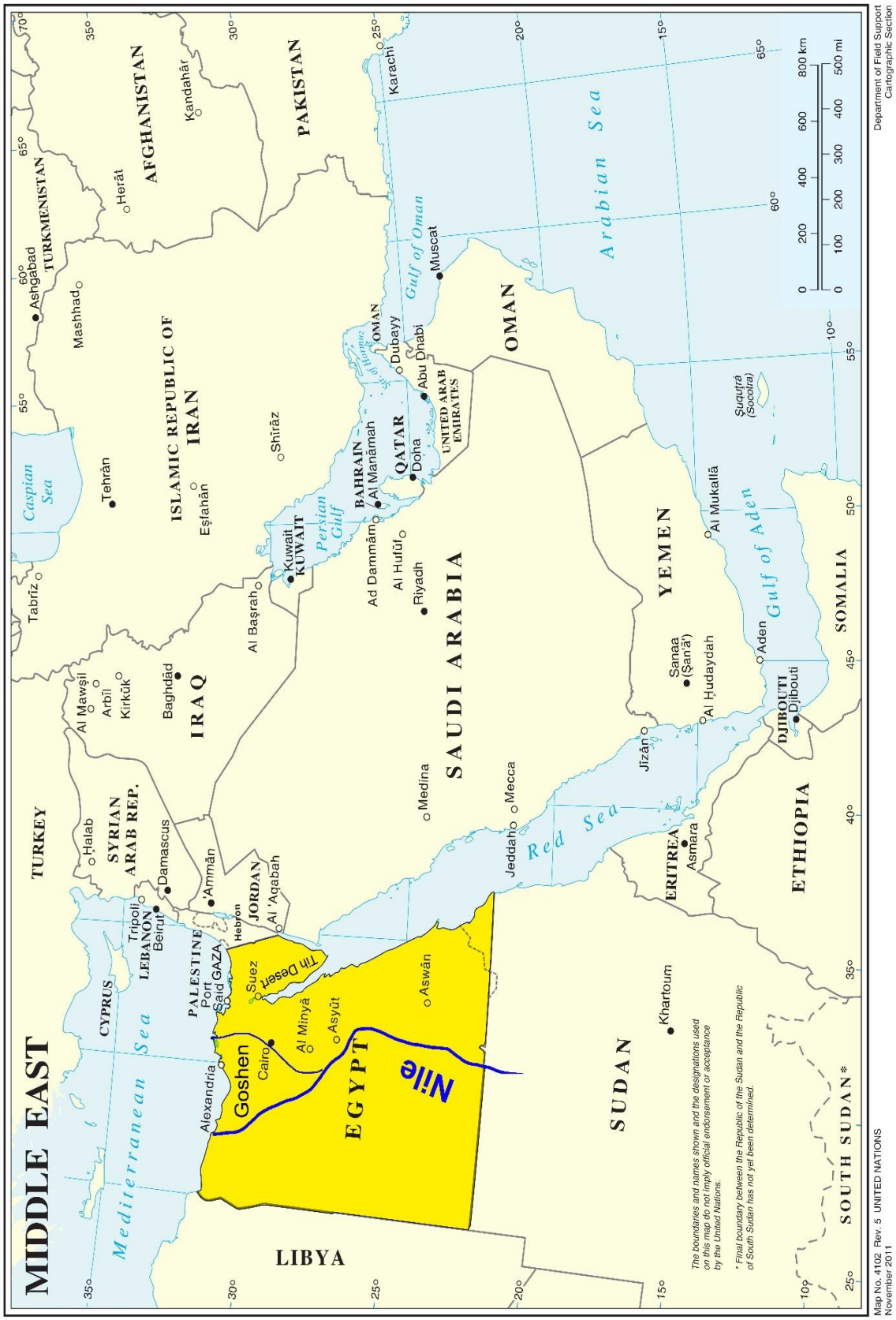

- ফিরআউন ও তার কিবতী বংশের অবস্থান ছিল মানচিত্রে হলুদ চিহ্নিত অঞ্চল 'মিশরে'। মিশর আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি দেশ। এর বর্তমান রাজধানী কায়রো যার পশ্চিমে লিবিয়া, দক্ষিণে সুদান এবং উত্তর-পূর্বে গাজা উপত্যকার সীমান্ত রয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বে আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগর।

চিত্র ২ : বনী ইসরাঈলের মিশরে আগমন এবং সেখান থেকে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের চিত্র :

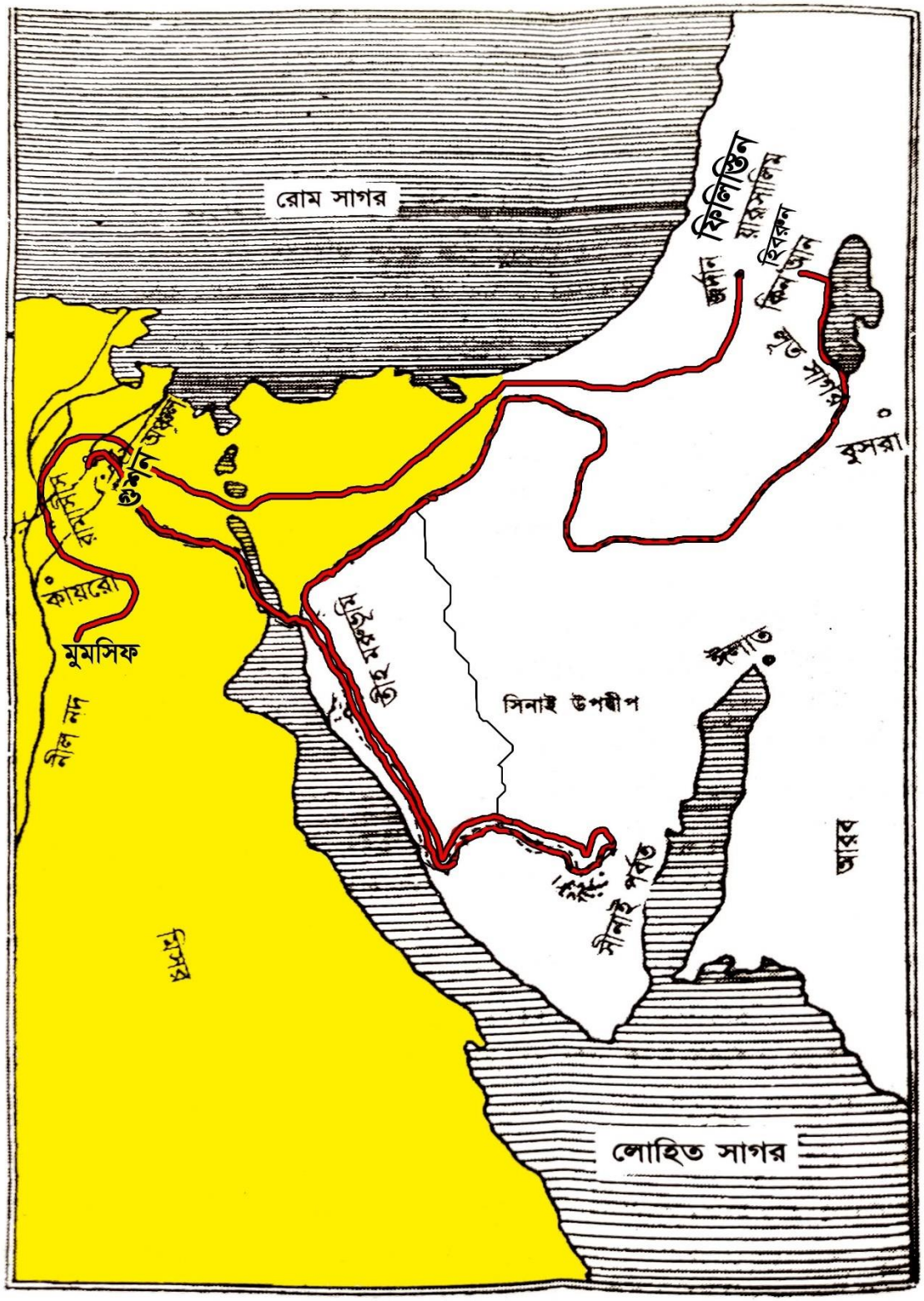

- বনী ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল 'ফিলিস্তিনের কিনআনে যার বর্তমান নাম হিবরুন'। সেখান থেকে তারা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর সাথে মিশরে আগমন করেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে জুশন/গুশন (Goshen) অঞ্চলে পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে তীহ ময়দানে চল্লিশ বছর যাবত অবস্থান করেন, সেখানে তারা উদভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকে। চল্লিশ বছর পর হযরত ইউশা (আ.) এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল পুনরায় ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। চিত্রে লাল চিহ্নিত পথে বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন থেকে মিশরে আগমন করেছিল এবং পুনরায় মিশরের গুশন থেকে তীহ ময়দান হয়ে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করেছিল। সূত্র: সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৪২৭।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, মূসা (আ.) এর সময়কার ফিরআউন ছিল আতর বিক্রেতা। তার মূল নিবাস ছিল ইসফাহানে। সে ব্যবসাতে লোকসান করে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে, ফলে সে ঋণ পরিশোধ করার জন্য বের হয়ে পড়ে। এভাবে এ দেশ ঐ দেশ ঘুরতে ঘুরতে সে মিশরে এসে উপস্থিত হয়। মিশরে এসে শহরের দরজায় সে এক ঝুড়ি তরমুজ/শসা দেখতে পায় যা এক দিরহামে বিক্রি হবে; অথচ শহরে উহার এক একটির দাম এক দিরহাম করে। ফিরআউন মনে মনে চিন্তা করল আমি এমন এক স্থানে এসেছি মনে হয় এখানে আমার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে। অতঃপর সে এক দিরহামের বিনিময়ে উক্ত ঝুড়ি তরমুজ/শসা ক্রয় করে উহা নিয়ে শহরের বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। কিন্তু লোকজন এসে প্রত্যেকে একটি করে শসা নিয়ে গেল আর একটি মাত্র শসা অবশিষ্ট রইল। সে উহা শহরে এক দিরহামে বিক্রয় করল। এতে সে বিরক্ত ও মনক্ষুন্ন হল। তারা বলল এটাই আমাদের রীতি। সে বলল এখানে কি এমন কোন লোক নেই যে সুবিচার করবে? এখানে কি কোন সাহায্যকারী নেই? তারা বলল, না এখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যিনি নিজের আরাম আয়েশে বিভোর থাকেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে লোকজনের বিষয়াদি দেখা শুনা করার জন্য নিয়োগ করে দিয়েছেন, নিজে কোন কিছুই দেখেন না। অতঃপর সে কবরের উপর চাদর বিছিয়ে পয়সা আদায় করতে লাগল। সে লাশপ্রতি চার দিরহাম আদায় করত। এমনিভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন বাদশাহর কন্যা মারা গেল। লোকজন তার কবর দিতে আসলে সে তাদের নিকট চার দিরহাম দাবী করলো। লোকজন বলল, এটা বাদশাহর কন্যার লাশ। তখন সে বলল তবে আট দিরহাম দিতে হবে। এভাবে তারা যতই বিবাদ করতে লাগল সে ততই দিরহামের অংক দ্বিগুণ করতে লাগল। তারা ফিরে গিয়ে বাদশাহকে বলল, মৃতদের দেখা শুনার কর্মচারী আমাদের সাথে এরূপ আচরণ করছে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল সে কর্মচারী কে? তারা তার বিবরণ দিল। অতঃপর বাদশাহ মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি তাকে নিয়োগ দিয়েছ? মন্ত্রী জবাবে বলল, না। অতঃপর বাদশাহ ফিরআউনকে ডেকে এনে বলল, তোমাকে কে নিয়োগ করেছে? তখন সে তার তরমুজ বিক্রয়ের ঘটনাটি বর্ণনা করল এবং বলল যে, লোকজন তাকে বলেছে এখানে ন্যায় বিচার করার মত কোন মানুষ নেই। আমি এজন্য এরূপ করেছি যা আপনি দেখতেছেন যেন বিষয়টি আপনার পর্যন্ত পৌঁছে এবং আপনি আপনার রাজত্বের ব্যাপারে সচেতন হতে পারেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কত দিন থেকে তুমি এ কাজ করছ? সে বলল, অনেক বছর, এভাবে আমি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছি। অতঃপর বাদশাহর নির্দেশে মন্ত্রীকে হত্যা করা হল। আর ফিরআউনকে তার স্থলে মন্ত্রী নিয়োগ করা হল। মন্ত্রী হওয়ার পর সে খুব উত্তম আচরণ করল এবং মিশরবাসীর জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করল। সে ন্যায়বিচার করতে লাগল যদিও তা ছিল ব্যক্তিস্বার্থের জন্য। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বাদশাহ মৃত্যুবরণ করল। তখন প্রজা সাধারণ নূতন বাদশাহ নিযুক্ত করার জন্য একত্র হল এবং তারা একমত পোষণ করল যে, তারা ফিরআউনকে ছাড়া আর কাউকে বাদশাহ নিযুক্ত করবে না, যে তাদের জন্য অরাম আয়েশ ও সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করেছে। অতঃপর তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ফিরআউনকেই বাদশাহ নিযুক্ত করল। অতঃপর তার রাজত্বকাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল এমনকি শেষে সে ইলাহ দাবী করে বসল।[৩৩৬]

---

৩৩৬. আল্লামা জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওযী, ***আল-মুনতাযাম ফি তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম***, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি., ১৯৯২ খৃ., খ. ০১, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ফিরআউনের মূল জন্মস্থান ছিল বলখে। সে তার জন্মস্থান বলখ থেকে দেশ ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথিমধ্যে তার সাথে হামানের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। এ হামানই পরবর্তীতে তার মন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে। সেখান থেকে দুই অভিশপ্ত একত্রিত হয়ে মিশরে উপনীত হয়। সময়টা ছিল খরবুজা উৎপাদনের মৌসুম। তারা এক ক্ষেত মালিকের নিকট খরবুজা খেতে চায়। মালিক জবাবে বলল তোমরা যদি বাজারে গিয়ে আমার খরবুজা বিক্রি করে দিতে পার তাহলে তোমাদেরকে খেতে দিব। তারা উভয়ে রাজি হয়ে গেল। অতঃপর ফিরআউন হামানকে রেখে মালিকের খরবুজা নিয়ে শহরের বাজারে গেল। শহরের বিক্রেতারা বলল আমরা নগদ টাকায় পন্য সামগ্রী ক্রয় করি না। বাকীতে ক্রয় করে বিক্রি শেষে যার যার মূল্য পরিশোধ করে দেই। ফিরআউন খরবুজা বিক্রি করে খালি হাতে ফিরে এসে মালিককে বলল এটা কোন ভাল কাজ নয়। আমি এ কাজ করব না। এ কথা বলে সে মিসরের রাজার নিকট গিয়ে আবেদন করল, আমি মুসাফির, দরিদ্র এবং অসহায় লোক। এখানে আমার খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। অনাহারে অর্ধাহারে আমি দিন দিন অক্ষম ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। অতএব জাঁহাপনার রাজদরবারে এমন কোন একটি কাজ প্রার্থনা করছি যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারি। জাঁহাপনা দয়াপরবশ হলে অধম কৃতার্থ হবে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কী কাজ চাও? সে বলল আমি কবরস্থান পাহারাদারির কাজ চাই যাতে আমার অনুমতি ব্যতীত কোন শবদেহ সমাহিত হতে না পারে। চাহিদা মোতাবেক জাঁহাপনা তাকে কবরস্থান পাহারাদারির চাকরীতে নিয়োগ দান করলেন। রাজার অনুমতি পেয়ে সে গোরস্থানের পাহারাদারির কাজ শুরু করে। আল্লাহর ইচ্ছায় সে বছর মিশরে প্লেগ রোগ মহামারি আকার ধারণ করে। ফলে প্রতিদিন বহু লোক মারা যায় আর ফিরআউন প্রত্যেক মৃতদেহ সমাহিত করতে এক স্বর্ণমুদ্রা করে আদায় করতে থাকে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরআউন প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এরপর ফিরআউন রাজদরবারের লোকদেরকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে শহরের সবকয়টি কবরস্থানের দায়িত্ব হাতিয়ে নেয়। মিশরের রাজাও তাকে অজ্ঞতাবশত আদর স্নেহ ও যথাযোগ্য আনুকূল্য প্রদান করত। একদিন হঠাৎ করে মিশরের মন্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন মিশরের রাজা ফিরআউনকে মিসরের মন্ত্রীত্ব প্রদান করে। ফিরআউন মিসরের মন্ত্রীত্ব পেয়ে তার দোস্ত হামানের নিকট তার মনের চাহিদা ব্যক্ত করে যে, সে নিজেকে খোদা দাবী করতে চায়। হামান বলল যদি এটাই তোমার ইচ্ছা হয় তবে আগে লোকজনকে হাত করতে থাক। তখন ফিরআউন বলল, কিভাবে লোকজনকে হাত করতে পারি? অতঃপর দুজনে মিলে একটি পন্থা বের করল। ফিরআউনের রাজদরবারে গিয়ে আবেদন জানাল, মহারাজ! এ বছর প্রজাসাধারণের কর মওকুফ করে দিন। আমি আমার নিজস্ব তহবিল থেকে রাজকোষাগারে তা জমা দিয়ে দেব। রাজা বলল, ঠিক আছে তোমার খাতিরে আমি আমার প্রজাসাধারণের এ বছরের কর মওকুফ করে দিলাম। ফিরআউন রাজকোষাগারের দায়িত্বশীলকে ডেকে বলল এ বছরের প্রজাদের থেকে খাজনা কর কী পরিমাণ উসূল হতে পারে? দায়িত্বশীল তার পরিমান জানিয়ে দিল। সে নিজের তহবিল থেকে তা রাজ কোষাগারে জমা দিয়ে আরও দুই বছরের জন্য কর খাজনা মাফের আবেদন করল। মিসরের রাজা তার এ আবেদনও পূরণ করল। ফিরআউনের এ বদান্যতা দেখে মিসরের জনসাধারণ খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ল এবং ফিরআউনের প্রতি শুকরিয়া আদায় করল। পরপর তিন বছর মানুষের কর মওকুফ করে দেয়ার কারণে মানুষ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠল এবং তারা ফিরআউনের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। কিছুদিন পর মিশরের রাজা মৃত্যুবরণ করল। তার এমন কোন উত্তরাধিকারী ছিল না যে তার মৃত্যুর পর

তার সিংহাসনে আরোহণ করবে। তার ইন্তেকালের পরে দেশের সকল জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বস্তরের মানুষ রাজদরবারে একত্র হয়ে পরবর্তী রাজা নির্বাচন করার জন্য পরামর্শ সভায় বসে। পূর্ব থেকেই মিশরের জনগণ ফিরআউনের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিভা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। কেননা তার একক ভুমিকার কারণেই ইতিপূর্বে রাজা তিন বছরের কর মওকুফ করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা সকলে মিলে ফিরআউনকে পরবর্তী রাজা ঘোষণা করল।[৩৩৭]

ফিরআউন ক্ষমতায় আসীন হয়ে অভিশপ্ত হামানকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করল। এবার ফিরআউন বলল এখন সমগ্র মিশর আমার করায়ত্বে। সুতরাং আমি চাই সমগ্র মানুষ আমাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করুক। হামান বলল, তাহলে এমন কিছু কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে মানুষ আপনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়। আর তা হল আপনি সমগ্র মিশরে সকল প্রকার শিক্ষা দীক্ষা বন্ধ করে দিন। তাহলে মানুষ আস্তে আস্তে মূর্খ হয়ে পড়বে। এক সময় তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে আপনাকে উপাস্যরূপে মেনে নিবে। হামানের পরামর্শ মোতাবেক ফিরআউন মিশরে রাজকীয় ফরমান জারী করে দিল যে, আজ থেকে মিশরে কেউ কোন প্রকার শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারবে না। যদি কেউ এ আদেশ লংঘন করে শিক্ষা-দীক্ষার কাজ পরিচালনা করে তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ফিরআউনের নির্দেশে ভীত হয়ে সবাই শিক্ষা দীক্ষার কাজ বন্ধ করে দেয়। এভাবে সমগ্র জাতি আস্তে আস্তে অজ্ঞ হয়ে পড়ে। তারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে। এক সময় ফিরআউন ঘোষণা দেয়, তোমরা দেব-দেবীকে সিজদা কর, সেগুলির পূজা অর্চনা কর। তার ঘোষণা মোতাবেক কিবতী বংশের লোকেরা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে দেয়। এভাবে বছর খানেক যাওয়ার পর ফিরআউন বলে, মূর্তিগুলো হল তোমাদের ছোট খোদা আর আমি হলাম তোমাদের বড় খোদা।[৩৩৮] কেননা মূর্তিগুলোকে খোদায়ী আমি দান করেছি। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

"অতঃপর সে ঘোষণা করল, আমি তোমাদের বড় খোদা।"[৩৩৯]

২য় পরিচ্ছেদ
মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের পূর্ব ইতিহাস

মূসা (আ.) হচ্ছেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম প্রধান রাসূল। আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, মূসা (আ.) কে এ জন্য মূসা নামে নামকরণ করা হয়েছে যে, তারা তাঁকে পানিতে ও গাছের তৈরী বাক্সে পেয়েছিল। কেননা কিবতী ভাষায় (مو) 'মূ' শব্দের অর্থ হল পানি আর (شا) 'শা' শব্দের অর্থ হল গাছ।[৩৪০] অপর বর্ণনামতে মূসা শব্দটি হীব্রু 'মূশা' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'নাজাত দানকারী'।

---

৩৩৭. মূল আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া***, অনু. মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১২।

৩৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৩৩৯. আল-কুরআন, ৭৯ : ২৪।

৩৪০. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, ***তারিখুত তাবারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৯০।

যেহেতু হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে ৪০০ বছরের গোলামী থেকে নাজাতের ব্যবস্থা করেছিলেন সেহেতু তাকে মূসা নামে নামকরণ করা হয়েছে।[৩৪১] হযরত মূসা (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর অষ্টম মতান্তরে সপ্তম অধ:স্তন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম ছিল ইমরান। মাতার নাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা সুহাইলী (র.) এর মতে তার মাতার নাম ছিল আয়ারখা মতান্তরে আয়ারখাত, আল্লামা ছা'লাবী (র.) বলেন তার নাম ছিল লাওহা বিনতে হানিদ।[৩৪২] আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন হযরত মূসা (আ.) এর মায়ের নাম হল ইউহানায।[৩৪৩] আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরণ করেন।

বনী ইসরাঈল হচ্ছে হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বংশধর। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ছোট পুত্রের নাম ছিল হযরত ইসহাক (আ.) আর হযরত ইসহাক (আ.) এর পুত্রের নাম ছিল হযরত ইয়াকুব (আ.) যার অপর নাম ইসরাঈল। সে হিসেবে হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বংশধরদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। হীব্রু ভাষায় ইসরাঈল অর্থ আল্লাহর দাস। পবিত্র কুরআনে তাদেরকে বনী ইসরাঈল বলে সম্বোধন করা হয়েছে যেন আল্লাহর দাস হওয়ার কথাটি বারবার স্মরণ আসে। বনী ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল কিনআনে যা বর্তমান ফিলিস্তিনের অন্তর্গত ছিল। তখনকার সময় সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন একত্রে শাম দেশ ছিল। বলা যায় যে প্রথম ও শেষ নবী ব্যতীত বাকী প্রায় সকল নবীর আবাসস্থলই ছিল ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চলে। হযরত ইয়াকুব (আ.) এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) কে যখন তার ভাইয়েরা খেলার কথা বলে পিতার নিকট থেকে নিয়ে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে কূপে ফেলে দিয়ে চলে যায় তখন একটি বানিজ্যিক কাফেলা পানির খোজে ঐ কূফের নিকট আসে। তারা যখন পানির জন্য কূপে বালতি ফেলে তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বালতিতে করে উপরে উঠে আসেন। বানিজ্যিক কাফেলা তাঁকে মিশরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তৎকালীন মিশরের মন্ত্রী আযীযে মেসের তাকে ক্রয় করে নিয়ে যান। মন্ত্রীর স্ত্রী যুলায়খা নিঃসন্তান হওয়ায় সে ইউসুফ (আ.) কে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন পালন করতে থাকে। এক পর্যায়ে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও সততার গুণে মিশরের অর্থমন্ত্রী এবং পরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে যখন সমগ্র আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন অন্যান্য অঞ্চলের মত কিনআনেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) এর আমন্ত্রনে হযরত ইয়াকুব (আ.) তার পুত্র ও পরিবারবর্গকে নিয়ে মিশরে হিজরত করেন। ইউসুফ (আ.) সহ তার সকল ছেলেরা মিশরেই বসবাস করতে থাকে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর জীবদ্দশায় তারা মিশরে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকে। সেখানে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিশরবাসীও তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখতে থাকে। বাইবেলের বর্ণনা মতে-হযরত ইউসুফ (আ.) বনী ইসরাঈলকে মিশরের জুশন/গুশন (Goshen) অঞ্চলে পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[৩৪৪] এভাবে কিনআনের অধিবাসী বনী ইসরাঈল মিশরে আগমন করে এবং হযরত ইউসুফ (আ.) এর মাধ্যমে মিশরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমান্বয়ে তারা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে। এটা ছিল হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের প্রায় দু হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) এর মিশরে আগমন করা থেকে শুরু করে হযরত মূসা (আ.) এর সাথে মিশর থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত বনী ইসরাঈল মিশরে প্রায় চারশত বছর

---

৩৪১. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৩২৩।

৩৪২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী, ***তাফসীরে কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ২৫০।

৩৪৩. আল্লামা বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৫২২।

৩৪৪. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৩১২ ও ৪২৬।

সময় স্থায়ী ছিল। এ সময় বনী ইসরাঈলীদের সংখ্যা দাড়িয়েছিল প্রায় ৩ মিলিয়ন।[৩৪৫] আর এ সময় তারা ছিল মিশরের মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ। তবে এগুলির অধিকাংশই ইসরাঈলীদের কাল্পনিক হিসাব যার মজবুত কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআন তাদের সংখ্যা বর্ণনায় বলেছে "নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষুদ্র একটি দল।"[৩৪৬]

যেহেতু বনী ইসরাইল ছিল কিনান থেকে মিশরে হিজরত করে আসা বহিরাগত মানুষ। আবার তারা কিছু দিন মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত ছিল। অপর দিকে ফিরআউন এবং তার বংশধর ছিল মিশরের আদি বাসিন্দা এবং সম্রাট বংশের লোক। তাই তাদের থেকে ছুটে যাওয়া রাষ্ট্রক্ষমতা বনী ইসরাঈলের হাতে যাওয়ায় তারা স্বাভাবিকভাবেই বনী ইসরাঈলের উপর ক্ষিপ্ত হতে থাকে। সুতরাং তারা যখন পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন তারা বনী ইসরাঈলের থেকে কড়ায় গণ্ডায় ক্ষমতা হারানোর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। তারা বনী ইসরাঈলকে হিংসা করতে থাকে। ক্রমেই তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে রূপ নেয়। ফিরআউন বনী ইসরাঈলকে দিয়ে কিবতীদের সেবার কাজ করাত। নাম মাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদেরকে দিয়ে সে সব কাজ করাত যে সব কাজ নিম্ন মানের এবং নীচু বলে ভাবা হত। এক কথায় ফিরআউন এবং তার অনুসারীরা বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে সর্বদিক থেকে অপমানিত ও অপদস্ত করত। তাদেরকে কোন প্রকার মান সম্মানই দিত না। প্রায় এক যুগেরও অধিক কাল ধরে বনী ইসরাঈল ফিরআউন এবং তার অনুসারী কিবতী বংশের লোকদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ধৈর্য সহকারে সত্য ধর্মের উপর অটল থাকে। তারা সর্বদা তওবা, ইস্তেগফার এবং আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে। বর্ণিত আছে, একদা ফিরআউন নীল নদের পাড়ে গিয়ে এক আনন্দ সভা করে। সভা শেষে নিজের সকল অনুসারী ও লস্কর নিয়ে এক বিলাস ভোজের আয়োজন করে। ভোজ শেষে সে একটি ঘোষণাবাণী প্রচার করে। তা হল, "হে আমার সম্প্রদায়! মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদীগুলো আমার প্রাসাদের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তোমরা কি তা দেখছ না? আর আমি এ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে অত্যন্ত হীন লোক এবং সুস্পষ্ট বর্ণনায় অক্ষম।"[৩৪৭] ফিরআউনের এ উক্তিটি ছিল তার দাম্ভিকতা এবং হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি তার তাচ্ছিল্যের বহিঃপ্রকাশ। ফিরআউনের সম্প্রদায় প্রবল দাম্ভিকতা সত্ত্বেও তার এ ঘোষণা মেনে নেয় যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এভাবে দেয়া হয়েছে, "অতঃপর সে তার কাওমকে প্রভাবিত করে ফেলল। ফলে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করল; নিঃসন্দেহে তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।"[৩৪৮]

---

৩৪৫. আহমদ আলী সাবিত আল-খতীব আল-বাগদাদী, ***তারীখুল আম্বিয়া,*** বৈরুত, লিবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, খ. ০১, পৃ. ১৪০।

৩৪৬. আল-কুরআন, ২৬ : ৫৪।

৩৪৭. আল-কুরআন, ৪৩ : ৫১-৫২।

৩৪৮. আল-কুরআন, ৪৩ : ৫৪।

৩য় পরিচ্ছেদ
ফিরআউনের খোদায়ী দাবী ও মূসা (আ.) এর দাওয়াত

ফিরআউন প্রায় সাড়ে চারশত বছর রাজত্ব করতে করতে তার মধ্যে চরম দাম্ভিকতা ও অহংকার চলে আসে। সে এক পর্যায়ে প্রভুত্ব দাবী করে বসে যা চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা ও সীমালঙ্ঘন।[৩৪৯] কেননা হাদীসে কুদসীতে এসেছে, "অহংকার আমার চাদর আর বড়ত্ব আমার লুঙ্গিস্বরূপ, সুতরাং যে এ দুটির কোন একটি নিয়ে টানাটানি করল তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব"।[৩৫০] হাদীসে আরো এসেছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে বিনয় নম্রতা প্রকাশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা উন্নীত করে দিবেন আর যে অহংকার করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্চিত করবেন"।[৩৫১] অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রায় চারশত বছর পর্যন্ত হায়াত দান করেন যাতে তার অবাধ্যতা আরও চরমে পৌঁছে এবং সে অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাকে ধ্বংস হতে হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হচ্ছে তিনি অবাধ্যদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন কিছুদিনের জন্য"।[৩৫২] অবকাশ পেয়ে যখন অবাধ্যাচরণকারীদের অবাধ্যতা আরও বেড়ে চরম আকার ধারণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন।

দীর্ঘ চারশত বছরে যখন ফিরআউনের পাপ আস্তে আস্তে ভারী হয়ে উঠল তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করলেন। তিনি নীল নদের পানি শুকিয়ে দিলেন। তখন ফিরআউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলল, আপনি যদি আমাদের রব হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করুন তবেই আমরা বুঝব এবং মেনে নেব যে, আপনি আমাদের সত্য সত্যই পালনকর্তা। ফিরআউন স্বীয় সম্প্রদায়ের এ দাবী শুনে দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সে রাতের বেলায় এক জঙ্গলে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাতে লাগল, হে আল্লাহ! আপনিই সত্য। আপনিই সৃষ্টিকূলের পালনকর্তা, আমার প্রভুত্বের দাবী ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। একমাত্র আপনিই আমার প্রভু। আমি খুব ভাল করেই জানি যে পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আমার আর কোন আবাসস্থল নেই; সুতরাং আমার পরকালতো শেষ, দুনিয়াতে আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না। আমি পরকালের পরিবর্তে দুনিয়া গ্রহণ করে নিয়েছি, আমাকে যা দেওয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। দয়া করে আপনি নীল নদে পানি পূর্ণ করে দিন।

ফিরআউনের প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই একজন আগন্তুক এসে ফিরআউনকে বলল মহারাজ! আমি আপনার নিকট এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছি। আপনি এর সুবিচার করে দিন। ফিরআউন এক প্রকার রাগের স্বরে বলল তুমি এখানে কোথা থেকে এসেছ? এটা কি অভিযোগ শোনা এবং বিচারের

---

৩৪৯. আল-কুরআন, ৭৯ : ২৪।

৩৫০. ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আল-আযদী আস-সিজিসতানী, ***সুনানু আবী দাউদ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৫৯।

৩৫১. আবু বকর ইবনে আবী শায়বাহ, ***মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ***, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ হি., খ. ০৭, পৃ. ২৩৭।

৩৫২. আল-কুরআন, ৮৬ : ১৭।

জায়গা নাকি? আগামীকাল আমার দরবারে এসো, আমি বিচার করে দিব। আগন্তুক বলল, আমার বিচার আপনাকে এখানেই করে দিতে হবে, না হয় আমি এখান থেকে এক কদমও নড়ব না। আগন্তুক এবং ফিরআউনের মাঝে কথা বার্তা চলছিল এরই মাঝে নীলনদ পানিতে কানায় কানায় ভরে গেল। ফিরআউন যখন দেখল নীলনদ পানিতে ভরে গেছে তখন সে খুশি হয়ে গেল এবং আগন্তুককে বলল, বল তোমার কী অভিযোগ? তখন আগন্তুক বলল, আমার অভিযোগ হল, যে গোলাম তার মনিবের অবাধ্য হয়, মনিবকে মনিব বলে স্বীকার করে না বরং সে নিজেকেই মনিব বলে দাবি করে সে গোলামের কী শাস্তি হতে পারে? তখন ফিরআউন বলল, এমন গোলামকে ঐ নীল নদের পানিতে ডুবিয়ে মারা উচিৎ। আগন্তুক বলল, মহারাজ! আপনি অত্যন্ত চমৎকার রায় প্রদান করেছেন। দয়া করে এ রায়খানা আমাকে একটি কাগজে লিখে স্বাক্ষর করে দিন। ফিরআউন অত্যন্ত খোশ মেজাজে তা লিখে স্বাক্ষর করে দিল। আগন্তুক কাগজখানা নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এ আগন্তুক ছিলেন হযরত জিবরাইল (আ.)।

হযরত মূসা (আ.) যখন স্ত্রী সহ মাদইয়ান থেকে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন আর পথে তাদের আগুনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন হযরত মূসা (আ.) দেখলেন তাদের অদূরেই তূর পর্বতের দিকে এক খণ্ড আগুন দেখা যাচ্ছে। তিনি সেখানে গেলে আগুন পাবেন মনে করে তার স্ত্রীকে সেখানে রেখে আগুনের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "তিনি যখন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ করলেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন তখন তিনি তূর পর্বতের দিকে এক প্রকার আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিবারকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এক প্রকার আগুন দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন সংবাদ অথবা আগুনের কয়লা নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুনের উত্তাপ গ্রহণ করতে পার।"[৩৫৩] হযরত মূসা (আ.) যখন আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি দেখলেন আগুন নিচে নয়; বরং তা গাছের উপরে এবং এক ডাল থেকে অপর ডালে স্থানান্তরিত হচ্ছে। তা দেখে তিনি আবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এতো কোন সাধারণ অগ্নি নয়। এতে তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। এমন সময় ধ্বনিত হতে লাগল, "হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক"।[৩৫৪] আরও ধ্বনিত হল, "হে মূসা! আমি তোমার পালনকর্তা, তুমি তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল; নিশ্চয় তুমি এক পবিত্র ময়দান তুওয়ায় রয়েছ।"[৩৫৫]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে নবুয়ত দিয়ে ধন্য করলেন। যেমন কুরআনের বাণী, "আর আমি আপনাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা কিছু অবতীর্ণ হচ্ছে আপনি তা শুনে নিন। নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আপনি আল্লাহর ইবাদাত করুন এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করুন।[৩৫৬] আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে নবুয়ত ও রিসালাত প্রদানের উদ্দেশ্য হল ফিরআউনের নিকট আল্লাহর দাওয়াত দিয়ে পাঠানো। তার নিকট হিদায়াতের দাওয়াত নিয়ে গেলে সে দাওয়াতকে অস্বীকার করবে এবং তার সত্যতার পক্ষে প্রমাণ চাইবে এটা আল্লাহ

---

৩৫৩. আল-কুরআন, ২৮ : ২৯।
৩৫৪. আল-কুরআন, ২৮ : ৩০।
৩৫৫. আল-কুরআন, ২০ : ১১।
৩৫৬. আল-কুরআন, ২০ : ১৩-১৪।

তা'আলা ভাল করেই জানেন। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে মুজিযা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "হে মূসা! তোমার হাতে ওটা কি? হযরত মূসা (আ.) বললেন এটা আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর করি এবং এর দ্বারা আমার ছাগলের জন্য পাতা পাড়ি। এর দ্বারা আমার আরও অনেক কাজ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন হে মূসা! তুমি তা ছেড়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তা ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ ইহা সাপে পরিণত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা বলেন তুমি ইহা ধর, ভীত হইওনা; আমি ইহাকে পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দেব"। [৩৫৭]

"আর আপনি আপনার হাত বোগলের নিচে রাখুন দেখবেন উহা কোন রোগ ব্যতীত শুভ্র ও প্রদীপ্ত হয়ে প্রকাশ পাবে এবং ভয় দূরীকরণার্থে আপনার হাত পুনরায় বগলের নীচে রাখুন দেখবেন আগের মত হয়ে যাবে। এ দুটি আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রমাণস্বরূপ, ফিরআউন এবং তার নেতৃবৃন্দের নিকট যাওয়ার জন্য; কেননা তারা অত্যন্ত পাপাচারী সম্প্রদায়।"[৩৫৮] আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে এ দুটি মু'জিযা দিয়ে ফিরআউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আহবান করেছিলেন এবং বলেছিলেন তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। অতঃপর বল তোমার পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে কি? আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব যাতে তুমি তাকে ভয় কর।"[৩৫৯]

তিনি আরও বলেন "হে মূসা! তুমি ফিরআউনের নিকট যাও কেননা সে অবাধ্য হয়েছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে প্রভু! আপনি আমার বক্ষকে খুলে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার যবানের জড়তা দূর করে দিন যেন মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে আর আমার জন্য আমার পরিবার হতে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন। আমার ভাই হারূনকে দিয়ে আমার শক্তি দৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কাজে সহযোগী নিযুক্ত করুন"।[৩৬০] হযরত মূসা (আ.) আরও বলেন "হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম, অতএব আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। আমার ভাই হারূন আমার থেকেও অধিক স্পষ্টভাষী এবং বাকপটু; সুতরাং তাকে আমার সাথে আমার সাহায্যকারীরূপে নবুয়ত প্রদান করুন তিনি আমার সত্যতা প্রতিপাদন করবেন। আমার আশংকা হচ্ছে যে তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি অচিরেই আপনার ভাইকে দিয়ে আপনার বাহুকে শক্তিশালী করে দিচ্ছি এবং আপনাদের উভয়কে এক বিশেষ শক্তি দান করছি। সুতরাং তারা আপনাদের নিকট পৌঁছতেও পারবে না। আমার মু'জিযাসমূহ দ্বারা আপনারা উভয়ে এবং আপনাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবেন"।[৩৬১]

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে প্রদত্ত ওয়াদা মোতাবেক হযরত হারূন (আ.) কে নবুয়ত প্রদান করলেন। এ দিকে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথোপকথন শেষে মিশরে গিয়ে হযরত হারূন (আ.) এর সাথে মিলিত হন। অতঃপর উভয়ে আলাপ আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অর্পিত

---

৩৫৭. আল-কুরআন, ২০ : ১৭-২১।
৩৫৮. আল-কুরআন, ২০ : ২২; ২৮ : ৩২।
৩৫৯. আল-কুরআন, ৭৯ : ১৬-২০।
৩৬০. আল-কুরআন, ২০ : ২৪-৩২।
৩৬১. আল-কুরআন, ২৮ : ৩৩-৩৫।

দায়িত্ব পালন তথা ফিরআউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারূন (আ.) একদিন ফিরআউনের রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে বের হন। রাজপ্রাসাদে পৌঁছে তারা ফিরআউনকে বললেন, আমরা মহান স্রষ্টা এক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আমরা এক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনার জন্য তোমাকে দাওয়াত দিতে এসেছি। সুতরাং তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং বনী ইসরাঈলের উপর সকল প্রকার অত্যাচার ও জুলুম করা থেকে বিরত থাক আর বনী ইসরাঈলকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে এমন এক স্থানে নিয়ে যাব যাতে তারা নির্বিঘ্নে এক আল্লাহর ইবদাত করতে পারে। এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাতের কোন ভিত্তি নেই। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আর মূসা (আ.) বললেন হে ফিরআউন! আমি সমগ্র জগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। অসত্য কোন কিছু আল্লাহর উপর আরোপ না করাই আমার জন্য শোভনীয়। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক বিরাট প্রমাণও এনেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে প্রেরণ কর।"[৩৬২]

ফিরআউন হযরত মূসা (আ.) কে তার ব্যক্তিত্বের উপর আক্রমন করে তাকে দুর্বল করতে চাইল। সে বলল, "আমরা কি তোমাকে শৈশবে পালন করিনি? তোমার জীবনের বহু বছর তুমি আমাদের মাঝে অবস্থান করেছ এবং তুমি সে কাজও করেছিলে যা তুমি করেছিলে। আর তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত।"[৩৬৩] ফিরআউন তার উক্তিতে 'সে কাজ' বলে হযরত মূসা (আ.) যে একজন কিবতীকে হত্যা করেছিলেন তার দিকে ইঙ্গিত করেছে। হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি তার জবাবে বলেন আমার ঘুষিতে যে কিবতী নিহত হয়েছে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না; বরং আমি তাকে কেবল বনী ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বারণ করার জন্যই ঘুষি দিয়েছিলাম। সে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিহত হয়েছে। কেননা যদি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমি মারতাম তাহলে আমি ধারালো অস্ত্র সাথে নিয়ে আসতাম এবং সে ধারালো অস্ত্র দিয়েই তাকে মারতাম। তুমি তদন্ত ব্যতিরেকেই আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে দিয়েছ তাই আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
ফিরআউনের অবাধ্যতা ও মূসা (আ.) এর মু'জিযাসমূহ

হযরত মূসা (আ.) এবং হারূন (আ.) ফিরআউনকে আল্লাহর একত্ববাদ এবং ইবাদাতের দিকে আহবান জানালেন। ফিরআউন হযরত মূসা (আ.) কে বলল, হে মূসা! তুমি কী বলছ? আমি ব্যতীত আর কোন সত্ত্বা আছে কি যাকে তুমি বিশ্ব প্রতিপালক বলে আখ্যায়িত করছ? মূসা (আ.) জবাবে বললেন হ্যাঁ "তিনি আসমানসমূহ, যমীনসমূহ এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর পালনকর্তা।"[৩৬৪] এতে ফিরআউন

---

৩৬২. আল-কুরআন, ৭ : ১০৪-১০৫।
৩৬৩. আল-কুরআন, ২৬ : ১৮-১৯।
৩৬৪. আল-কুরআন, ২৬ : ২৪।

হযরত মূসা (আ.) এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে হুমকি ধমকি দিয়ে দুর্বল করতে চাইল। সে বলল, হে মূসা! "তুমি যদি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর তবে তোমাকে আমি কারগারে নিক্ষেপ করব।"[৩৬৫] ফিরআউনের ভীতি প্রদর্শনের প্রতিউত্তরে হযরত মূসা (আ.) বলেন, আমি যদি আমার দাবীর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমান উপস্থাপন করতে পারি তাহলেও কি তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবে? ফিরআউন বলল, হে মূসা! তুমি যে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে মনোনীত রাসূল দাবী করছ তুমি কি তোমার সে দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে? যেমন কুরআনের ভাষ্য, "মূসা (আ.) বললেন আমি যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারি তবুও কি তুমি ঈমান আনবে না? ফিরআউন বলল ঠিক আছে, তাহলে তুমি সে প্রমান উপস্থাপন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।"[৩৬৬]

হযরত মূসা (আ.) এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। তিনি তার হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। উহা একটি বিশাল অজগর সাপের রূপ ধারণ করে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা মোতাবেক সাপটি হা করে ফিরআউনের দিকে যেতে লাগল। তখন ফিরআউন ভয় পেয়ে সিংহাসন ছেড়ে পালাতে লাগল এমনকি সে ভয়ে কাপড় চোপড় পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলল। নিরুপায় হয়ে সে হযরত মূসা (আ.) এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল, হযরত মূসা (আ.) আবার সাপটির গায়ে ধরলেন। অতঃপর উহা লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তার দ্বিতীয় মুজিযা দেখালেন। তিনি তার হাত বোগলের নীচে কিছুক্ষণ রেখে তা বের করে আনেন, এখন তা সূর্যের আলোর ন্যায় ঝলমল করতে লাগল। তিনি পুনরায় হাত বোগলের নীচে রাখলে হাত পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল। হযরত মূসা (আ.) এর মুজিযা দেখে মানুষ হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি অকৃষ্ট হতে লাগল। এতে ফিরআউনের সভাসদবর্গ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তারা চিন্তা করতে লাগল কিভাবে মানুষকে মূসা (আ.) থেকে দূরে সরানো যায় এবং তাকে পরাস্ত করা যায়। অতঃপর তারা ফন্দি আঁটল এবং বলতে লাগল, "নিশ্চয়ই এ লোকটি এক সুদক্ষ যাদুকর। সে চায় তোমাদেরকে তোমাদের ভুমি থেকে বের করে দিতে। অতএব এ ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ কী?"[৩৬৭] এ বলে সভাসদরা সাধারণ জনগণের নিকট পরামর্শ চাইল। জনতা সভাসদবর্গের সাথে একমত পোষণ করে পরামর্শ দিল যে, যাদুর মুকাবিলা যাদু দ্বারাই হতে পারে; সুতরাং দেশ থেকে দক্ষ যাদুকরদেরকে বাছাই করে মূসার সাথে মুকাবিলা করা হোক। তাদের এ বিষয়টাকে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেন "অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে সত্য পৌঁছল তখন তারা বলতে লাগল নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।"[৩৬৮]

সাধারণ জনগণের পরামর্শ সভাসদবর্গের খুবই পছন্দ হল। তারা ফিরআউনকে সাধারণ জনগণের পরামর্শ জানিয়ে দিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার পরামর্শ দিল। ফিরআউন সভাসদদের পরামর্শ মোতাবেক হযরত মূসা (আ.) কে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করল। "সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে তোমার যাদুক্রিয়া দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিবে?

---

৩৬৫. আল-কুরআন, ২৬ : ২৯।
৩৬৬. আল-কুরআন, ২৬ : ৩০-৩১।
৩৬৭. আল-কুরআন, ৭ : ১০৯-১১০।
৩৬৮. আল-কুরআন, ১০ : ৬১।

অতএব আমরাও তোমার যাদুর অনুরূপ যাদু আনব। তাই আমাদের ও তোমার মাঝে কোন এক সমতল মাঠে সমবেত হওয়ার জন্য একটা তারিখ নির্ধারণ কর যাতে আমরা একত্র হতে পারি যার ব্যতিক্রম তুমিও করবে না এবং আমরাও করব না। মূসা (আ.) বললেন তোমার প্রতিশ্রুত দিন হল ঐ দিন যে দিন মেলা হয় এবং লোকজন পূর্বাহ্নেই একত্র হয়।"[৩৬৯] যাই হোক, হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তাদের মাঝে মুকাবিলার জন্য একটি নির্দষ্ট তারিখ স্থির করলেন। এ দিকে ফিরআউনের সভাসদবর্গ মূসা (আ.) এর মুকাবিলার জন্য শহরের সকল বড় বড় যাদুকরকে একত্র করল। মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। মাঠের এক পাশে ফিরআউন এবং তার সভাসদবর্গের জন্য সু উচ্চ স্থানে শিবির স্থাপিত হল। ফিরআউনের যাদুকররা তার নিকট আবেদন করল যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য কী পুরস্কার রয়েছে? কুরআনের ভাষায় তাদের আবেদন হচ্ছে, "যদি আমরা বিজয়ী হই তবে কি আমরা বড় ধরনের কোন পুরস্কার লাভ করব?"[৩৭০] ফিরআউন তাদেরকে জবাবে অত্যন্ত উৎসাহিত করল। সে বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা বড় ধরণের পুরস্কার পাবে এবং তোমরা আমার নিকটতম লোকদের মধ্যে পরিগণিত হবে।"[৩৭১]

অতঃপর নির্দিষ্ট তারিখে হযরত মূসা (আ.) এর সাথে যাদুকরদের মুকাবিলার বিষয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হল। যেমন পবিত্র কুরআনের ভাষ্য, قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى - قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى - فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى - قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى - وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى অর্থাৎ যাদুকররা হযরত মূসা (আ.) কে বলল, "হে মূসা! আপনি প্রথম নিক্ষেপ করবেন নাকি আমরা প্রথম নিক্ষেপকারী হব। হযরত মূসা (আ.) বললেন, বরং তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর ফলে মূসা (আ.) এর খেয়ালে এমন হচ্ছিল যে মনে হচ্ছে যেন সেগুলো সাপের ন্যায় দৌড়াচ্ছে। ফলে মূসা (আ.) এর অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হল। আমি বললাম, আপনি ভয় করবেন না, নিশ্চয়ই আপনি বিজয়ী হবেন আর আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন। তারা যা কিছু তৈরি করেছে এটা সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু তৈরি করেছে তা যাদুকরের ভেল্কিবাজি মাত্র। আর যাদুকর যেখানেই যাক না কেন সে সফল হয় না।"[৩৭২] অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তার হাতের লাঠিটি ছেড়ে দিলেন। তা এক বিশাল অজগর সাপে রূপ নিল। উহা হা করে এক লোকমায় যাদুকরদের বানানো সকল কিছু গ্রাস করে ফেলল। এর পর ফিরআউনের দিকে হা করে উঠল। ফিরআউন তাতে বিচলিত হয়ে গেল।

এ অবস্থা দেখে যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল এবং বলল, আমরা মূসা ও হারূন (আ.) এর পালনকর্তার উপর ঈমান আনলাম। তারা বুঝতে পারল যে, এটা কোন যাদু নয়। ঐশ্বরিক কোন শক্তি ছাড়া এরূপ আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ড কেউ দেখাতে পারে না। এ অবস্থা দেখে ফিরআউন যাদুকরদের উপর অত্যন্ত

---

৩৬৯. আল-কুরআন, ২০ : ৫৮-৫৯।
৩৭০. আল-কুরআন, ৭ : ১১৩।
৩৭১. আল-কুরআন, ৭ : ১১৪।
৩৭২. আল-কুরআন, ২০ : ৬৫-৬৯।

ক্ষেপে গেল এবং তাদেরকে হুমকি ধমকি দিতে লাগল। কুরআনের ভাষায়, قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى। অর্থাৎ ফিরআউন বলল আমার অনুমতি দানের পূর্বেই কি তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? নিশ্চয় সে তোমাদের নেতা, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিব এবং তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের মূলে শূলিতে চড়াব আর তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব অধিক কঠোর এবং স্থায়ী।

ফিরআউন যতই হুমকি ধমকি দিক না কেন ইসলাম ও ঈমান এমন এক শক্তি যখন তা কোন আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন সে সমগ্র পৃথিবীর মুকাবিলা করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে যে যাদুকররা এক ঘন্টা পূর্বেও ফিরআউনের পক্ষে মুকাবিলা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে সে যাদুকররা এক ঘন্টা পরে ইসলামের কালিমা পড়ার কারণে তাদের মধ্যে এমন এক প্রবল শক্তি ও সাহস সৃষ্টি হয়েছে যে তারা ফিরআউনের হুমকি ধমকির জবাবে বলছে, لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমাদের নিকট যে সুস্পষ্ট প্রমান এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রধান্য দিব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমিতো শুধু এ দুনিয়াতেই যা করার করতে পারবে।[৩৭৩]

ফিরআউনের ক্রোধ কেবল যাদুকরদেরকে হুমকি ধমকি দিয়েই অনেকটা শেষ হয়ে গেল। সে মূসা (আ.) এর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলল না। তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলল, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল, তাহলে কি তুমি মূসা এবং তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে যে, তারা তুমি ও তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে?[৩৭৪] কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এর এ অলৌকিক মুজিযা দেখে ফিরআউন ভিতরে ভিতরে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল তাই মূসা (আ.) সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা না বলে সে জবাব দিল, قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ অর্থাৎ সে বলল, আমরা অচিরেই তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং কন্যাদেরকে জীবিত রাখব আর আমরা তাদের উপর ক্ষমতাবান।[৩৭৫] অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) এর মু'জিযা দেখে ফিরআউনের মনে কঠিন ভীতির সঞ্চার হল। তাই সে হযরত মূসা (আ.) এর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা না বলে বনী ইসরাঈলীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলল। সে বলল, বনী ইসরাঈলীদের যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাদের প্রত্যেককে আমরা হত্যা করে ফেলব এবং যত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাদেরকে আমরা জীবিত রাখব। এভাবে চলতে থাকলে একপর্যায়ে তারা পুরুষ শূন্য হয়ে পড়বে, থাকবে শুধু নারী আর নারী। ফলে তাদের আর কোন ক্ষমতা

---

৩৭৩. আল-কুরআন, ২০ : ৭০-৭২।
৩৭৪. আল-কুরআন, ৭ : ১২৭।
৩৭৫. আল-কুরআন, ৭ : ১২৭।

থাকবে না। তখন তাদের নারীরা আজীবন আমাদের সেবা দাসী হয়ে থাকবে। আমরা তাদের উপর যা ইচ্ছা তা করতে পারব। অর্থাৎ মূসা (আ.) তার প্রধান শত্রু হলেও মনের ভীতির কারণে সে মূসা (আ.) কে বাদ দিয়ে এভাবেই তার প্রতিকার ব্যবস্থা স্থির করল। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, ফিরআউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ.) কে দেখত, তখন অবচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত।[৩৭৬]

মূসা (আ.) এর মু'জিযার কারণে ফিরআউনের মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলেও সে তার খোদায়ী দাবী থেকে সরে আসেনি। যাদুকরদের ঈমান আনয়ন করা এবং ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা দেখেও সে বিন্দু মাত্র বিগলিত হয়নি; বরং সে তার অবাধ্যতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى- فَكَذَّبَ وَعَصَى- ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى- فَحَشَرَ فَنَادَى- فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى- অর্থাৎ অতঃপর মূসা (আ.) তাকে মহা নিদর্শন দেখাল। আর সে (ফেরআউন) মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় পালনকর্তা। [৩৭৭]

ঐতিহাসিক বর্ণনা মোতাবেক উপরোক্ত ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) মিশরে প্রায় বিশ বছর অবস্থান করে সেখানকার মানুষদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। আর এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে মোট নয়টি মু'জিযা তথা নিদর্শন দান করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ফিরআউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্যের পথে নিয়ে আসা। নিম্নে এ নয়টি মুজিযা তথা নিদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল।

১. **লাঠিঃ** হাতের লাঠি ছেড়ে দিলে তা বিশাল অজগর সাপে পরিনত হওয়া ।

২. **হাতের শুভ্রতাঃ** বোগলের নিচ থেকে হাত বের করে নিয়ে আসলে হাত কিরণময় হওয়া।

এ দুটি মু'জিযার আলোচনা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এ দুটি মু'জিযা ফিরআউনের দরবারে তখন প্রকাশ পেয়েছিল যখন সে মূসা (আ.) এর নিকট তার নবুয়তের স্বপক্ষে প্রমাণ চেয়েছিল। আল-কুরআনের বাণী, – فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ অর্থাৎ তিনি তার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন অতঃপর উহা এক বিশাল অজগর সাপে রূপ নিল। আর তিনি তার হাত বোগলের নিচ থেকে বের করলেন অতঃপর উহা দর্শকদের জন্য শুভ্র আকার ধারণ করল।[৩৭৮]

৩. **দুর্ভিক্ষঃ** ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায় যখন অবাধ্যাচরণ এবং তাদের হঠকারিতা বাড়িয়ে দিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিলেন। তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার ফল-ফলাদি চরম ভাবে হ্রাস পেল। গরু ছাগলের বাঁটে দুধের বিলুপ্তি ঘটল। তারা নিরুপায় হয়ে হযরত মূসা (আ.) কে বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট

---

৩৭৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।

৩৭৭. আল-কুরআন, ৭৯ : ২০-২৪।

৩৭৮. আল-কুরআন, ৭ : ১০৭-১০৮।

দু'আ করুন। মূসা (আ.) দু'আ করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু তারা পুনরায় তাদের আবাধ্যাচারণে মেতে উঠল। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ - فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ তারপর আমি ফিরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে পাকড়াও করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর যখন (দুর্ভিক্ষ উঠে গিয়ে) তাদের নিকট কল্যাণ আসল তখন তারা বলল যে, এটাই আমাদের প্রাপ্য। আর যখন তাদের নিকট কোন অকল্যাণ পৌঁছে তখন তারা উহাকে মূসা (আ.) এবং তার অনুসারীদের কুলক্ষণ বলে অভিহিত করে থাকে। সাবধান! জেনে রেখ, তাদের কুলক্ষণ আল্লাহর নিকট থেকেই আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[৩৭৯]

৪. **তুফান:** দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর তারা যখন পুনরায় তাদের অবাধ্যাচরণে মেতে উঠল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আবার তুফান অবতীর্ণ করলেন। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে তুফান মানে জলোচ্ছাস। এ তুফানে ফিরআউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত জমি জমা ও ঘর বাড়ি পানিতে ডুবে গিয়ে তাদের সমস্ত ফসলাদি ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এতে বনী ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা ছিল শুষ্ক। তাতে তুফানের কোন ছোঁয়াই লাগেনি। এ জলোচ্ছাসে ভীত হয়ে ফিরআউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.) এর নিকট আবেদন করল যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের এ আযাব দূরীভূত হওয়ার জন্য দু'আ করুন, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দিব। হযরত মূসা (আ.) দু'আ করলেন। তাদের থেকে জলোচ্ছাস চলে গেল। তাদের ফসলাদিতে বরকত দেখা দিল। অতঃপর তারা বলতে লাগল এই তুফান বা জলোচ্ছাস কোন আযাব ছিল না বরং এটা আমাদের কল্যাণের জন্যই এসেছে যার কারণে আমাদের ফসলাদিতে বরকত দেখা দিয়েছে। এতে মূসা (আ.) এর কোন দখলই ছিল না। এসব কথা বলে তারা হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি ঈমান আনা থেকে মুখ পিরিয়ে নিল এবং প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রায় একমাস পর্যন্ত সুখে শান্তিতে থাকার সুযোগ দিলেন।

৫. **পঙ্গপাল:** এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পঙ্গপাল চাপিয়ে দিলেন। এ পঙ্গপাল তাদের শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলাদি সব খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। এমনকি কাঠের দরজা জানালা ও ঘরের সকল আসবাব পত্র পর্যন্ত খেয়ে শেষ করে ফেলল। এ আযাব শুধুমাত্র কিবতী তথা ফিরআউনের সম্প্রদায়ের ক্ষেত খামারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বনী ইসরাঈলের লোকদের ক্ষেত খামার উহা থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত যা হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের লোকদের সঠিক পথের উপর থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তখন তারা হযরত মূসা (আ.) এর নিকট এসে বলল যে, আপনি আপনার রবের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের থেকে এ আযাব সরিয়ে নেন এবার আমরা পাক্কা ওয়াদা করছি যে, আমরা ঈমান আনব

---

৩৭৯. আল-কুরআন, ৭ : ১৩০-১৩১।

এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিব। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের আযাব তুলে নিলেন। আযাব চলে যাওয়ার পর তারা দেখল যে তাদের যে পরিমাণ খাবার মজুদ আছে তা দিয়ে তাদের আরো প্রায় এক বছর চলবে। ফলে তারা আবার ওয়াদা ভঙ্গ করে বসল এবং ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এক মাসের অবকাশ দিলেন যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৬. **উকুন:** দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাওয়ার পরও যখন তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হল না। যখন তারা পরম সত্যের পথে এগিয়ে আসল না তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পুনরায় উকুনের আযাব চাপিয়ে দিলেন। উকুন বলতে সাধারণত ঐসব পোকাকে বুঝায় যা চুলের মধ্যে জন্মে থাকে। আবার সেসব পোকাও হতে পারে যা ফসলের মধ্যে জন্মে ফসলকে খেয়ে ফেলে। যেমন কেরী ও ঘুণ পোকা। এখানে উভয় ধরণের পোকাই উদ্দেশ্য হতে পারে। তাদের খাদ্যশস্যে এই পরিমাণ পোকা হয়েছিল যে, দশ সের গম ভাঙ্গালে তিন সের আটাও হত না। আবার তাদের শরীরে এই পরিমাণ উকুন হয়েছিল যে উহা তাদের চুল এবং ভ্রু পর্যন্ত খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। এ অবস্থা দেখে ফিরআউনের সম্প্রদায় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) এর নিকট এসে বলল, আমরা এবার আর ওয়াদা ভঙ্গ করব না। আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন। হযরত মূসা (আ.) দু'আ করলেন। তাদের আযাব চলে গেল। কিন্তু হতভাগারা আবারও ওয়াদা ভঙ্গ করল। তারা হকের দাওয়াত থেকে বিমুখ হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় এক মাসের অবকাশ দিলেন। তারা যথেষ্ট আরাম আয়েশে দিনাতিপাত করতেছিল।

৭. **ব্যাঙ :** কিছু দিন যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পুনরায় ব্যাঙ চাপিয়ে দিলেন। এত বেশী ব্যাঙের জন্ম হল যে সারা দেশ ব্যাঙে ভরে গেল। তারা কোথায়ও বসতে পারত না। যেখানেই বসত সেখানেই ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে এসে এমনভাবে স্তুপ হয়ে যেত যে, তাদের গলা পর্যন্ত ব্যাঙের নিচে ডুবে যেত। তারা যখন শয়ন করত তখন ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে তাদের উপর এমনভাবে স্তুপ হয়ে যেত যে, তারা ব্যাঙের নীচে ডুবে যেত। রান্নার হাঁড়ি পাতিল এবং চাউল ও গমের মটকা ব্যাঙে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। তারা খেতে বসলে ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে এসে তাদের প্লেট বর্তন ইত্যাদি ভরে যেত। অথচ তাদের সামনে বনী ইসরাইলের লোকেরা খাচ্ছে তাতে কোন ব্যাঙ নেই। এ অবস্থা দেখে তারা অসহ্য হয়ে বিলাপ করতে করতে মূসা (আ.) এর নিকট আসল এবং পূর্বের চেয়েও আরও পাকাপাকি ওয়াদা করল। হযরত মূসা (আ.) এবারও তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ব্যাঙের আযাবও তুলে নিলেন। কিন্তু যে জাতির ধ্বংস অনিবার্য সে জাতির জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা কখনও কাজ করে না। সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও তাদের অন্ধত্বের পর্দা দূরীভূত হয় না। ফলে তারা আবারও ওয়াদা ভঙ্গ করল এবং তারা বলতে লাগল যে, এ সব যাদুর কীর্তি। এ বার আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যে, মূসা (আ.) এক মহাযাদুকর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এভাবে কিছুদিন সুখে শান্তিতে থাকার সুযোগ দিলেন আর তারা আনন্দে বসবাস করতেছিল।

৮. **রক্ত :** এভাবে প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হল। কিন্তু তারা সে সুযোগ কোন কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রক্তের আযাব চাপিয়ে দিলেন। তাদের সমস্ত খাবার ও পানীয় রক্তে পরিণত হয়ে যেত। কূপ কিংবা হাউয থেকে পানি নিয়ে আসলে তা রক্তে পরিণত হয়ে যেত। এমনকি একই দস্তরখানে খেতে বসলে দেখা যেত যে লোকমাটি কিবতীরা তুলত সেটা রক্ত হয়ে যেত আর যে লোকমাটি বনী ইসরাঈলের লোকেরা তুলত সেটা স্বাভাবিক খাবারই থাকত। একই পাত্রে মূখ দিয়ে পানি পান করলে যেদিক দিয়ে কিবতী মুখ দিত সে দিক দিয়ে রক্ত হয়ে যেত আর যে দিক দিয়ে বনী ইসরাঈলী মুখ দিত সেদিক দিয়ে পানি স্বাভাবিক থাকত। এ অবস্থা সাত দিন পর্যন্ত চলতে থাকল। কিবতীরা এ অবস্থা দেখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) এর নিকট ফরিয়াদ জানাল যে, আপনি আমাদের আযাব মুক্তির জন্য দু'আ করুন। এ বলে তারা অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল যে তারা ঈমান আনবে। মূসা (আ.) দু'আ করলেন। আযাব চলে গেল। তারা পূনরায় ওয়াদা ভঙ্গ করল এবং অহংকার করল। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল ওয়াদাভঙ্গে ও অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) এর এ পাঁচটি মু'জিযা ও ফিরআউনের সম্প্রদায়ের উপর আযাবের বর্ণনা এভাবেই দেয়া হয়েছে, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ অর্থাৎ আর আমি তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত প্রভৃতি বিস্তারিত নিদর্শন পাঠিয়েছি, অতঃপর তারা অহঙ্কার করল এবং তারা ছিল অপরাধ প্রবণ জাতি।[৩৮০]

৯. **মহামারী:** এর কিছু দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর رجز তথা প্লেগ নামক মহামারী চাপিয়ে দেন। এখানে رجز দ্বারা বসন্ত রোগও উদ্দেশ্য হতে পারে। সাইদ ইবনে জুবাইর বলেন, رجز মানে তাদের মধ্যে এমন একটি মহামারী হয়েছিল যাতে এক দিনে তাদের প্রায় সত্তর হাজার লোক মারা যায়।[৩৮১] তখন তারা পুনরায় মূসা (আ.) এর মাধ্যমে দু'আ করালে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে মহামারী তুলে নেন। কিন্তু তারা যথারীতি তাদের সে ওয়াদাও ভঙ্গ করে। তবে কোন কোন মুফাসসির এখানে رجز দ্বারা নতুন কোন মহামারী না বুঝিয়ে পূর্বোক্ত আযাবসমূহ বুঝিয়েছেন।

মোটকথা ক্রমাগত অবকাশদানের পরও বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে তাদের উপর চলে আসে সর্বশেষ আযাব। আর তা হল পানিতে ডুবে সমূলে ধ্বংস হওয়া। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ - فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ অর্থাৎ আর যখনই তাদের উপর কোন আযাব

---

৩৮০. আল-কুরআন, ৭ : ১৩৩।

৩৮১. আল্লামা কুরতুবী (র.), তাফসীরে কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ২৭১; আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.), তাফসীরে কাবীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩৪৭।

এসে পড়ত তখনি তারা বলত, হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট দু'আ কর যা তিনি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও তাহলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দিব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল তখন তারা খুব তাড়াহুড়া করে ওয়াদা ভঙ্গ করত। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তারা ছিল অমনোযোগী।[৩৮২] এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় হযরত মূসা (আ.) এর মু'জিযা দেখানোর ঘটনা এবং ফিরআউনের নাফরমানী ও তাকে পাকড়াও করার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى অর্থাৎ সে বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় পালনকর্তা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকাল ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন।[৩৮৩] আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হল তিনি সকল গুনাহ ক্ষমা করলেও তার সাথে কেউ শরীক করলে তা ক্ষমা করেন না। তাই তিনি ফিরআউনকে তার প্রভুত্ব নিয়ে টানাটানি করার মজা উপভোগ করানোর ইচ্ছা করলেন। ফলে তাকে তার দল-বল সহ পানিতে ডুবিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন।

৫ম পরিচ্ছেদ
ফিরআউন ও তার গোষ্ঠীর ধ্বংস হওয়ার কাহিনী

ফিরআউন যখন কিছুতেই মূসা (আ.) এর দাওয়াতে বিগলিত হল না এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিতে রাজি হল না; বরং তাদের উপর গোলামীর জিঞ্জির আরও পাকাপোক্ত করতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে নির্দেশ দিলেন তুমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে তাদের বাপ দাদার দেশ ফিলিস্তিনে চলে যাও। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর হতে ফিলিস্তিনের (কেনানের) উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলেন। মিশর হতে ফিলিস্তিন যাওয়ার পথ দুটি। একটি হল সরাসরি স্থলভাগের উপর দিয়ে, এটি হল সহজ ও নিকটবর্তী পথ। অপরটি হল লোহিত সাগর অতিক্রম করে তীহ ময়দানের উপর দিয়ে, আর এটি ছিল দূরবর্তী পথ। আল্লাহ তা'আলার হেকমতের চাহিদা হল স্থলভাগের উপর দিয়ে সহজ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপর দিয়ে দূরবর্তী পথে যাওয়া। কেননা স্থলভাগের উপর দিয়ে গেলে বনী ইসরাঈলের সাথে ফিরআউনের দলবলের সরাসরি যুদ্ধ বেধে যাবে আর বনী ইসরাঈল তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে না। কেননা দীর্ঘ দিন গোলামী করতে করতে তাদের মনোবল একদম শূন্যের কোটায় চলে এসেছে। তারা ফিরআউনের দলবলের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করতে রাজি হবে না। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হল তিনি ফিরআউনকে দলবল নিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারবেন তাই তিনি মূসা (আ.) কে লোহিত সাগরের উপর দিয়েই যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

---

৩৮২. আল-কুরআন, ৭ : ১৩৫-১৩৬।

৩৮৩. আল-কুরআন, ৭৯ : ২০-২৫।

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিকালে লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। এ যাত্রাকালে এমন সতর্কতা অবলম্ব করলেন যে, বনী ইসরাঈলীরা কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিবতী রমণীদের নিকট থেকে যে অলঙ্কারাদি ধার নিয়েছিল সে অলঙ্কারাদি ফেরত দেয়ার সুযোগও তারা পায়নি, যাতে ফিরআউনের লোকেরা তাদের মিশর ত্যাগের বিষয়টি জেনে না যায়; তথাপিও ফিরআউনের গুপ্তচররা বিষয়টি জেনে গেল এবং ফিরআউনকে তৎক্ষনাৎ সে সংবাদ জানিয়ে দিল। ফিরআউন তখনই এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল এবং ভোর হওয়ার আগেই তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। বনী ইসরাঈলীরা যখন দেখতে পেল যে ফিরআউন তার দল-বলসহ তাদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন তারা ঘাবড়ে গেল। অথচ তখন তাদের সংখ্যা ছিল শিশু ব্যতীত প্রায় ৬ লক্ষ।[৩৮৪] তারা মূসা (আ.) কে বলতে লাগল, মিশরে কি কবরের জায়গা ছিল না যে তুমি আমাদেরকে মরবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছ? আমাদেরতো এ ময়দানে মরার চেয়ে মিশরীয়দের খেদমত করে খাওয়াই ভাল ছিল।

হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জবাব দিয়ে বললেন, কখনও নয়, অবশ্যই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।[৩৮৫] অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে বললেন তুমি তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সাগরের পানির উপর আঘাত কর। মূসা (আ.) তার হাতের লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করলেন এতে বারটি রাস্তা তৈরি হয়ে গেল; পানি দ্বিখন্ডিত হয়ে পাহাড়ের মত দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহর হুকুমে তাৎক্ষণিকভাবে মাঝখানের মাটি শুকিয়ে গেল। ফলে পানির মাঝখানে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে রাস্তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.) এর নেতৃত্বে তাতে নেমে পড়ল। স্থলভাগের শুকনো স্বাভাবিক রাস্তার মতই তারা অনায়াসে উহা দিয়ে পার হয়ে গেল।

ইহা দেখে ফিরআউন তার বাহিনীকে বলল, ইহা আমারই মহিমা যে তোমরা বনী ইসরাঈলকে ধরে ফেলতে পারবে। সুতরাং তোমরা আমার সাথে নেমে পড়। ফিরআউন ও তার বাহিনী সমুদ্রে নেমে পড়ল। বনী ইসরাঈল যখন সমুদ্র পার হয়ে তীরে উঠল ততক্ষণে ফিরআউন এবং তার গোষ্ঠী সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছল। আল্লাহ তা'আলা পানিকে হুকুম করে দিলেন তুমি আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাও। পানি স্বাভাবিক হয়ে মিশে গেল। ফিরআউন এবং তার গোষ্ঠী সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে গেল। ফিরআউন সমুদ্রের তলদেশ থেকে পানির উপরিভাগে ভেসে আসল এবং বলতে লাগল আমি সেই খোদার উপর ঈমান আনলাম যার উপর বনী ঈসরাঈল ঈমান এনেছে। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে তার মুখের মধ্যে কাদা নিক্ষেপ করে দিলেন যেন সে ঐ খোদার নাম উচ্ছারণ করতে না পারে যে খোদার বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তার এ শাস্তি শুরু হয়েছে। কারণ সে এরকম বহুবার ঈমান আনার ওয়াদা করেছে এবং তা ভঙ্গ করেছে। তার ঈমান আনার বিষয়টি ছিল নীচক ধোকা মাত্র। এ সময় জিবরাঈল (আ.) তাকে ঐ কাগজটি দেখালেন, যে কাগজটিতে সে জঙ্গলে জিবরাঈল (আ.) এর বিচারের রায়টি লিখে দিয়েছিল। জিবরাঈল (আ.) বলেছিলেন এই বিচারটি ছিল মূলত তোমার। কেননা তুমি তোমার প্রভুকে মনিব না মেনে বরং নিজেকেই মনিব দাবী করেছিলে। তাই তোমার দেয়া রায়

---

৩৮৪. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনু. মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১০৭।
৩৮৫. আল-কুরআন, ২৬ : ৬২।

অনুপাতে আজ তুমি তোমার অপরাধের শাস্তি ভোগ কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ ফিরআউন বলল, আমি ঈমান আনলাম, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই যার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (তাকে বলা হল) তুমি এখন ইহা বলতেছ, অথচ ইতিপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছিলে। প্রকৃতপক্ষে তুমি ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৩৮৬]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন এবং তার গোষ্ঠীকে সমূলে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। এ ঘটনাকে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে দিলেন যাতে পরবর্তী জাতিসমূহ এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আর তার অংশ হিসেবে ফিরআউনের লাশকে কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত করে রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ অর্থাৎ আজ আমি তোমার মরদেহকে রক্ষা করব যেন তা তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ হয়, আর অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শন থেকে অমনোযোগী।[৩৮৭]

ফিরআউন এবং তার গোষ্ঠী কোন্ নদী/সাগরে ডুবে ধ্বংস হয় এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে উহা ছিল লোহিত সাগর।[৩৮৮] রূহুল মাআনীতে উল্লেখ আছে, কারো মতে উহা ছিল লোহিত সাগর, যার দুই তীরের দূরত্ব ছিল চার ফারসাখ। আবার কেউ কেউ বলেন উহা ছিল নীল নদ। কেননা আরবরা মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানির জলাশয়ে যখন পানি বেশী হয় তখন উহাকে সমুদ্র বলে।[৩৮৯]

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
তাদের ঘটনায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার গোলামী করার জন্য। মানুষ মানুষের গোলামী করবে এ জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেননি। মানুষের মনিব হওয়ার কোন যোগ্যতা নেই। তাই কোন মানুষ যখন মনিব হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, নিজেকে খোদার আসনে আসীন করার চেষ্টা করবে তখন তার ধ্বংস সুনিশ্চিত। যেমন ফিরআউন নিজেকে খোদা দাবি করেছিল এবং সে তার গোষ্ঠীসহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

২. আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। এ সময়ের মধ্যে তাদেরকে প্রথমে আসমানী বিভিন্ন আযাব ও নিদর্শন দিয়ে সতর্ক করতে থাকেন।

---

৩৮৬. আল-কুরআন, ১০ : ৯১।

৩৮৭. আল-কুরআন, ১০ : ৯২।

৩৮৮. আল্লামা কুরতুবী (র.), *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৯০ ; আল্লামা বাগাভী (র.), তাফসীরে বাগাভী, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ. ১১৬; মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯।

৩৮৯. আল্লামা আলূসী (র.), *তাফসীরে রূহুল মাআনী*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫৬।

এরপরও তারা সংশোধিত না হলে চূড়ান্ত আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কারী ফিরআউন এবং তার অন্ধ অনুসারীদেরকে একে একে নয়টি নিদর্শন দিয়ে সতর্ক করার পরও যখন তারা ঔদ্ধত্যপনা থেকে ফিরে আসেনি তখন তিনি তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

৩. শাসনক্ষমতা চিরদিন টিকে থাকে না। তাই দুনিয়ালোভী শাসকগোষ্ঠী দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাদের পরকালকে যেমন বিনষ্ট করে দেয় তেমনি দুনিয়াতেও তারা এক সময় শাসন ক্ষমতা হারিয়ে ধ্বংসে পর্যবষিত হয়। তারা শুধু নিজেরাই ধ্বংস হয় না; বরং পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন ফিরআউন জেনে শুনে পরকালকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়ার বাদশাহী চেয়েছিল। এতে তার পরকাল যেমন বিনষ্ট হয়েছে পাশাপাশি সে দুনিয়াতেও টিকে থাকতে পারেনি; বরং তার বাহিনীসহ সমূলে ধ্বংস হয়েছে।

৪. মানুষের ক্ষমতা যেখানে শেষ আল্লাহর সাহায্য সেখানে আরম্ভ হয়। তাই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে বান্দা তার চেষ্টার শেষপ্রান্তে উপণীত হতে হবে। যেমন হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে উপনীত হন আর তার অনুসারীরা নিরাশ হয়ে বলতে লাগল আমাদের এখন কী উপায় হবে? আমরাতো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরাশায়ী হয়ে যাব তখন মূসা (আ.) বললেন কখনও নয়, নিশ্চয় আমার রব আমার সাথে আছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে যায়, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মূসা (আ.) এর লাঠির আঘাতে সমুদ্রের মাঝখানে রাস্তার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

৫. দ্বীনের সংস্কারকগণ তাদের জাতির নিকট থেকে লাঞ্চনা ও বঞ্চনা ভোগ করে থাকেন। দুনিয়ায় তাদের নিঃসার্থ সহযোগীর সংখ্যা নিতান্তই কম হয়ে থাকে। তাঁরা কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তার রহমতকে পাথেয় করেই দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন। যেমন হযরত মূসা (আ.) এর প্রকৃত সহযোগী ছিল তাঁর বড় ভাই হযরত হারূন (আ.) এবং তার ভাগ্নে হযরত ইউশা (আ.)। এছাড়া অধিকাংশই ছিল তাকে কষ্ট প্রদানকারী। যেমন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে লক্ষ করে বলেছিলেন, "তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল"।[৩৯০]

৬. অহংকার পতনের মূল। অহংকারীর শেষ পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইবলীস শয়তান অহংকার করে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়েছে।[৩৯১] ফিরআউনও অহংকার করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে ধ্বংস হয়েছে।[৩৯২] তাই অহংকার থেকে দূরে থাকা এবং বিণয় নম্রতা অবলম্বন করা প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য।

৭. শিক্ষা মানবজাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই একমাত্র আলো যা মানবজাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে। বিশেষত ঐশ্বরিক ও নৈতিক শিক্ষা। এ জন্য আল-কুরআনের সর্বপ্রথম বাণী ছিল اقرأ (পড়) ।

---

৩৯০. আল-কুরআন, ৬১ : ০৫।

৩৯১. আল-কুরআন, ২ : ৩৪।

৩৯২. আল-কুরআন, ২৮ : ৩৯-৪০।

তাই যুগে যুগে যারা শয়তানের দোসর ও ফিরআউনের প্রেতাত্মা তারা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের নামে তাতে অনৈতিক ও নাস্তিক্যবাদী বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে জাতিকে মুর্খ ও নাস্তিক বানানোর অপচেষ্টা করবে। এমনকি ইসলামি শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার জন্যও বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র করবে। যেমন ফিরআউন হামানের পরামর্শে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই এ ষড়যন্ত্র মুকাবিলায় জাতিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

৮. অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিরা যখন সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে যায় তখন তারা অতীত জীবনের কথা মনে রাখে না। তারা অত্যাচারী ও হিংস্র হয়ে উঠে। তাদের নিষ্ঠুরতা চরম আকার ধারণ করে। যেমন ঋণে জর্জরিত অসহায় ফিরআউন যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন সে বনী ঈসরাঈলের উপর নানারূপ অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে দেয়। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখে। তাই যে কোন মানুষ সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান হওয়ার পর তার অতীত জীবনের কথা মনে রাখা উচিৎ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উল্লিখিত অপরাধসমূহ থেকে উত্তরণের উপায় ও সুপারিশমালা

উপরোল্লিখিত ৬টি জাতি প্রধানত যে সকল অপরাধের কারণে ধ্বংস হয়েছে সেগুলো হল কুফর, শিরক তথা মূর্তিপূজা, জুলুম তথা অত্যাচার, অহংকার, সমকামিতা, নবী-রাসূলগণের উপর অত্যাচার, নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার, শিশু হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, ওজনে কম দেয়া ও আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করা ইত্যাদি। আল্লাহর নাফরমানী ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। এ প্রভাব রোধ করতে হলে যথাযথ নীতিমালার অনুসরণ ও নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ব্যতীত সম্ভব নয়। যেহেতু নৈতিক চরিত্র গঠন হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাই শিক্ষা যদি হয় আদর্শ ভিত্তিক, তাহলে সে শিক্ষা জাতির নৈতিক চরিত্রকে সুন্দর করতে সক্ষম হবে। নৈতিক শিক্ষা, তার প্রশিক্ষণ ও যথাযথ অনুশীলন দ্বারা একজন মানুষ তার চারিত্রিক কলুষতা দূর করতে পারে, আত্মশুদ্ধি করতে পারে ও পার্থিব লোভ-লালসাসহ জাগতিক মোহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে তার মাঝে নাফরমানী ও নৈতিক অবক্ষয়ের কালো অধ্যায়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। তাই অবক্ষয়মুক্ত জাতি গঠনে অহী ভিত্তিক শিক্ষা ও তার প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে তাওহীদি চেতনা জাগ্রত করতে হবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে অপরাধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে পরকালীন ভীতি সৃষ্টি, অর্থের প্রতি লোভ হ্রাস, নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন অনুশীলনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে সকল প্রকার ইসলাম ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে একটি অপরাধমুক্ত ও কল্যাণমুখী জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। পবিত্র কুরআনের সূরা হুদের আলোকে কিভাবে মানবজাতিকে সফল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়; কিভাবে তাদেরকে আসমানী আযাব ও গযব থেকে রক্ষা করা যায় এবং একটি অপরাধমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ জনপদ গড়ে তোলা যায় সেজন্য সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন, পাপ ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতকরণ, ইসলামী অনুশাসনমূলক কর্মসূচী পালন, চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধিকরণ ও পরকালীন জবাবদিহিতায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হল।

১ম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন

ইসলামের অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিজগতের যোগসূত্র স্থাপন করা, বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও অনন্যতার প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে মানবাত্মার মাঝে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, শুধু তাই নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় মনে আল্লাহর ভয় ও তার স্মরণকে সর্বদা জাগ্রত ও সক্রিয় করে রাখা যেন প্রতিটি মানুষ তার বাস্তব জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার প্রেরণা পায় এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকতে পারে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা ও মানবজাতির মাঝে আন্তরিক বন্ধন ও সম্পর্ক তৈরি করাই হল ইসলামের মূল লক্ষ্য, যা মানুষকে আসমানী গযব থেকে পরিত্রান দিতে পারে। নিম্নে আল্লাহ তা'আলার সাথে মানবজাতির গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপায় পেশ করা হল।

১. সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভঃ

মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সবচেয়ে জরূরী বিষয় হল আল্লাহ তা'আলার পরিচয় অর্জন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় না জানলে ও তাকে ভালভাবে না চিনলে তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ। অর্থাৎ আমি মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আল্লামা ইবনে জুরাইজ (র.) এই আয়াতের إِلَّا لِيَعْبُدُونِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, إِلَّا لِيَعْرِفُونِ অর্থাৎ আমাকে চেনার জন্য সৃষ্টি করেছি।[৩৯৩] এ থেকে বুঝা গেল মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করা। আর পরিচয় লাভের মাধ্যমেই যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পথ সুগম হয়। তাছাড়া যে কোন জিনিষের গুরুত্ব তখনই বুঝে আসে যখন তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকে। যেমন একজন মানুষ যদি জাতিসাপ না চিনে, উহার দংশনের ভয়াবহতা সম্পর্কে পূর্ব থেকে না জানে তবে সে জাতিসাপ থেকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করবে না। এমনিভাবে বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার বিষয়টি যদি কারো জানা না থাকে তবে সে বৈদ্যুতিক তার থেকে সতর্ক থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। এভাবে প্রত্যেক জিনিষের গুরুত্ব এবং উহা থেকে উপকার হাসিল ও ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি উহার সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখার উপরই নির্ভর করে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যদি পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তার দয়া-ক্রোধ ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা না থাকে তবে আল্লাহ তা'আলার সাথে কারো সুসম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় অর্জন করতে হবে। তার সত্তা, গুণাবলী ও অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। তবেই তার সাথে আল্লাহ তা'আলার গভীর যোগসূত্র ও সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর বান্দা যখন সৃষ্টিকর্তার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে তখন সে দুনিয়াতে আযাব ও গযবে নিপতিত হবে না এবং পরকালেও তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে না। কেননা প্রবাদ আছে مَنْ لَهُ الْمَوْلى فَلَهُ الْكُلُّ অর্থাৎ আল্লাহ যার হয়ে যায় তার সবকিছু হয়ে যায়।

২. খাঁটি ঈমান ও একনিষ্ঠতা অর্জনঃ

ঈমানের আভিধানিক অর্থ হল আন্তরিক বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, তাঁর অস্তিত্বের উপর একান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। মহানবী (স.) আল্লাহ্‌র নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এর বিশদ বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আন্তরিক বিশ্বাস করার নাম হল ঈমান। বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জানবে তখনই আল্লাহর প্রতি বান্দার ঈমান পোক্ত হবে এবং সে একনিষ্ঠভাবে আল্লহকে বিশ্বাস করবে। মানব হৃদয়ে সর্বপ্রথম তার অস্তিত্বের ধারণার সৃষ্টি হয়, ফলে সে তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় খোঁজে। এ জন্য তাতে নির্ভেজাল ঈমান প্রবেশ করে এবং হৃদয়ে তা উজ্জ্বল জ্যোতিরূপে অংকুরিত হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তা শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব ছড়িয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে ওঠে যা হৃদয়কে সর্ব প্রকার অন্যায় আসক্তি থেকে বিরত রেখে নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত করে। এ ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা বা বাহ্যিক ঈমান যথেষ্ট নয়; বরং ঈমানকে অন্তরে প্রোথিত করতে তাকে

---

৩৯৩. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাছীর, ***তাফসীরে ইবনে কাছীর***, প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ৪২৫।

ইখলাসের রূপে রূপায়িত করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ অর্থাৎ বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান আনয়ন করনি; বরং তোমরা বল আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি।[৩৯৪] প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল ঈমানের ছোঁয়ায় ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের জীবনে প্রস্ফুটিত হয় এক নৈতিক মানদণ্ড যা সর্বপ্রকার অনৈতিকতা ও অবক্ষয়কে বিনাশ করে। এ নির্ভেজাল ঈমান ও ইখলাস মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাশীল ও অনুগত বানায় এবং নিবৃত রাখে শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ থেকে। মূলত দুনিয়ায় যত পাপ, জুলুম, শোষণ, নৈতিকতাবিচ্যুতি ও পদস্খলনমূলক অপরাধ সংঘটিত হয় তার সবই শয়তানের প্ররোচনা ও শয়তানের আনুগত্যের পরিণতি। তাই বান্দা শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ পরিহার করে এক আল্লাহর উপর খাঁটিভাবে ঈমান আনতে হবে এবং একনিষ্ঠতার সাথে তার প্রদত্ত ইসলামে প্রবিষ্ট হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৩৯৫] রাসূল (স.) বলেন, عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال قلت يارسول الله قل لى فى الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم- অর্থাৎ হযরত সুফিয়ান ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ সাক্বাফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। তিনি আমাকে বললেন, 'বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার ওপর অটল অবিচল হয়ে থাক'।[৩৯৬] রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন, عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا- অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে (নিজের) রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (স.) কে রাসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট রয়েছে সে-ই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে।[৩৯৭]

মুমিন ব্যক্তি তার সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করবে। কোন পার্থিব লাভ অথবা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য কোন কার্য সম্পাদন করবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন, আমার নামায, আমার ইবাদাত/কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের প্রভু এবং যার কোন শরীক নেই। আমাকে এই

---

৩৯৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৪।
৩৯৫. আল-কুরআন, ২ : ২০৮।
৩৯৬. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৪৮।
৩৯৭. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১., পৃ. ৬২, হাদীস নং ৫৬।

হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সামনে সর্বপ্রথম মস্তক অবনতকারী-আত্মসমর্পণকারী।[৩৯৮] মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين অর্থাৎ তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান সন্ততি ও অন্য সব লোকের তুলনায় অধিক প্রিয় হব।[৩৯৯] সুতরাং বান্দার সকল আমল, ভালবাসা, শত্রুতাপোষণ ইত্যাদি সকল কিছুই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে। রাসূল (স.) আরও ইরশাদ করেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان- অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য (মানুষকে) ভালবাসল এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা পোষণ করল, আল্লাহ্‌র জন্য (তাদেরকে) দান করল এবং আল্লাহ্‌র জন্য (তাদেরকে) দান করা থেকে বিরত থাকল সে নিশ্চিত তার ঈমানকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে।[৪০০]

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি মুখাপেক্ষী নন; বরং বান্দা তার প্রতি মুখাপেক্ষী। তথাপিও বান্দা যখন তার সকল কর্মকাণ্ডে মুখলিস হয়, নিজের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবান করে দিতে সদা প্রস্তুত থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি খুশী হন। তার সেই সন্তুষ্টির বিষয়টি তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিক্রি করে দেয়; আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।[৪০১] খাঁটি ঈমান ও ইখলাস অর্জনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং বান্দার সাথে আল্লাহর যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। ফলে সে দুনিয়ায় যেমন সফলতা অর্জন করতে পারে তেমনি পরকালেও মহা শাস্তি থেকে পরিত্রান পেতে পারে। এছাড়া ঈমানকে একনিষ্ঠ করতে পারলে অল্প আমল দ্বারাও বান্দা পরকালে নাজাত লাভ করবে।[৪০২]

৩. তাওহীদি চেতনা ধারণঃ

তাওহীদ মানে একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এক বলে জানা ও এক বলে স্বীকার করা; এক আল্লাহর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ স্বীকৃতি প্রদান। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; সত্তাগত দিক থেকে তিনি যেমন এক ও অদ্বিতীয়, অনুরূপভাবে গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি লা শারীক; ইবাদাত বান্দেগীর ব্যাপারেও তার কোন শরীক নেই। তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ

---

৩৯৮. আল-কুরআন, ০৬ : ১৬২-১৬৩

৩৯৯. ইমাম বুখারী (র.), ***বুখারী শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১২, হাদীস নং. ১৫; ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৬৭, হাদীস নং ৭০; আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, ***সুনানুন নাসাঈ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ১১৪, হাদীস নং ৫০১৩।

৪০০. ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আল-আযদী আস-সিজিস্তানী, ***সুনানু আবি দাউদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২২০, হাদীস নং ৪৬৮১।

৪০১. আল-কুরআন, ২ : ২০৭।

৪০২. আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (র.), ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি., ১৯৯০ খৃ., খ. ০৪, পৃ. ৩৪১।

অবিভাজ্য ও অখণ্ডনীয়। তার গুণরাজি সম্পূর্ণ পূত পবিত্র এবং শুধুমাত্র তার জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি এক ও অনন্য।[৪০৩]

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রধানত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত এ তিনটি মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে তাওহীদ হল আল-কুরআনের ইলমসমূহের এক তৃতীয়াংশ। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বহু জায়গায় তাওহীদের বর্ণনা করেছেন। বিশেষত পবিত্র কুরআনের সূরাতুল ইখলাসে শুধুমাত্র তাওহীদের বর্ণনা-ই প্রদান করা হয়েছে যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মৌলিক তিনটি ইলমের একটি। এ কারণে হাদীসে সূরাতুল ইখলাসকে পবিত্র কুরআনের একতৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - অর্থাৎ বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।[৪০৪] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ অর্থাৎ তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।[৪০৫] এছাড়া স্বাভাবিকভাবেও ইলাহ একজন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা ইলাহ যদি দুই বা ততোধিক হত তাহলে প্রত্যেক খোদা একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার প্রতিযোগিতা করত ফলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত এবং একাধিক খোদার দ্বন্দ্বে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন একটি বাস একজন চালকই ড্রাইভিং করে, যদি একসাথে দুইজন চালক ড্রাইভিং করতে যায় তবে নির্ঘাত দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا অর্থাৎ আসমান এবং যমীনের মধ্যে যদি একাধিক ইলাহ থাকত তবে এতদুভয়ের মধ্যে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেত।[৪০৬]

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যে সকল নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের প্রধান দাওয়াত-ই ছিল তাওহীদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত। যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হয় তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয় এবং পরকালে নাজাত প্রাপ্ত হয়। অপর দিকে যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী না হয়ে শিরকে লিপ্ত হয় তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে আরো দূরে সরে যায়। তারা ইহকালে বিপদগ্রস্ত ও ধ্বংসে পর্যবসিত হয় এবং পরকালেও জাহান্নামী হয়। তাই বান্দাকে অন্তরে তাওহীদি চেতনা ধারণ করে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হতে হবে। তাওহীদি পতাকার ধারক বাহক হয়ে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তবেই বান্দা ইহকাল এবং পরকালীন আযাব ও গযব থেকে পরিত্রান পাবে।

---

৪০৩. অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, ***কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন,*** ঢাকা ১১০০: ভূঁইয়া প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ ২০০৫ খৃ., খ. ০১, পৃ. ১২; লেখক মণ্ডলী, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, একাদশ সংস্করণ জুন ২০১৩ খৃ., পৃ. ৪৪; **কামূস *আরবী-বাংলা অভিধান,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৬৭৬; আবু তাহের মেসবাহ, ***আল মানার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

৪০৪. আল-কুরআন, ১১২ : ১-৪।

৪০৫. আল-কুরআন, ২ : ১৫৫, ১৬৩, ২৫৮ এছাড়া এ বিষয়ে আরো আছে আল-কুরআন ২১:১০৮; ৫:৭৩; ৬:১৯; ১৬:২২,৫১ ইত্যাদি।

৪০৬. আল-কুরআন, ২১ : ২২।

৪. সালাতসমূহের সংরক্ষণঃ

আল্লাহ তা'আলার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হল সালাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেননা সালাত হল মূলত আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন কথোপকথন। যেমন রাসূল (স.) বলেন, " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ". قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي هَذَا لِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} يَقُولُ اللَّهُ: فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، يَقُولُ: فَهَذِهِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এবং আমার বান্দার মাঝে সালাতকে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, উহার অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকী অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে সে তা পাবে। অতএব বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আবার বান্দা যখন বলে الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে। বান্দা যখন বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ বলেন, এ আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দার মাঝে সমানভাবে বিভক্ত। বান্দা যখন اهْدِنَا الصِّرَاطَ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বলে তখন আল্লাহ বলেন, এ আয়াতটি আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চায়।[৪০৭] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.) কে তার সান্নিধ্যে মিরাজে ডেকে নিয়েছিলেন; কিন্তু উম্মতের জন্য কোন মিরাজের ব্যবস্থা নেই। তাই তিনি উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায উপহার দিয়েছেন যেন বান্দা নামাযে ন্যূনতম হলেও মিরাজের মজা অনুভব করতে পারে। তাই বলা হয়েছে, الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ। অর্থাৎ সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ।[৪০৮] এছাড়াও সকল ইবাদাত দ্বারাই আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন রাসূল (স.) বলেন, قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান কী? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, ইহসান হল তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেছ। আর যদি তুমি দেখতে না পাও তবে এমন ভাবে

---

[৪০৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ***জুযউল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম***, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮০ খৃ., ১৪০০ হি., পৃ. ০৪, হা. নং ১২; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৯৬।

[৪০৮]. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.), ***তাফসীরে কাবীর***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২২৬।

ইবাদাত করবে যেন তিনি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।[৪০৯] তবে নামায যেহেতু উম্মুল ইবাদাত তাই আল্লাহর সাথে বান্দার যোগসূত্র সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে নামাযের ভুমিকা সবচেয়ে বেশী।

৫. সর্বদা আল্লাহর স্মরণ :

আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম একটি মাধ্যম হল সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বান্দাকে অধিক পরিমাণে তার যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর।[৪১০] বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে তবে আল্লাহ তা'আলাও বান্দাকে স্মরণ করেন, যেমন কুরআনের বানী فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্মরণ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।[৪১১] হাদীসে কুদসীতে মহানবী (স.) বলেন, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " অর্থাৎ রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলতেছেন, আমার বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তার নিকট তেমন। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি আমাকে মমে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, আর সে যদি আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে আমি তাকে তার চেয়ে আরও উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিকত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, আর সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে দ্রুত (দৌড়ে) এগিয়ে যাই।[৪১২] শুধু তাই নয় আল্লাহ তা'আলা এটাও বলে দিয়েছেন وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ অর্থাৎ (তোমরা যে আল্লাহকে স্মরণ কর তার থেকে) আল্লাহর স্মরণটাই সবচেয়ে বড়।[৪১৩] সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়।

৬. তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠনঃ

তাক্বওয়া আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল, বাঁচা, মুক্তি বা নিষ্কৃতি, আত্মরক্ষা করা, সাবধানতা অবলম্বন করা, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, বিরত থাকা, পরহেয করা, আত্মশুদ্ধি এবং কণ্টকময় পথে

---

৪০৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, ***সহীহ আল-বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ১১৫, হাদীস নং ৪৭৭৭।

৪১০. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪১-৪২।

৪১১. আল-কুরআন, ২ : ১৫২।

৪১২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, ***সহীহ বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৯, পৃ. ১২১, হাদীস নং ৭৪০৫; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২০৬১।

৪১৩. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫।

অত্যন্ত সতর্কভাবে চলা যেন একটি কাঁটাও শরীরে না বিঁধে। শরীয়তের পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার নাম তাকওয়া। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকে তাকে মুত্তাকী বলা হয়। সৎ গুণাবলীর মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবীরা গুণাহ, অশ্লীল কাজ কর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।[৪১৪] ইসলামের অন্যতম মৌলিক উপাদান হল তাকওয়া যা নৈতিক অবক্ষয় রোধে স্বয়ংক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাকওয়া উঁচু পর্যায়ের ইবাদাত এবং উত্তম সম্পদ বিশেষ। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সম্পদ ও সম্মানের এটাই কোষাগার। উভয় দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও মঙ্গল যদি কোন উপায়ে হাসিল করা সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব।[৪১৫] মূলত: তাকওয়া মানব চরিত্রের এক অমূল্য সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া।[৪১৬] তাকওয়া মু'মিন জীবনের একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভয়-ভীতি, অনুরাগ ও ভালবাসার কারণে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ করা এবং পরকালীন জিন্দেগীর মুক্তি ও সাফল্য নির্ভর করে এ তাকওয়ার উপর। তাই যে সমাজে এই তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে সে সমাজে কোন প্রকার চারিত্রিক বিচ্যুত অপরাধ সংঘটিত হয় না।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় ঈমানদারগণকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে, সে আগামী দিনের জন্যে কী পাথেয় ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর।[৪১৭] আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মূল্য একমাত্র তাকওয়ারই। ধনবল, জনবল, বংশ মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদির কোন দাম আল্লাহ তা'আলার নিকট নেই। তাই তিনি ঘোষণা করেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** অর্থাৎ হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন তোমরা পরস্পর পরিচয় দিতে পার (এগুলো কোন সম্মানের বিষয় নয়)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও সবকিছুর খবর রাখেন।[৪১৮]

---

৪১৪. ***কামূস আরবী-বাংলা অভিধান***, প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৬১৫; লেখক মণ্ডলী/সম্পাদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন, একাদশ সংস্করণ জুন ২০১৩, শাবান ১৪৩৪ হি., পৃ.৬৯৫।

৪১৫. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.), ***মিনহাজুল আবেদীন,*** অনু. মাওলানা মুজীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ জুন ১৯৯৪, পৃ. ৮১।

৪১৬. লেখক মন্ডলী, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫।

৪১৭. আল-কুরআন, ৫৯ : ১৮; এছাড়াও এ সম্পর্কে আরো আছে আল-কুরআন ৩:৭৬, ১০২; ৮:২৯; ৯:১১৯; ১৬:১২৮; ২৪:৫২; ৩৩:৭০; ৬৫:২।

৪১৮. আল-কুরআন ৪৯:১৩।

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، التَّقْوَى هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ. অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে একটি হাদীসে উল্লেখ করতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ, আকৃতি ও বেশভুশার দিকে লক্ষ্য করেন না, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে। এরপর 'তাকওয়া এখানে' বলে তিনি তার বক্ষ মোবারকের দিকে ইশারা করেছেন।[৪১৯] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলার নিকট মূল্যায়নের মানদণ্ড হল তাকওয়া। রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন, عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ – অর্থাৎ হযরত আতিয়া আস সা'দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যেসব কাজে গুনাহ নেই (তবে তাতে লিপ্ত হলে গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে) সেসব কাজ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণিভুক্ত হতে পারবে না।[৪২০] মোটকথা তাকওয়া হচ্ছে এমন একটি মৌলিক উপাদান ও মূল্যবান পাথেয় যার মাধ্যমে বান্দার অন্তরের পরিশুদ্ধি ঘটে এবং প্রতিপালকের সাথে তার সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হয়। একে পাথেয় করে সে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড সঠিক ও নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে পারে। তার সকল কাজে এটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এটি তাকে সকল ধরণের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে দুনিয়াতে তার সফলতার পথ সুগম হয় এবং পরকালেও তার জন্য রয়েছে মহা সুসংবাদ। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ – لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে সুসংবাদ এবং পরকালেও।[৪২১]

২য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন

১. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব :

শিক্ষার অর্থ হল জানা, বুঝা, শেখা ইত্যাদি। যা জানা নেই অথচ জানা দরকার, তা জানা, বুঝা, শেখাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। কারণ শিক্ষা মানুষের হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ভাল-

---

৪১৯. আবু বকর অহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী আল-বায়হাকী (র.), *আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী*, জিদ্দা: মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ১ম সংস্করণ ১৪১৩ হি., ১৯৯৩ খৃ., খ. ০২, পৃ. ৪২৫; ইমাম ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৩৮৮, হাদীস নং ৪১৪৩। ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস নং ২৫৬৪।

৪২০. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৬৩৪, হাদীস নং ২৪৫১; ইমাম ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৪০৯, হাদীস নং ৪২১৫।

৪২১. আল-কুরআন, ১০ : ৬৩-৬৪।

মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-অসত্যের পার্থক্য করতে শেখে। এছাড়াও ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা অর্জন অপরিহার্য। মানবিক গুণাবলী বিকাশে ও কর্ম জীবনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার গুরুত্ব কেবল মানুষের জন্য প্রযোজ্য; মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন নেই। জীবজন্তু অন্ধকারেও দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ আলো ছাড়া অন্ধকারে দেখতে পায় না। মানুষ শিক্ষার আলো ছাড়া ভ্রষ্টতার অন্ধকারে হিদায়াতের পথ প্রাপ্ত হয় না। তাই যারা অশিক্ষিত তারা অসভ্য, বর্বর, পথভ্রষ্ট ও পশুত্বের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে, মানবীয় গুণাবলী তাদের মধ্যে থাকে অনুপস্থিত। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ অর্থাৎ বল, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি কখনও সমান হতে পারে? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।[৪২২] অর্থাৎ শিক্ষিত আর অশিক্ষিত লোকেরা কখনও সমান নয়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ অর্থাৎ হে রাসূল! (স.) আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনও সমান হতে পারে? অথবা, আলো ও অন্ধকার কি কখনও সমান হতে পারে?[৪৪] অর্থাৎ শিক্ষিত লোক হল চক্ষুষ্মান আর অশিক্ষিত লোক হল অন্ধের মত। শিক্ষিত লোকের মধ্যে রয়েছে আলো আর অশিক্ষিত লোক গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই তারা উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না; বরং শিক্ষিতরা মূর্খদের থেকে বহুগুণে উত্তম। কেননা ইলম হচ্ছে মর্যাদার মানদণ্ড। তাই ইলম অর্জনকারীগণ সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান (ইল্‌ম) দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।[৪২৩]

মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব জন্তুর জীবন যেহেতু দৈহিক ও জৈবিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই তাদের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানব জাতি জৈবিক ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গঠিত বিধায় নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আধুনিক জড়বাদী শিক্ষা ও আধুনিক সভ্যতা মানবতা বিধ্বংসী সভ্যতা নামে আখ্যায়িত হয়েছে; অবিরাম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অপরদিকে ইসলামী শিক্ষায় নৈতিকতার অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। একটি জন্তুর ভাল-মন্দের কোন জ্ঞান নেই। তাকে এর পরওয়া করে চলতে হয় না। কিন্তু একজন মানুষকে অবশ্যই নৈতিকতার পরিচয় দিতে হয়। মানব জীবনে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা, ইহকালের দায়িত্ব-কর্তব্য ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি অর্জন করার লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাধারণভাবে মানবিক দৃষ্টিতে এবং বিশেষ করে ইসলামী দৃষ্টিতে শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভার স্ফূরণ ও ক্রমবিকাশ এবং সূক্ষ্ম মানবীয় ভাবধারা ও আবেগ-উচ্ছাসের পরিচ্ছন্নতা বিধানের একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা ব্যবস্থা। মানুষ তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও স্বভাবগত শক্তি প্রতিভার দিক থেকে নিতান্ত পাশবিকতার পর্যায়ে অবস্থান করে। শিক্ষা ছাড়া মানুষ পাশবিকতার দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারে না। তাই

---

৪২২. আল-কুরআন, ৩৯ : ৯।

৪২৩. আল-কুরআন, ৫৮ : ১১।

মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জীবনযাত্রার কলা-কৌশল ও নৈপূণ্যের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারে জীবনের মিশন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে। জাতি হিসেবে ভবিষ্যতের জন্যে নিদর্শনরূপে রেখে যেতে পারে সংস্কৃতি ও বুদ্ধি বৃত্তিক ঐতিহ্য। বিশেষকরে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য হল, ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার মাধ্যমে অনাগত বংশধরদেরকে মানসিক, শারীরিক এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ দেয়া। যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো সুশিক্ষিত, আল্লাহভীরু, বিনয়ী, দক্ষ ও মার্জিত নারী-পুরুষ তৈরি করা। এজন্য ইসলাম শিক্ষা অর্জন করাকে ফরয করে দিয়েছে। তাই রাসূল (স.) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ ইলম (দ্বীনি শিক্ষা) শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর ফরজ।[৪২৪] কেননা জ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা ও মর্যাদার মানদন্ড। এ জন্য যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয় তারা বিনা বাক্যে আল্লাহ প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান মেনে নেয়। এতে কোন প্রকার যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ অর্থাৎ আর যারা সুবিজ্ঞ তাঁরা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত। বস্তুত: বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।[৪২৫] সুতরাং যার জ্ঞান যত বেশী সে ততবেশী আল্লাহভীরু হবে এবং কোনরূপ কালক্ষেপন না করে আল্লাহর দেয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ – অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল (কুরআন হাদীসের) আলিমগণই (জ্ঞানীরাই) তাকে ভয় করে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাপরাক্রমালী ও ক্ষমাশীল।[৪২৬]

ইলম অর্জনকারীগণের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন, ... যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন আর যখন কোন একদল লোক আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং তার উপর শিক্ষা মূলক আলাপ আলোচনা করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) এক মহা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। আর ফেরেশতারা তাদের মজলিসকে ঘিরে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পেছন দিকে নিয়ে যাবে, বংশ গৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না। (অর্থাৎ ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য হলো আমল করা)। সুতরাং যে আমল করবে না তার ইলম কিংবা বংশ মর্যাদা তাকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছাতে

---

৪২৪. ইমাম ইব্‌নে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৮১, হাদীস নং ২২৪।

৪২৫. আল-কুরআন, ৩ : ০৭।

৪২৬. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮।

পারবে না।[৪২৭] রাসূল (স.) বলেছেন, **من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম (বিদ্যা) অনুসন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে, যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে।[৪২৮]

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে সরাসরি ফিরিশতাগণের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে শিক্ষার মধ্যে ভুল ভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। এমনকি কখনও কখনও কোন নবী রাসূলকে অন্যের নিকটও পাঠিয়েছেন। যেমন হযরত মূসা (আ.) কে খিযির (আ.) এর নিকট প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا** অর্থাৎ মূসা (আ.) তাকে বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন এ শর্তে আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?[৪২৯] মুমিনের কাজই হল শিক্ষা অর্জন করা। মুমিন বান্দা দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জন করতে থাকবে। রাসূল (স.) বলেন, **الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا** অর্থাৎ জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশি হকদার।[৪৩০] প্রতিযোগিতামূলক ভাবে শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অন্যদেরকে টপকিয়ে আরো কিভাবে অগ্রগামী হওয়া যায় সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যেমন রাসূল (স.) বলেন, **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا**- অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেছেন, কোন ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই, কিন্তু দু'টি ক্ষেত্র ব্যতিক্রম, উহা হলো: ১. কোন লোককে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে উহা সত্য পথে ব্যয় করে। ২. আর কোন লোককে আল্লাহ্ তা'আলা হিকমাত দান করেছেন, সে উহা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং অপর লোককে শিক্ষা দেয়।[৪৩১] ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে ওহীভিত্তিক আসমানী শিক্ষা যা সর্বকালের ও সর্বদেশের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষার রয়েছে বহুবিধ আদর্শিক বৈশিষ্ট্য যার কতিপয় নিম্নে উপস্থান করা হল-

ক) এ শিক্ষা সৃষ্ট জগত ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে।

খ) জৈবিক ও নৈতিকতার সম্বনয় সাধন করে।

গ) এ শিক্ষা সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন শিক্ষা।

ঘ) এ শিক্ষা ইহকালীন শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত করে।

ঙ) এ শিক্ষা একজন মানুষকে আদর্শ মুমিন ও মুসলিমরূপে তৈরি করে ।

---

৪২৭. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস নং ২৬৯৯।

৪২৮. ইমাম তিরমিযী (র.), ***সুনানুত তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ.০৫, পৃ. ২৯, হাদীস নং ২৬৪৭।

৪২৯. আল-কুরআন, ১৮ : ৬৬।

৪৩০. ইমাম তিরমিযী (র.), ***সুনানুত তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৫১, হাদীস নং ২৬৮৭।

৪৩১. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫, হাদীস নং ৭৩; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৫৫৯, হাদীস নং ৮১৬।

চ) এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত শিক্ষা।

ছ) এতে রয়েছে মানবতার সকল সমস্যার সমাধান।

২. নিষ্ফল সাধারণ শিক্ষাঃ

বর্তমান জড়বাদী আধুনিক শিক্ষা মানব জাতিকে আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত করলেও প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করতে পারে না। আমরা দেখি সাধারণ কিংবা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মানুষ কর্মক্ষেত্রে দূর্নীতি পরায়ন হয়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে পদস্খলিত হয় এমনকি সর্বক্ষেত্রে সে আদর্শহীনতার পরিচয় বহন করে। তার শিক্ষা এ ক্ষেত্রে তার বিবেককে নাড়া দেয় না। এ শিক্ষার বহুবিধ ত্রুটিপূর্ণ দিক রয়েছে যার কতিপয় নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ক. এ শিক্ষা মানব জাতির মাঝে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষায় দুনিয়াবী উন্নতি কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও আদর্শের ক্ষেত্রে থাকে যথেষ্ট ঘাটতি। এতে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়, সে সবসময় নিজের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে, জাতির কথা চিন্তা করে না। একটি জাতি যখন তাদের আত্মত্যাগ ও কর্মে উদ্দীপ্ত করার মত আদর্শের অভাব অনুভব করে তখন ক্রমশ তারা বিশ্বের ইতিহাসে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের পতন শুরু হয়ে যায়।

খ. বর্তমান জড়বাদী শিক্ষা নতুন প্রজন্মের আত্মা ও হৃদয়ে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষায় মনের চাহিদা পূরণ হয় কিন্তু আত্মা পরিশুদ্ধ হয় না, এর দ্বারা আত্মা প্রশান্তি লাভ করে না। এ শিক্ষার দ্বারা সৃষ্টিকর্তা ও বান্দার মাঝে বিচ্ছেদ ও দূরত্ব তৈরী হয়। তাই দেখা যায় এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন অবাধে মিথ্যা বলে, ব্যভিচারসহ বিভিন্ন ধরণের পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করে গৌরববোধ করে। যেমন ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জসিম উদ্দিন মানিক একশত মেয়েকে ধর্ষণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার বন্ধুবান্ধবদেরকে নিয়ে গৌরবের সঙ্গে ধর্ষনের সেঞ্চুরি উদযাপন করেছিল।[৪৩২] এছাড়া বাংলাদেশের প্রথম সারির একটি স্কুল ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের শিক্ষক পরিমল জয়ধর উক্ত স্কুলের বসুন্ধরা শাখার ১০ম শ্রেণির একজন ছাত্রীকে কোচিং সেন্টারে হাত-পা বেঁধে ও মুখে ওড়না গুঁজে দিয়ে ২৮ মে ২০১১ ইং ১ম বার এবং ১৭ই জুন ২০১১ ইং ২য় বার ধর্ষণ করে।[৪৩৩] যা দেশের প্রায় সকল জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়। এরকম আরও অসংখ্য পরিমল বাবুর বিচরণ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে রয়েছে।

গ. বস্তুবাদী শিক্ষার পরিণতি হল জ্ঞানের বিভাগীয় পৃথকীকরণ। জ্ঞানের বিভাজন নীতির কারণে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার্থী এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়। এতে গাছ দেখা যায় কিন্তু কাঠ দেখা যায় না। বাহ্যিক পরিপাটি ও শৃঙ্খলা দেখা যায় কিন্তু তার ফল পরিলক্ষিত হয় না।

---

৪৩২. *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩১ মার্চ ২০১৭ ইং তারিখে প্রকাশিত; *প্রথম আলো*, ১০ অক্টোবর ২০২০ ইং তারিখে প্রকাশিত।

৪৩৩. কাদির কল্লোল, *বিবিসি বাংলা,* ঢাকা, ২৫ নভেম্বর ২০১৫ খৃ. তারিখে প্রকাশিত। সূত্র: www.bbc.com 2015/11

ঘ. আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে এমন লোক তৈরি হয় যাদের জীবনের মৌলিক ও জরুরী বিষয়গুলোর উপর সুগভীর পান্ডিত্য থাকে না। মূলত তাদের জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর। একে অভিজ্ঞতা লব্ধ গভীর জ্ঞান বলে বিবেচনা করা চলে না। ফলে তারা এক সময় গবেষণা করে জাতিকে একটি নির্দেশনা দেয় কিছুদিন পর নিজেরাই আবার তা পরিবর্তন করে নেয়। যেমন আনুমানিক এক যুগ পূর্বে একবার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ৫ই মে মহাপ্রলয় ঘটবে বলে অন্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তা সঠিক হয়নি।

ঙ. সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা দেখা যায় কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কলমের খোচায় তারা জাতির সম্পদ লুটপাট করে কুক্ষিগত করে নেয়। তাদের শিক্ষা তাদেরকে সেই দুর্নীতি থেকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন সম্প্রতি রূপপুর পারমানবিক প্রকল্পের আসবাবপত্র অস্বাভাবিক দামে কেনা দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সেখানে প্রতিটি বালিশ কেনার খরচ দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা। আর প্রতিটি বালিশ নীচতলা থেকে আবাসিক ভবনের খাটে তোলার মজুরি দেখানো হয়েছে ৭৬০ টাকা করে। এভাবে ১৬৯ কোটি টাকার কেনাকাটায় প্রতি পদে পদে দুর্নীতি হয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, যাকে অধিকাংশ মিডিয়ায় 'বালিশ কাণ্ড' শিরোনামে প্রকাশ করেছে।[৪৩৪] এভাবে আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই রয়েছে দুর্নীতির ভুরি ভুরি উদাহরণ যার সিংহভাগই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে।

চ. সর্বোপরি দুনিয়াবী শিক্ষা বান্দাকে তার প্রতিপালকের পরিচয় লাভে সহায়তা করে না। বান্দার অন্তরে তার সৃষ্টিকর্তার ভয় সৃষ্টি করে না। তাকে বেপরোয়া চলা থেকে বাধা প্রদান করে না। ফলশ্রুতিতে তার দ্বারা খুব সহজেই যে কোন ধরনের অন্যায় ও পাপাচার সংঘটিত হতে পারে।

৩. ইসলামী শিক্ষার প্রসারঃ

মানবজাতির নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার কোন বিকল্প নেই। ইসলামী শিক্ষার আলো বিশ্বব্যাপী যত বেশী ছড়িয়ে দেয়া যাবে ততবেশী বিশ্বজাহান অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে, মানবজাতির চারিত্রিক সংশোধন ঘটবে এবং নৈতিকতার উন্নতি সাধিত হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ** অর্থাৎ প্রত্যেক বড় দল থেকে ছোট একটি দল কেন বের হয়ে যায় না যে, তারা দ্বীনের বুঝ অর্জন করবে এবং তাদের জাতির নিকট ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করবে যেন তারা আত্মরক্ষা করতে পারে।[৪৩৫] রাসূল (স.) বলেন, **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং মানুষকে উহা

---

[৪৩৪]. *প্রথম আলো*, ১৮ ই ডিসেম্বর ২০১৯ খৃ. তারিখে প্রকাশিত।

[৪৩৫]. আল-কুরআন, ৯ : ১২২।

শিক্ষা দাও, কেননা আমাকে অতি সত্বরই উঠিয়ে নেয়া হবে।[৪৩৬] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেছেন, **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً** অর্থাৎ তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও।[৪৩৭] রাসূল (স.) অন্যত্র বলেছেন, **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[৪৩৮] শুধু তাই নয় ইলমের চর্চা যত কমতে থাকবে মানুষ তত অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকবে। এক সময় গোটা জাতি ইলমশূন্য হয়ে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়বে যা তাদের ধ্বংসকে তরান্বিত করবে। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»** অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইলমকে বান্দার অন্তর থেকে ছিনিয়ে নিবেন না; বরং তিনি আলেমদের ইন্তেকালের মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। এভাবে পৃথিবীতে যখন আর কোন আলিম থাকবে না তখন তারা মুর্খদেরকে নেতা বানাবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে। তখন তারা বিনা ইলমে নির্দেশনা দিয়ে দিবে, ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং জাতিকেও গোমরাহ করে ছাড়বে।[৪৩৯]

৪. মানব জীবনে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নঃ

ইসলাম মানব জাতিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চশিখরে নিয়ে যেতে চায়। ইসলাম চায় মানব জীবনের পূর্ণতা নিশ্চিত করতে। বিশেষ করে যুব সমাজকে আদর্শ ও শক্তির উৎসরূপে তৈরি করা, তাদেরকে জীবন যাত্রার শিল্পকর্ম ও কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজের বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ্য। তাই একজন মুমিনের কাজই হবে সে সারা জীবন শিক্ষা অর্জন করতে থাকবে এবং তা জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে থাকবে। যেমন মহানবী (স.) বলেন, **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ** অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মু'মিন কখনও দ্বীনি ইলম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তার পরিণাম জান্নাত হয়।[৪৪০] অর্থাৎ সে আমরণ ইলম অন্বেষণ করে আর এটি তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন, **عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الإِسْلاَمَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ.** অর্থাৎ হযরত হাসান (রা.) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায় যে, সে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে, জান্নাতে তার

---

৪৩৬. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৪১৩, হাদীস নং ২০৯১ ; ইমাম বায়হাকী (র.), ***শুআবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ১৫৪৮।

৪৩৭. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ৩৪৬১।

৪৩৮. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ১৯২, হাদীস নং ৫০২৭।

৪৩৯. ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩১, হাদীস নং ১০০।

৪৪০. ইমাম তিরমিযী (র.), ***সুনানুত তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৫০, হাদীস নং ২৬৮৬।

ও নবীদের মধ্যে মাত্র একটি স্তর পার্থক্য থাকবে। অর্থাৎ সে নবীদের অতি নিকটে থাকবে।[৪৪১] অর্থাৎ ইলম শিখতে হবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করার জন্য। প্রকৃত আলেম সে যে তার ইলম অনুযায়ী আমল করে। আমলবিহীন আলেম ফলহীন বৃক্ষের মত। ফলহীন বৃক্ষের যেমন কোন মূল্য নেই তেমনি আমল বিহীন আলেমেরও কোন মূল্য নেই। সে জাতির তেমন কোন উপকারে আসে না। আলিমগণ হবেন লোভ-লালসা মুক্ত, দুনিয়ার কোন স্বার্থ, লোভ-লালসা ও মোহ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ : مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. قَالَ : فَمَا يَنْفِى الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّمَعُ। অর্থাৎ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকৃত ইলমের অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তি কারা? তিনি জবাবে বললেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে। ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আলেমদের অন্তর থেকে ইলমের বরকত ও নূর কোন্ জিনিষে শেষ করে দেয়? তিনি বললেন, পার্থিব লোভ-লালসা।[৪৪২]

ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষা ও বিধান জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর। কেননা বিশ্বজগতের স্রষ্টা যিনি, তিনিই ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস। তার কালাম তথা পবিত্র কুরআনুল কারীমই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার মূল গ্রন্থ যা পৃথিবীর সকল জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভান্ডার। সাথে সাথে মহানবীর বাণী তথা হাদীসের উৎসও তিনি, কারণ হাদীস প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, "মুহাম্মদ (স.) তার নিজের থেকে কোন কথা বলেন না; বরং তাই বলেন যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়"।[৪৪৩] তাই ইসলামী শিক্ষা মানবজীবনে বাস্তবায়ন হলে আবারো ধুলির ধরায় জান্নাতী সুবাতাস প্রবাহিত হওয়ার আশা করা যায়। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে জানার পর শিক্ষার্থী তার নিজের মন মগজ দ্বারা তার আকিদা, বিশ্বাস, আমল, চরিত্র ও আচরণবিধিকে বিশুদ্ধ করে নেবে। অন্যায়-অসত্য, বাতিল ও মিথ্যার সাথে সে আপোষ করবে না। সত্য অবগত হওয়ার পর সে তার বিপরীত পথ পরিহার করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করবে। ইসলামী শিক্ষা মানব জীবনোন্নয়নে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ক. ইসলামী শিক্ষা ব্যক্তিকে সৎ, আদর্শবান, ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান বানায়।

খ. এ শিক্ষা মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করে।

গ. এ শিক্ষা বাস্তবমুখী। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মানব সন্তান অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করে।

ঘ. এ শিক্ষা মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঙ. ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য বাস্তব ভিত্তিক কর্মনীতি অনুশীলন করে।

---

৪৪১. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ওয়ালী উদ্দীন খতীব আত-তিবরীযী, ***মিশকাতুল মাসাবীহ,*** বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫ খৃ., খ. ০১, পৃ. ৮৩, হাদীস নং ২৪৯।

৪৪২. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দারেমী, ***সুনানুদ দারেমী,*** দারুল মুগণী, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ হি., ২০০০ খৃ., খ. ০১, পৃ. ৪৬৯, হাদীস নং ৫৯৫।

৪৪৩. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪।

চ. এ শিক্ষা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে উদারতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়।

ছ. সার্বজননীন ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে।

জ. এ শিক্ষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করে।

ঝ. শ্রমিকের অধিকারসহ মানবাধিকার সুরক্ষিত করে।

ঞ. জীবন ও চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

ট. এ শিক্ষা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রয়োজন পূরণের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিশীল।

ঠ. অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির গোলামী থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করে।

ড. সকল মানুষের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে তাকে গেলামীর শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীন জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী করে তোলে।

ঢ. একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক তৈরি করে।

ণ. সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষা বান্দাকে আখিরাতমুখী জীবন যাপনে উৎসাহিত করে।

৫. মানবতার মুক্তির সোপান ইসলামী শিক্ষাঃ

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য হল, আদর্শ ও জাতীয় স্বকীয় সংস্কৃতি রক্ষা করা, আদর্শ ও নৈতিকতা সম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরি করা, যারা জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে জ্ঞানী হবে; বাস্তবমুখী সকল সমস্যার সমাধান করবে। ইসলাম নিছক একটি বিশ্বাস মাত্র নয়; কতিপয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বস্বও নয়; বরং হইলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে মানবজাতিকে আদর্শিক চেতনায় উজ্জীবিত করার একমাত্র ম্যানুয়েল। আধুনিক শিক্ষায় নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়, কিন্তু ইসলামী শিক্ষা মানব জাতিকে চারিত্রিক গুণাবলীতে বিভূষিত করে, যোগ্যতা সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করে। ইসলামী শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তির মন, মগজ, চরিত্র ও বৈষয়িক কর্মতৎপরতা কখনোই ইসলামী আদর্শানুযায়ী উত্তীর্ণ হতে পারে না। এ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দুনিয়াতে নিজে হিদায়াতের উপর চলা, অন্যকে হিদায়াতের পথে আহবান করা এবং এর মাধ্যমে ইকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। এ শিক্ষা দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে হাসিল করা হয় না। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। যেমন রাসূল (স.) বলেন, عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلعم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لايتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعنى ريحها- অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করল, যার সাহায্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়; কিন্তু সে উহা পার্থিব উপায় উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করেছে, এ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাস (সুঘ্রাণ) টুকুও

পাবে না।[৪৪৪] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেছেন, **انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهجر اليه**- অর্থাৎ যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়্যাতের ওপরই নির্ভর করে, আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়্যাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিংবা কোন রমণীকে পাওয়ার নিয়্যাতে হিজরত করে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে।[৪৪৫] এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইলম অর্জন একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে। জাতির মুক্তির জন্য, জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য এবং জাতির কল্যাণে ইলম অর্জন করতে হবে, দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়।

আমাদের বর্তমান আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নয়। এ শিক্ষা বিদেশী ও বিজাতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক বাহকদের মাধ্যমে প্রবর্তিত। কেরানীগিরি করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ শিক্ষা শুধু আমাদের মারাত্মক ক্ষতিই করেনি; সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান সম্পদ ঈমান ও চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে। আমাদের জাতিসত্ত্বার মূলভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আদর্শ ও চরিত্রবান জাতি হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা আদর্শহারা, নৈতিকতা বিচ্যুত এবং চরিত্রহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করেছে। আমাদের জীবনের সার্বিক পর্যায়ে চরম নৈতিক বিপর্যয় এনে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা আমাদেরকে গোলামীর জাতিতে পরিণত করেছে। সুতরাং জাতীয় মুক্তির একমাত্র সোপান হল ইসলামী শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমে জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকারের উন্নতি সম্ভব। এর মধ্যেই ইহজগতের শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে।

৩য় পরিচ্ছেদ
পাপ ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতকরণ

১. পাপাচার ও নাফরমানীর কুফলঃ

অন্যায়, পাপাচার ও নাফরমানীর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। পৃথিবীর বহু প্রতাপান্বিত জাতি ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে যার বহু প্রমান কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। যেমন নমরূদ, কারূন, শাদ্দাদ, আদ ও সামূদ জাতি, লূত জাতি, ফিরআউন ও তার গোষ্ঠী, আসহাবুস সাবত ইত্যাদি সকলেই পাপাচার ও নাফরমানী করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাই

---

৪৪৪. ইমাম আবু দাউদ (র.), ***সুনানু আবি দাউদ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৩৬৬৪; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ৮৪৫৭। ইমাম ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৯২, হাদীস নং ২৫২।

৪৪৫. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), ***আল-জামি লিল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ০৬, হাদীস নং ০১; ইমাম মুসলিম (র.), ***সুনানু মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১৫১৫, হাদীস নং ১৫৫; ইমাম আবু দাউদ (র.), ***সুনানু আবি দাউদ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ২৬২, হাদীস নং ২২০১; ইমাম ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৪১৩, হাদীস নং ৪২২৭।

কোন জাতির সামাজিক, আদর্শিক ও নৈতিক অধ:পতন রোধের প্রথম পদক্ষেপ হলো পাপাচার ও অপরাধের কুফল সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিশাল একটি অংশে অতীতকালীন জাতি-গোষ্ঠীর পাপাচার ও ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করে মানবজাতিকে পাপাচার ও নাফরমানীর কূফল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই যুগে যুগে প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে নাফরমানীর কুফল ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা অতীব জরুরী।

কোন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিধি-বিধান এবং নিয়ম পদ্ধতি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন যা সকল প্রকার অপরাধ ও পাপাচার রোধে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে। তবেই সে সমাজ ও সভ্যতা নৈতিক বিধি-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে কোন দেশ, জাতি ও সভ্যতার সকল সদস্য যদি ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোন কর্মকাণ্ডকে জাতির জন্য উপকারী ও উপযোগী বলে নির্ধারণ করে, আর বাস্তবে যদি তা মানব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়; তখন সংখ্যাধিক্যের সমর্থন থাকলেও তা বিশ্ব মানবতার জন্যে উপকারী বলে বিবেচিত হবে না। যেমন বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা ইউরোপ, আমেরিকার দেশসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনে অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচার (Free Mixing and Free Sex), এবং সমকামিতা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এটা মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা এটা জাতি ও সভ্যতার নৈতিক পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। যার বাস্তব প্রমাণ হল হযরত লূত (আ.) এর জাতি সাদূমবাসী যাদের প্রায় সকলেই সমকামিতা নামক বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর এ কারণে পুরো জাতি ধ্বংস হয়েছে। তাই মানবতার কল্যাণে সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমর্থনে কোন বিধি বিধান প্রণয়ন না করে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত আইনকেই কার্যকর করতে হবে। তাহলে-ই মানবজাতি দুনিয়া এবং আখিরাতে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধঃ

সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন, চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলন, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এবং সমাজ জীবনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামের আগমনই ঘটেছে মানবজাতির সংশোধন ও নৈতিক উন্মেষ সাধন করার লক্ষ্যে, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্যে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রকৃত সাফল্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। এজন্য ইসলামে রয়েছে কতগুলো বিশ্বাস ও কর্মগত নীতিমালা, যেগুলোর অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক বান্দাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের দায়িত্ব পালন করতে হয়। মুসলিম জাতি হচ্ছে নবী করীম (স.) এর উত্তরাধিকারী। আর রাসূল (স.) যে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তাদেরও সেই দায়িত্ব পালন করে যাওয়া কর্তব্য। যেভাবে রাসূল (স.) নিজের কথা ও আমল দ্বারা দিন-রাত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার গুরু দায়িত্ব পালন করে গেছেন অনুরূপভাবে এই উম্মতকেও বিশ্ব মানবের সামনে আল্লাহর দ্বীন স্পষ্ট করে পেশ করতে হবে।[৪৪৬] মূলত সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এমন দুটি ফরজ বিধান যার উপর ইসলাম পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। আমরা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখতে পাব যে, পুরো

---

৪৪৬. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, ***আদাবে জিন্দেগী,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: জুন ১৯৯৪ খৃ., মুহাররম ১৪১৫ হি., পৃ. ২০৬।

ইসলাম দুটি জিনিষের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি হল الامر بالمعروف। তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অপরটি হল نهي عن المنكر তথা অসৎ কাজের নিষেধ। মহান আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (স.) আমাদেরকে কিছু কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন এবং কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম সমাজকে ধ্বংসকারী রোগ-ব্যাধি, পাপাচার, নৈতিক স্খলন ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাপাচার ও নাফরমানী সমাজের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে এবং পরিণামে ধ্বংস ও পতনের পথকে ত্বরান্বিত করে। আর তা থেকে সামাজকে রক্ষা করতে হলে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের বিকল্প নেই । আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ অর্থাৎ তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।[৪৪৭] আল-কুরআনে আরও উল্লেখ আছে, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি দল থাকতে হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান জানাবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে আর তারাই হবে সফলকাম।[৪৪৮]

রাসূল (স.) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ – অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় ও পাপকাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত (শক্তি) দিয়ে বন্ধ করে দেয়, এমনটি করার শক্তি না থাকলে যেন সে মুখে তার বিরোধিতা করে, তাও যদি করার শক্তি না থাকে তবে সে যেন মনে মনে ঘৃণা করে। আর এটা হলো দুর্বলতম ঈমান।[৪৪৯] রাসূল (স.) অন্যত্র বলেছেন, والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليؤشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولايستجاب لكم– অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদিগকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিস্কৃতি পাবার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না।[৪৫০] এমনকি যদি ঐ জনপদে কোন বুযুর্গ বান্দাও অবস্থান করে তবে সেও আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যেমন রাসূল (স.) বলেন, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلى جبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ: يارب إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ". قَالَ: " فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجهه لم يتمعر فِي

---

৪৪৭. আল-কুরআন, ৩ : ১১০।

৪৪৮. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪; এছাড়াও এ বিষয়ে আরো আছে আল-কুরআন ৯:৭১; ২২:৪১; ৩১:১৭।

৪৪৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৬৯, হা. নং ৭৮।

৪৫০. ইমাম তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী,* প্রাগুক্ত, ৪র্থ খ., পৃ. ৪৬৮, হা. নং ২১৬৯।

" رواه البيهقي في شعب الايمان- سَاعَة قطّ অর্থাৎ হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ.) কে প্রত্যাদেশ করলেন, অমুক জনপদটি তার অধিবাসীদেরসহ উল্টিয়ে দাও। জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা আছে যে একটি মুহূর্তও আপনার নাফরমানী করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জনপদটি তাকেসহ তাদের সকলের উপরে উল্টিয়ে দাও। কেননা আমার নাফরমানী হতে দেখে তার চেহারা কখনও বিমর্ষ হয়নি।[৪৫১]

মানবজাতির প্রতিটি লোককে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত থাকতে হয়। কেননা কর্তব্যের অনুভূতি তাকে সমগ্র জীবনভর সক্রিয় করে রাখে। একজন অনুগত সন্তান, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় ভাই-বোন এবং আত্মবিশ্বাসী স্বামী-স্ত্রীরূপে প্রত্যেকের অধিকারই ইসলামে সুনির্ধারিত। তাই অধিকার হরণ বা লঙ্ঘন ইহ্কালীন অশান্তি ও পরকালীন স্থায়ী শাস্তির কারণরূপে বিবেচিত হয়। এজন্যে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয় যাতে করে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায়। তাই প্রকৃত মু'মিন সে, যে তার নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন থাকবে। কখনো সে তার দায়িত্ব ও কতর্ব্যে অবহেলা করবে না। কেননা প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল এবং তাকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এবং তোমাদের আহলকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[৪৫২] অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে তেমনি তার অধীনস্ত লোকদেরকেও জাহান্নাম ও ধ্বংস থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তার। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং ইমাম দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সেবক তার নেতার দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৪৫৩] আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষকে তার পরিসরে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন যাতে মানব জাতি সঠিক পথে চলতে পারে এবং সকল প্রকার স্খলন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হলে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ'ই হল একমাত্র ও উপযুক্ত পন্থা।

---

৪৫১. ইমাম ওয়ালী উদ্দীন খতীবে তিবরীযী, ***মিশকাতুল মাছাবীহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১৪২৬, হাদীস নং ৫১৫২।

৪৫২. আল-কুরআন ৬৬ : ০৬।

৪৫৩. ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১২০, হাদীস নং ২৪০৯।

এ দুনিয়া হল চাকচিক্যময় ও ধোকার জায়গা। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, **ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون**- অর্থাৎ পার্থিব জীবন সুমধুর, আকর্ষণীয় ও মনোরম। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তোমাদেরকে খিলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব দিয়ে দেখছেন তোমরা কিরূপ কাজ কর।[৪৫৪] তাই দুনিয়ার চাকচিক্যের ধোকায় না পড়ে এ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে হবে সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। মানুষকে নির্দেশনা দিতে হবে রাসূল (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। মনগড়া কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষন ও পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া যাবে না, তাহলে এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে সে নিজে যেমন ধ্বংস হবে তেমনি পুরো জতিকেও ধ্বংস করে ছাড়বে। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, **من قال فى القران برائيه فليتبوأ مقعده من النار وفى رواية من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار**- অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মন মত কথা বলল সে যেন দোযখে নিজের ঠিকানা করে নিল। অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি না জেনে না বুঝে (দায়িত্বহীনভাবে) কুরআন সম্পর্কে কথা বলল, সে নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল।[৪৫৫] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন, **عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد فى غيره فقدخانه**- অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দিল এর গুনাহ ফতোয়া দান কারীর ওপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কোন কাজের পরামর্শ দিল, অথচ সে জানে যে সঠিকতা তার বিপরীতটার মধ্যে রয়েছে, সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসঘাতকতা করল।[৪৫৬] সুতরাং সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা মানবজাতির মৌলিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি। তবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। রাসূল (স.) এর প্রদর্শিত রূপরেখা অনুযায়ী এ দায়িত্ব পালন করতে পারলে যেমন বান্দার উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব আদায় হবে তেমনি তার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্রের লোকজন সফলতার পথ খুঁজে পাবে এবং আযাব গযব ও ধ্বংস থেকে তারা বাঁচার উপায় নির্ণয় করতে পাবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, উপদেশ প্রদানকারীকে অবশ্যই মিষ্টভাষী, নম্র, ভদ্র, সদালাপী, সবরকারী, এবং নিজ প্রবৃত্তিকে স্বীয় বসে রাখায় সামর্থবান হতে হবে। স্নেহ-মমতা দিয়ে হাসিমুখে মানুষের সঙ্গে

---

৪৫৪. ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২০৯৮, হাদীস নং ২৭৪২; অনুরূপ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪৪, পৃ. ৬০৯, হাদীস নং ২৭০৫৫; ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৪৮৩, হাদীস নং ২১৯১; মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে আলী আল-বাগাভী, ***শরহুস সুন্নাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৯, পৃ. ১২, হাদিস নং ২২৪৩; ইমাম বায়হাকী (র.), ***শুআবুল ঈমান,*** প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫১৭, হাদীস নং ৯৮২০।

৪৫৫. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ১৯৯, হাদীস নং ২৯৫১; ইমাম বাগাভী, ***শরহুস সুন্নাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৫৮, হাদিস নং ১১৮।

৪৫৬. ইমাম আবূ দাঊদ (র.), ***সুনানু আবী দাঊদ,*** প্রাগুক্ত, খন্ড ০৩, পৃ. ৩২১, হাদীস নং ৩৬৫৭; ইমাম বায়হাকী (র.), ***আস সুনানুল কুবরা,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., খ. ১০, পৃ. ১৯৯, হাদীস নং ২০৩৫৩; আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং ৩৫০।

মেলামেশা করতে হবে। কখনো রুক্ষ ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে উপদেশ প্রদানকারী চিকিৎসকের ন্যায় লোকদেরকে উপদেশ রূপ ঔষধের দ্বারা পাপমুক্ত রাখবে।[৪৫৭] দাঈ যদি রুক্ষ মেজাজের হয়, তার ভাষা যদি কর্কষ হয় তবে জাতি তার থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং তাকে পাশ কেটে চলবে।

৩. মৌলিক গুনাহসমূহ বর্জনঃ

বান্দা যদি বড় বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ছোট গুণাহসমূহ মার্জনা করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا অর্থাৎ তোমরা যদি নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক তবে আমি তোমাদের (ছোট ছোট) গুনাহ সমূহ মার্জনা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাব।[৪৫৮] সুতরাং বান্দা অবশ্যই মৌলিক গুনাহ তথা কবীরা গুনাহসমূহকে পরিহার করে চলতে হবে। তাহলে সে সগীরা গুনাহ সমূহ থেকে আল্লাহর দয়ায় ক্ষমা পেয়ে যাবে। সে জন্য তাকে অবশ্যই মানবিক দুর্বলতাকে অগ্রাজ্য করে চলতে হবে। মনের চাওয়া পাওয়াকে উপেক্ষা করে আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর নির্দেশ কে প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত হবে। দুনিয়াতে সে আসমানী আযাব ও গযব থেকে পরিত্রান পাবে এবং পরকালেও সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। বান্দাকে যে সকল মৌলিক গুনাহ পরিহার করে চলতে হবে তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক. **শিরক :** শিরক এমন একটি গুনাহ যা আল্লাহ পাক সাধারণত ক্ষমা করেন না। যেমন তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শিরকের পাপ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্য সব পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল সে আল্লাহ তা'আলার উপর বড় ধরণের মিথ্যা অপবাদ দিল।[৪৫৯]

খ. **কুফর :** কুফর বড় গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুধাবন করতে কুরআন, হাদীস, নবী-রাসূল ও দ্বীনের দাঈগণের দাওয়াতের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি শুধুমাত্র তার নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা করলেই সে তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাবে। তাই আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা কাফির তাদেরকে আপনি উপদেশ দিন আর নাই দিন তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তকরণে এবং কর্ণসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন আর চক্ষুসমূহে পর্দা ঢেলে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৪৬০]

গ. **নিফাক :** নিফাক অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়ংকর একটি গুনাহ। এ বৈশিষ্ট্যকে মানব সমাজে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হয়। এটি হল দ্বিমুখী নীতি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তারা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের

---

৪৫৭. মূল: ইমাম গাযালী (রহ), ***এছলাহে নফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধি,*** বাংলা রূপায়ণ: শর্ষিণা লাইব্রেরী অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ কতৃক অনুদিত, শর্ষিণা লাইব্রেরী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ মার্চ ২০১১ ইং, পৃ. ৯২-৯৩।

৪৫৮. আল-কুরআন, ৪ : ৩১।

৪৫৯. আল-কুরআন, ৪ : ৪৮।

৪৬০. আল-কুরআন, ২ : ৬-৭।

শয়তান দোসরদের সাথে নির্জনে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি। আমরাতো (ঈমানদারদের সাথে) কেবল উপহাসকারী।[৪৬১] মুনাফিকদের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে"।[৪৬২]

ঘ. **মিথ্যা :** মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার পক্ষে যে কোন অপকর্ম করা সম্ভব। কেননা সে অপকর্ম করে তা অস্বীকার করবে। আর যদি মিথ্যা ছাড়তে পারে তবে তার পক্ষে সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার, চুরি, মদপান, মিথ্যা বলা ইত্যাদি যাবতীয় পাপকাজে অভ্যস্ত। আমি এত পাপকাজ একসাথে ছাড়তে পারব না। আপনি শুধু আমাকে একটি বলুন যা আমি সহজে ছেড়ে দিতে পারি। রাসূল (স.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও। ঐ ব্যক্তি আর মিথ্যা বলবে না মর্মে ওয়াদা করে বাড়ি চলে গেল। অতঃপর লোকটি ব্যভিচার করার ইচ্ছা করল। সে মনে মনে চিন্তা করল আমিতো রাসূল (স.) এর সাথে ওয়াদা করেছি মিথ্যা বলব না। রাসূল (স.) যখন জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি এ কাজ করছ কি না তখন আমি যদি মিথ্যা বলি তবে ওয়াদা ভঙ্গ হবে। আর যদি সত্য বলি তবে দণ্ড ভোগ করতে হবে, সুতরাং এ কাজ করা যাবে না। এ চিন্তা করে তিনি আর ব্যভিচার থেকে ফিরে আসেন। এভাবে তিনি চুরি ও মদপান করার ইচ্ছা করেও একই চিন্তা করে তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অতঃপর তিনি রাসূল (স.) এর দরবারে এসে বললেন, মিথ্যা ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা করার কারণে আমি বাধ্য হয়ে সব অপরাধই ছেড়ে দিয়েছি।[৪৬৩] রাসূল (স.) বলেছেন, "নিশ্চয় মিথ্যা পাপাচারিতার দিকে নিয়ে যায় আর পাপচারিতা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়"।[৪৬৪] সবচেয়ে বড় মিথ্যা হল আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ঐ ব্যক্তি থেকে আর কে বড় যালিম হতে পারে? যে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে"।[৪৬৫]

ঙ. **ওজনে কম দেয়া :** ওজনে কম দেয়াটা জঘন্যতম পাপের কাজ। এতে বান্দার হক নষ্ট হয়। আর আল্লাহ পাক বান্দার হক ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না বান্দা তাকে মাফ করে দেয় অথবা সে তার হক পরিশোধ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওযনে কমপ্রদানকারী এবং বেশী গ্রহণকারীদের জন্য ধ্বংস"।[৪৬৬]

চ. **লুণ্ঠন :** লুটপাট এটা যুগ যুগ থেকেই সময়ে সময়ে পৃথিবীতে সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে দেশে যখন কোন অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয় এবং ন্যায়বিচারের কোন বালাই না থাকে তখন অধিকহারে লুটপাট হয়ে থাকে। মাদায়েনবাসীর মধ্যে ব্যাপকহারে লুণ্ঠনকরে সম্পদ কুক্ষিগত করার

---

৪৬১. আল-কুরআন, ২ : ১৪।

৪৬২. আল-কুরআন, ৪ : ১৪৫।

৪৬৩. আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব আল-কিনানী, ***আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ***, বৈরুত: দার ও মাকতাবায়ে হেলাল, প্রকাশ ১৪২৩ হি. পৃ. ৬০; মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-বাগদাদী, ***আত-তাজকিরাতুল হামদুনিয়্যাহ***, বৈরুত: দারু ছাদির, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭ হি., খ.০৩, পৃ. ৪৯।

৪৬৪. ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ২৫, হাদীস নং ৬০৯৪।

৪৬৫. আল-কুরআন, ৬ : ২১।

৪৬৬. আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৩।

প্রবণতা বিদ্যমান ছিল।[৪৬৭] এটা জঘন্যতম অপরাধ যার মাধ্যমে জান এবং মাল উভয়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

ছ. **পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা :** একে অপরের সম্পদ গ্রাস করা এটা জঘন্য পর্যায়ের জুলুম। এতে বান্দার হক বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোরভাষায় এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্পদ পরস্পর অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ভক্ষণ করতে পার"।[৪৬৮] তিনি অন্যত্র বলেন, "তোমরা ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও, পবিত্র সম্পদের সাথে তোমরা অপবিত্র সম্পদকে একত্রিত করো না। তোমরা তাদের সম্পদকে তোমাদের নিজেদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে ভক্ষণ করো না; নিশ্চয় উহা বড় ধরণের গুনাহ"।[৪৬৯]

৪. মন্দ বৈশিষ্ট্য ও মনচাহে জিন্দেগী পরিহারঃ

পৃথিবীতে আদর্শ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এবং ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকার জন্য মন্দ বৈশিষ্ট্যাবলী ও মনচাহে জিন্দেগী পরিহার করতে হবে। মন মত জিন্দেগী পরিচালনা করা যাবে না। মন মত চললে মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয় যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ - অর্থাৎ তুমি মনের চাহিদার অনুসরন করো না, তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে পড়ে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এ কারণে যে, তারা হিসাব নিকাশের দিনকে ভুলে রয়েছে।[৪৭০] মন সব সময় বান্দাহকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করে।[৪৭১] তাই মনের চাহিদাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও রাসূল (স.) এর সুন্নাহ মোতাবেক চলতে হবে, তবেই সফলতা অর্জন করা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى - অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং তার নফসের চাহিদাকে পরিত্যাগ করে নিশ্চয় তার অবস্থানস্থল হচ্ছে জান্নাত।[৪৭২] মন্দগুণাবলী হল সমস্ত সৎগুণের মূলোৎপাটনকারী, শয়তানী প্রেরণা এবং গর্হিত কাজের উপর উদ্বুদ্ধকারী। অসৎ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিরা কোনক্রমেই সঠিক পথ লাভ করতে পারে না। মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো দোষ-ত্রুটি আছে যেগুলো ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করে না দিলেও নিজের প্রভাবের দ্বারা কাজকে বিকৃত করে দেয়, অন্তরের মধ্যে কালিমা সৃষ্টি করে।[৪৭৩] ফলে বান্দা নেক আমলের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অলসতার কারণে এগুলো লালিত হতে থাকলে তা এক সময় মহামারী আকার ধারণ

---

৪৬৭. আল-কুরআন, ১১ : ৮৫; মূল: আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া,*** অনু. মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৪৬৮. আল-কুরআন, ৪ : ২৯।

৪৬৯. আল-কুরআন, ৪ : ২।

৪৭০. আল-কুরআন, ৩৮ : ২৬, অনুরূপ ৪ : ১৩৫।

৪৭১. আল-কুরআন, ১২ : ৫৩।

৪৭২. আল-কুরআন, ৭৯ : ৪০-৪১।

৪৭৩. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৩; ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৪৩৪।

করে যা পতনকে ত্বরান্বিত করে; মানবিক প্রচেষ্টাকে ভালোর থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই মানবজাতিকে মন্দগুণাবলী পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

৫. ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগরণঃ

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম হল মানুষের জীবন বিধান। মানব জাতির অবক্ষয় রোধের একমাত্র উপাদান হল ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগরণ। আর মূল্যবোধ হল জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির সাফল্য। মানব সমাজের প্রকৃত সফলতার জন্য মূল্যবোধ আদর্শিক হওয়া প্রয়োজন। মূল্যবোধ হীন ও কলুষতাযুক্ত হলে সাধারণত মানব প্রকৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিশেষকরে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, খামখেয়ালী ইত্যাদি থেকে এই হীন মূল্যবোধ তৈরি হয় যার থেকে সূত্রপাত হয় সীমালঙ্ঘনের। সুতরাং আদর্শিক মূল্যবোধ দিয়ে চরিত্রকে গড়ে তুলে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করা যায় এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো যায়। তাই একটি জাতিকে সুশৃঙ্খল এবং ঐক্যবদ্ধ করে রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকল্প নেই। কেননা, ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারাই মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় যা একটি আদর্শ জাতি গঠনের অন্যতম সোপান। বস্তুত ধর্ম মানুষকে নৈতিক দর্শন ও আধ্যাত্মবাদের প্রতি সচেতন করে তোলে। আর এ আদর্শিক মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যায়। কেননা একমাত্র ইসলাম ধর্মই হল আল্লাহ প্রদত্ত এবং অপরিবর্তিত জীবন বিধান। যাতে রয়েছে ইহকাল এবং পরকালীন জীবনের পরিপূর্ণ বর্ণনা; ইহকালে পাপাচার ও নাফরমানী করলে পরকালে যে কি ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা। ফলে যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী তারা পরকাল বিশ্বাস করে, পরকালে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতাকে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করলে পরকালে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। এছাড়া বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মই মানব রচিত। আর যে দু একটি আল্লাহ প্রদত্ত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাদের ধর্মগুরুরা তাদের সুবিধামত মনগড়া অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করেছে। ফলে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত বাকী সকল ধর্মই একটি জাতির মধ্যে আদর্শিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে অক্ষম।

ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারলে সমাজে আর কোন অশান্তি, অনাচার, অবিচার ও ব্যভিচার থাকবে না। কেননা ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা। সে হিসেবে ইসলামের রয়েছে নিজস্ব মূল্যবোধ, আদর্শ ও লক্ষ্য যা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও সফলতা বয়ে আনতে পারে। তাই বৈষয়িক যোগ্যতা সৃষ্টি, উত্তম চরিত্র গঠন, সামাজিক গুণাবলী অর্জন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী মূল্যবোধ জাগরণের কোন বিকল্প নেই। এ মূল্যবোধ জাগ্রত করতেই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) কে দিয়ে মুসলিম নর-নারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যিনি নিরক্ষর জাতির মধ্যে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন

ইতিপূর্বে তারা ছিল প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।[৪৭৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পাঠ করে শুনান, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।[৪৭৫] রাসূলে কারীম (স.) আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সে প্রশিক্ষণে সাহাবায়ে কেরাম এমন আদর্শিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হয়েছিলেন যার কারণে তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তারা হয়ে উঠেছিলেন উন্নত আদর্শের রোল মডেল। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেছেন স্বীয় সন্তুষ্টির সনদ। এমনকি রাসূলে কারীম (স.) তাদের অনেককে দুনিয়াতে থাকতেই দিয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদ। তাই কিয়ামত পর্যন্ত আগত জাতিসমূহের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে ঐ মূল্যবোধ-ই তাদেরকে পাপাচারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিবে। যা তাদেরকে সফলতার উচ্চশিখরে পৌঁছতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ আদর্শিক জাতি গঠনে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার কোন বিকল্প নেই।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামী অনুশাসনমূলক কর্মসূচী পালন

১. মৌলিক ইবাদাতসমূহ পালন :

ইবাদাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হল গোলামী করা, দাসত্ব করা, উপাসনা করা ইত্যাদি। আর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, أَنَّ الْعِبَادَةَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ وَتَرْكٍ يُؤْتَى بِهِ لِمُجَرَّدِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ، وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَجَمِيعُ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، অর্থাৎ ইবাদাত প্রত্যেক এমন কাজ পালন করা এবং বর্জন করার নাম যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের জন্য হয়ে থাকে। আর এতে সকল প্রকার আত্মিক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্যাবলীও অন্তর্ভুক্ত।[৪৭৬] আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন, তাঁর অসীম অনুগ্রহ লাভ ও শয়তানের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামের উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে মৌলিক ইবাদাতসমূহ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন-হাদীসের আলোকে সকল বিধি বিধান অবগত হয়ে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদাতের যথাযথ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। সময়মত জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় করলে আল্লাহ্ভীতি ও বিনম্রভাব সৃষ্টি হয়। তা বান্দাকে অপরাধ ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন মহান অল্লাহ তা'আলা বলেন, اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ তোমার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তুমি তা তিলাওয়াত কর এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায

---

৪৭৪. আল-কুরআন, ৬২ : ২ অনুরূপ ২ : ১২৯; ৩ : ১৬৪।

৪৭৫. আল-কুরআন, ২ : ১৫১।

৪৭৬. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.). *তাফসীরে কাবীর,* প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৭৫।

অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।[৪৭৭] সুতরাং বুঝা গেল নামায হল বান্দাকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখার সবচেয়ে বড় এন্টিবায়োটিক। এছাড়া সকল ইবাদাত-ই বান্দার গুনাহকে মুছে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ অর্থাৎ আর তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রান্তভাগে। নিশ্চয় পুন্য পাপকে দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে নিশ্চয় এটি তাদের জন্য এক মহা স্মারক।[৪৭৮] রাসূল (স.) বলেছেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স.) বলতেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান এগুলো তাদের মধ্যকার সময়ে সংঘটিত হওয়া (সগীরা) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় যদি বান্দা কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে।[৪৭৯] রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন, «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করল কিন্তু সে অশ্লীল কথাবার্তা বলেনি এবং পাপাচার করেনি মনে হচ্ছে যেন সে ঐদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসল যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল।[৪৮০] তবে এ সকল ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে কেবল আনুষ্ঠানিকতাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর সম্মুখে বিনয়ী হবার গুণাবলীও সৃষ্টি হওয়া উচিৎ। যা মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে, তাকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য করে তোলে।

এছাড়াও রাসূল (স.) ইবাদাতকে দ্বীনের অস্তিত্বের জন্য শর্ত করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন, «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ» অর্থাৎ যার মধ্যে আমানতদারী (বিশ্বস্ততা) নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই। যার নামায নেই তার দ্বীন নেই, গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে গুরুত্ব ও মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে নামাযের তদ্রূপ গুরুত্ব ও মর্যাদা।[৪৮১] পুরো দ্বীনটাই মূলত অনেকগুলো ইবাদাতের সমন্বয়। রাসূল (স.) বলেছেন, عن عبد الله بن عمر رضـ قال رسول الله صلعم بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان (متفق عليه) অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির (স্তম্ভের) উপর স্থাপিত। ১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল। ২. নামাজ কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪.

---

৪৭৭. আলকুরআন ২৯ : ৪৫।

৪৭৮. আল-কুরআন, ১১ : ১১৪।

৪৭৯. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২০৯।

৪৮০. ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং ১৫২১।

৪৮১. আল্লামা তাবারানী (র.), ***আল-মুজামুস সগীর***, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ খৃ., খ. ০১, পৃ. ১১৩, হাদীস নং ১৬২।

হজ্জ্ব করা। ৫. রমযানের রোজা রাখা।[৪৮২] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে ৪টি-ই ইবাদাত তথা অনুশীলনমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। তাই ইবাদাত সমূহকে রুটিন মোতাবেক কর্মসূচী বানিয়ে নিলে হিদায়াতের উপর টিকে থাকা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা খুবই সহজ হবে।

ইবাদাতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার লক্ষ্যে আত্মবিচারে অভ্যস্ত হওয়া উচিৎ, তা না হলে বাইরের কাঠামো সুন্দর হলেও তা অন্ত:সারশূন্যই থেকে যাবে। ইবাদাত হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। তাতে লৌকিকতা বা অন্য কোন জিনিষের সংমিশ্রন হলে তা ফলদায়ক হবে না। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ। অর্থাৎ তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, এটাই সঠিক দ্বীন তথা সঠিক পন্থা।[৪৮৩] সুতরাং বুঝা গেল অপরাধমুক্ত জাতি গঠনে ইবাদাতের বিকল্প নেই। বিশেষ করে নামাযের বিকল্প নেই; তাই মানবজাতিকে অপরাধমুক্ত এবং সফলকাম জাতিতে রূপান্তরিত করতে হলে ইবাদাতকে অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর নামায যেহেতু ইবাদাতের মূল সেহেতু তাকে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুতপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ হবে।

২. সত্যবাদিতা:

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। সত্যবাদীকে সবাই ভালবাসে। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়। রাসূল (স.) বলেন, "সত্য মানুষকে পুন্যের দিকে নিয়ে যায় আর পুন্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, ব্যক্তি সত্য কথা বলতে বলতে সিদ্দীকদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যায়"।[৪৮৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ। অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের সাথী হও।[৪৮৫] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "স্মরণ কর সে দিনের কথা যে দিন সত্যবাদিতা সত্যবাদীদের উপকারে আসবে, তাদের জন্য থাকবে জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ী থাকবে"।[৪৮৬] রাসূল (স.) বলেন, "তোমাদেরকে সত্য ব্যতীত অন্য কোন কিছু রক্ষা করতে পারবে না"।[৪৮৭] মোটকথা সততা যে কোন দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের সফলতার চাবিকাঠি। হিদায়াতের পথে চলতে গেলে এবং পাপাচার ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে সত্যবাদিতার বিকল্প নেই।

---

৪৮২. ইমাম বুখারী, ***বুখারী শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১; ইমাম তিরমিযী, ***তিরমিযী শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ০৫; ইমাম মুসলিম, ***মুসলিম শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৪৫ ।

৪৮৩. আল-কুরআন, ৯৮ : ৫।

৪৮৪. ইমাম বুখারী, ***বুখারী শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ২৫, হাদীস নং ৬০৯৪।

৪৮৫. আল-কুরআন, ৯ : ১১৯।

৪৮৬. আল-কুরআন, ৫ : ১১৯।

৪৮৭. ইমাম বুখারী, ***বুখারী শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১৭২, হাদীস নং ৩৪৬৫।

৩. উত্তম আচরণবিধি ও শৃঙ্খলার অনুসরন :

কোন ব্যক্তি ও জাতির অধ:পতন রোধের অন্যতম উপায় উপাদান হচ্ছে উন্নত আদর্শিক আচরণবিধি ও শৃঙ্খলা মেনে চলা। কেননা উন্নত আচরণবিধি এবং শৃঙ্খলাবোধ মানবজাতিকে বিনয়ী ও পরকালমুখী করে তোলে; পার্থিব জীবনে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনন্তজীবনের সাফল্য লাভের জন্য মানুষকে উপযোগী করে গড়ে তোলে। আচরণবিধি সুন্দর ও ভাল করার উপর ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার পথে আহবান করুন জ্ঞানের কথা ও উত্তম উপদেশবানী দিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।[৪৮৮] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ কখনও সমান নয়, তা দ্বারাই জবাব প্রদান করুন যা উৎকৃষ্ট, তখন দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৪৮৯] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.) এর কোমলতার প্রশংসা করে ঈমানদারগণকে উত্তম আচরণবিধি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ অর্থাৎ আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ব্যবহারকারী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তবে তারা আপনার থেকে দূরে সরে যেত।[৪৯০] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আচরণবিধি ও কোমল ব্যবহারের অধিকারী হওয়ার উপর জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং সফলতার জন্য ইহাকে খুবই জরুরী সাব্যস্ত করেছেন।

রাসূল (স.) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।[৪৯১] এখানে যবানের শালীনতা ও সৌন্দর্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে যে কোন ধরণের উশৃঙ্খলতা ও অনিষ্টতা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য তার যবান ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের জিম্মাদারী নিতে পারবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী নিলাম।[৪৯২] এ হাদীসেও যবানের হিফাজত বলতে ভাষার শালীনতা, কোমলতা, মাধুর্যতা ও সৌন্দর্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আচরণবিধি এমন যেন না হয় যাতে তার দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট পায়। আচরণবিধি সুন্দর না হলে এর পরিণতি কখনও কখনও খুব ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। যেমন রাসূল (স.) যখন পারস্যের বাদশাহ নওশেরওয়ার প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠালেন তখন নওশেরওয়া রাগের আতিশয্যে রাসূল (স.) এর চিঠিটিকে ছিড়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলল। পত্রবাহক ফেরত আসলে রাসূল (স.) জানতে চাইলেন নওশেরওয়া কী ধরণের আচরণ

---

৪৮৮. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫।

৪৮৯. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৪।

৪৯০. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯।

৪৯১. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ১০০, হাদীস নং ৬৪৭৪।

৪৯২. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১১, হাদীস নং ১০।

করেছে? পত্র বাহক ঘটনার বর্ণনা দিলে রাসূল (স.) বললেন, হে আল্লাহ নওশেরওয়া আমার চিঠিটিকে যতগুলো খণ্ড করেছে তুমি তার সাম্রাজ্যকে ঠিক ততভাগে খণ্ড বিখণ্ড করে দাও। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) এর বদদু'আ কবুল করে নেন এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। একসময় সমগ্র পারস্য মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়।

মানব জাতির সফলতা ও উন্নতির মূলে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। নিয়ম-শৃঙ্খলা বলতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ, নিষেধ ও নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলা এবং সকল কর্মকাণ্ড যথাযথ সম্পাদনের প্রতি ব্যক্তির সচেতনতা বুঝায়। কাজের সফলতার প্রথম এবং প্রধান সোপান হিসেবে কাজের পরিকল্পনা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের স্থান লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনা মোতাবেক কোন কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা করাই হল নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ। এগুলো ছাড়া কোন কাজ সফল হয় না। নিয়ম-শৃঙ্খলা বহির্ভূত কর্ম সম্পাদিত হলে ব্যক্তি, সমাজ তথা একটি জাতিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত ব্যক্তিস্বার্থে ও সামাজিক উন্নয়নকল্পে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা। কারণ এগুলো মানুষকে আদর্শ ও কর্মমুখী করে তোলার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আদর্শ দেশ ও জাতি গঠনে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার কোন বিকল্প নেই।

ইসলামে আনুগত্য, শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং শান্তিকে তাওহীদজাত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। এ আয়াতে আনুগত্য ও শৃঙ্খলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে হলে এ ধরণের আনুগত্য ও শৃঙ্খলার অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবন খুব একটা স্বাধীন নয়। পশ্চিমের কোন এক বিজ্ঞানী বলেছেনঃ Man is born free but everywhere he is in bondage. অর্থাৎ মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীন হয়ে, কিন্তু পদে পদে সে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ কথা চরম সত্য যে, মানুষের জীবনে এ সব আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে জীবন অচল হয়ে পড়ত।[৪৯৩]

ইসলাম ধর্মের সকল বিধানই শৃঙ্খলার নিয়ামক, বিশেষ করে নামাজ। কেননা নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ। নামাজের মধ্যে প্রত্যেক মুসল্লী শতভাগ গুরুত্বের সাথে ইমামের অনুসরণ করে এবং প্রত্যেকটি কমান্ড মেনে চলে, কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না। কেননা ইমামের অনুসরনের ব্যত্যয় ঘটলে পূর্ণ নামাজই বিনষ্ট হয়ে যায়। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, ছোট-বড়, আরব-অনারব সবাই এক কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর"। এ যেন শৃঙ্খলার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এমনিভাবে রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটি বিধানই বান্দাকে নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত করে তোলে। যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আরো বেশী প্রয়োজন। শৃঙ্খলা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ জয়লাভ করতে পারে

৪৯৩. ড. কাজী দ্বীন মুহম্মদ, ***জীবন সৌন্দর্য,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ আগস্ট ১৯৮২ খৃ., যিলকদ ১৪০২ হি., পৃ. ৭৯।

না। ইসলামের সকল যুদ্ধে কেবলমাত্র কঠোর শৃঙ্খলার কারনেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ওহুদের যুদ্ধে শৃঙ্খলার একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল, রাসূল (স.) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন সাহাবীকে একটি গিরিপথ পাহারাদারির দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যুদ্ধে জয় হোক আর পরাজয় হোক কোন অবস্থাতেই এই গিরিপথ ছাড়া যাবে না। কিন্তু তারা যুদ্ধে বিজয় হয়ে গেছে দেখে পাহারাদারিকে গুরুত্বহীন মনে করে সে গিরিপথ ছেড়ে গণীমতের মাল সংগ্রহে চলে যান। ফলশ্রুতিতে এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে। তাই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা-ই একটি জাতির সফলতার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে পরিগণিত।

এছাড়াও সৃষ্টির অস্তিত্ব ও ভিত্তি নির্ভর করে এ শৃঙ্খলার উপর। বিশ্বপ্রকৃতির কোন কিছুই বিশৃঙ্খল নয়। সবকিছুতেই একটি শৃঙ্খলা ও নিয়মের বন্ধন লক্ষ করা যায়। সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্র আপন আপন গতিতে চলছে। কোন কিছুই নিয়মের ব্যতিক্রম করছে না। যেমন চন্দ্র ও সূর্য আপন আপন গতিতে নিজস্ব কক্ষপথে পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে চলছে। দিবা-রাত্রি যথানিয়মে চলমান রয়েছে। সূর্য কখনও চন্দ্রকে ধরে ফেলে না এবং রাত্রি কখনও দিনকে অতিক্রম করে না। এমনিভাবে আমাদের দেশে রাস্তায় গাড়ী চলে বাম পাশ দিয়ে। প্রত্যেকে ক্রসিং করার সময় তার বাম পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে। এখন যদি কোন গাড়ির চালক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ডান পাশ দিয়ে রাস্তা ক্রস করে তাহলে নির্ঘাত দুর্ঘটনা ঘটবে এবং যাত্রীরা মারা যাবে। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৪. ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা :

ন্যায়বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে সকল যুগে ও সকল সমাজে ন্যায়-বিচার অনস্বীকার্য। ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়-বিচারের ঘাটতির কারণে স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ, লোভ ইত্যাদি পেয়ে বসে, এর ফলে সামাজিক জীবনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বৃদ্ধি পায়। ন্যায় বিচারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি স্থাপিত হয়, সমাজ অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি লাভ করে এবং অরাজকতার বিলুপ্তি ঘটে। অনেক সময় আমাদের মানব সমাজে অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি দৃষ্টিগোচর হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে মজলুম মানবতা মুক্তির দিশা পাবে। অন্যথায় অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি প্রভৃতি আরো বাড়তে থাকবে। মজলুম মানবতার আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাশ ভারী হয়ে উঠবে। জুলুমের অন্ধকারের ঘোর অমানিশায় ছেয়ে যাবে সারা পৃথিবী। যে কারণে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক বিশ্বে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিশ্ববাসীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমানতসমূহ তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দিতে এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে তোমরা ফয়সালা করবে তখন নিরপেক্ষ ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা কর; আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা ভাল কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।[৪৯৪] আল-

[৪৯৪]. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮।

কুরআনে আরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং সত্য সাক্ষ্য দান কর, তাতে যদি নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়াবান। বিচারের সময় কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি বিকৃত কর কিংবা পাশকাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।[৪৯৫] হযরত আলী (রা.) বলেন, দোযখে পর্বত সমান সর্প ও উষ্ট্রসমান বিচ্ছু রয়েছে। যে শাসক প্রজাবৃন্দের উপর ন্যায় বিচার না করে, এ সমস্ত সর্প ও বিচ্ছু তাদের আগমনের প্রতীক্ষা করতেছে।[৪৯৬]

রাসূল (স.) বলেছেন, عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তিগুলোর মধ্যে কোন একটি শাস্তি কার্যকর করা আল্লাহ্র এ জনপদ সমূহে চল্লিশদিন বৃষ্টি হওয়ার তুলনায় অধিক কল্যাণকর।[৪৯৭] ন্যায়পরায়নতার গুরুত্ব এত বেশী যে, ইসলাম ন্যায়পরায়নতার বাণী উচ্চারণকে সর্বোত্তম জিহাদ বলে ঘোষণা করেছে। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ অর্থৎ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।[৪৯৮] সুতরাং বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা অনস্বীকার্য। ন্যায়বিচার ব্যহত হলে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলে দুনিয়াতে যেমন অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জলতে থাকে তেমনি মাজলুমের আর্ত চিৎকারে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। তখন আল্লাহ তা'আলা মজলুমের দু'আ কবুল করে নেন এবং অত্যাচারী জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সর্বোত্তম বিচারক।

৫. দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন :

দুনিয়ার জীবনে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কতগুলো দণ্ডবিধি প্রদান করেছে। এ দণ্ডবিধিগুলো বাস্তবায়ন করতে

---

৪৯৫. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫।

৪৯৬. মূল: হযরত ইমাম গায্যালী (র.), ***সৌভাগ্যের পরশমণি***, অনু. আবদুল খালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম (ইফাবা চতুর্থ) সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, পৌষ ১৪১০, যিলকদ ১৪২৪, খ. ০২, পৃ. ৯০।

৪৯৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৮৪৮, হাদীস নং ২৫৩৭; আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, ***সুনানুন নাসাঈ***, মাকতাবুল মাতবূআত আল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬ হি., ১৯৮৬ খৃ., খ. ০৮, পৃ. ৭৬, হাদীস নং ৪৯০৫।

৪৯৮. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭১, হা. নং ২১৭৪; ইমাম আবূ দাউদ, ***সুনানু আবী দাউদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১২৪, হাদীস নং ৪৩৪৪; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৩২৯, হা. নং ৪০১১; ইমাম নাসায়ী, ***সুনানুন নাসাঈ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ১৬১, হা. নং ৪২০৯।

পারলে দুনিয়াতে অপরাধপ্রবণতা কমবে; সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গড়ে উঠবে একটি সোনালী পৃথিবী। মানুষ খুজে পাবে মুক্তির উপায়। এসব দণ্ডবিধির কতিপয় নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. হত্যার কিসাস : কোন মানুষ যদি অপর কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে কিংবা কোন অঙ্গহানি করে তবে ইসলাম সেজন্য কিসাস এর বিধান প্রচলন করেছে। অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা এবং অঙ্গহানির বিনিময়ে অঙ্গহানি। যেমন কুরআনের বানী: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর হত্যার কিসাস ফরয করা হয়েছে, স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, গোলামের বিনিময়ে গোলাম, নারীর বিনিময়ে নারী"।[৪৯৯] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "আমি তাদের উপর আত্মার বিনিময়ে আত্মা, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের কিসাস ফরয করে দিয়েছি"।[৫০০]

খ. ব্যভিচারের দণ্ড : বর্তমান পৃথিবীতে ব্যভিচার খুব তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, জনসমাগমেও আজ এ ঘৃণ্য অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। মানুষ ব্যভিচার করে জনসমাজে তা প্রচার করে গর্ববোধ করছে। ধ্বংসপ্রায় এ জাতির লাগাম টেনে ধরতে ইসলামী দণ্ডবিধির বিকল্প নেই। ইসলাম এ ক্ষেত্রে দুটি দণ্ড আরোপ করেছে। ১. ব্যভিচারী পুরুষ এবং নারী যদি বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি হল একশত বেত্রাঘাত। যেমন কুরআনের বানী, "ব্যভিচারী নারী এবং পুরুষকে তোমরা একশত করে বেত্রাঘাত কর। তাদের শাস্তি প্রদানে তোমাদেরকে যেন কোন দয়া পেয়ে না বসে"।[৫০১] ২. ব্যভিচারী পুরুষ এবং নারী যদি বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি হল রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা। যেমন কুরআনের বাণী, "বিবাহিত নারী এবং পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা কর"।

গ. ব্যভিচারের অপবাদের দণ্ড : সতী সাধ্বী কোন নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া অত্যন্ত জঘন্যতম একটি অপরাধ। এর শাস্তি হল আশি বেত্রাঘাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা সতী সাধ্বী নারীদের উপর (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয় অতঃপর চার জন সাক্ষী আনয়ন করতে না পারে তোমরা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করো না, কেননা এরা পাপাচারী"।[৫০২]

ঘ. মাদকের শাস্তি : মদ হল সকল পাপের উৎস। মাদকদ্রব্য মানবজাতির মূল চালিকাশক্তিকে বিনাশ করে দেয়। মদ মূলত একটি শয়তানী কর্মকাণ্ড। 'মাদকের দ্বারা শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়'।[৫০৩] ইসলামী শরীয়তে মদের শাস্তি হল ৮০ বেত্রাঘাত। রাসূল (স.) মদপানকারীকে বেত্রাঘাত করেছেন।[৫০৪]

ঙ. চুরির দণ্ড : চুরি একটি জঘন্য অপরাধ। এতে মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কখনও কখনও এর দ্বারা জানের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়। চোর যখন ধরা পড়ে যাওয়ার উপক্রম দেখা দেয় তখন সে

---

৪৯৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮।

৫০০. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫।

৫০১ . আল-কুরআন, ২৪ : ২।

৫০২ . আল-কুরআন, ২৪ : ৪।

৫০৩ . আল-কুরআন, ৫ : ৯১।

৫০৪ . ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং ৬৭৮০।

নিজে বাঁচার জন্য মালিককে আক্রমন করে বসে। ইসলামে চোরের শাস্তি হল হাত কেটে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি"।[৫০৫]

চ. ডাকাতির দণ্ড : ডাকাতি চুরি থেকে আরও জঘন্য অপরাধ। কেননা মানুষ চুরি করে গোপনে আর ডাকাতি, ছিনতাই ও লুটপাট করে প্রকাশ্যে। ইসলামে ডাকাতির চার ধরনের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। হত্যা, শুলে চড়ানো, হাত-পা কেটে দেয়া ও দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া।[৫০৬] বিচারক ডাকাতের আপরাধের মাত্রা অনুপাতে এ চারটির যে কোন একটি শাস্তি প্রদান করবেন।

৬. হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জন :

হালাল শব্দের অর্থ বিধিসিদ্ধ, বৈধ, জায়েজ, বিধি সম্মত, আইন সঙ্গত। শরীয়তের পরিভাষায়, শরীয়ত প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন বা যা করতে নিষেধ করেননি এমন বস্তু হল হালাল। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে হালাল রুজির অন্বেষণ করা একান্ত কর্তব্য। কেননা হালাল ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ ব্যতীত অবৈধ সম্পদ ভক্ষন করলে তার কোন ইবাদাত খোদ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। হযরত সহল তসতরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে, সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, তার সমস্ত শরীর পাপে জড়িত হয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি হালাল ভক্ষণ করে, তার সর্বাঙ্গ ইবাদাতে মগ্ন থাকে এবং নেক কাজ করার শক্তি সর্বদা তার অনুকূলে ও সহায়ক হয়। [৫০৭]এজন্য হালাল পন্থায় উপার্জন করা উত্তম নৈতিক চরিত্রের ফল্গুধারা। কারণ, একজন মু'মিন কোন অবস্থাতেই হারাম পন্থায় উপার্জন করতে পারেন না। হারাম উপার্জন মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয়। দৈহিক বৃদ্ধি পেলেও নৈতিক তথা আত্মিক দিক থেকে সে ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে, ধ্বংস হতে থাকে তার সকল ইবাদাত বান্দেগী। সমাজে সে হয়ে যায় ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত। পক্ষান্তরে হালাল ভক্ষণকারী ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত হয়। সে সমাজ ও জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত হারামকে বর্জন করে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, অর্থাৎ হে মানব মন্ডলী! তোমরা যমীনের মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৫০৮] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, يايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون- অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদাত কর।[৫০৯] রাসূল (স.) বলেছেন, عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ

---

[৫০৫]. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮।

[৫০৬]. আল-কুরআন, ৩ : ৩৩; আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতবিাতুল কাহেরাহ, প্রকাশ ১৩৮৮হি, ১৯৮৮ খৃ., খ. ০৯, পৃ. ১৪৪।

[৫০৭]. মূল: হযরত ইমাম গাযযালী (র.), *সৌভাগ্যের পরশমণি*, অনু: আবদুল খালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম (ইফাবা চতুর্থ) সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, পৌষ ১৪১০, যিলকদ ১৪২৪, খ. ০২, পৃ. ৯১।

[৫০৮]. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮।

[৫০৯]. আল-কুরআন, ২ :১৭২।

اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه অর্থাৎ হযরত মিকদাম (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন: মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আ.) আপন হাতের উপার্জন হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন।[৫১০]

আল্লাহ তা'আলা হারাম বিষয়সমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ তিনি তো তোমাদের ওপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী বা অভ্যস্থ না হয়ে বরং নিরুপায় হয়েছে, তার জন্যে তাতে গুনাহ্‌ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াবান।[৫১১] রাসূল (স.) বলেছেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا অর্থাৎ নিশ্চয় রাসূল (স.) বলেন মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার জায়েজ নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে করে দেয় হালাল। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোন শর্ত মানা যাবে না, যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে করে দেয় হারাম।[৫১২] মহানবী (স.) বলেন, وَعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيف অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় কিনল আর উহার মধ্যে কোন না কোন ভাবে একটি হারাম দিরহাম প্রবিষ্ট হল তবে যতক্ষণ তার ব্যবহারে ঐ কাপড়টি থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার কোন নামায (ইবাদাত) কবুল করবেন না। অতঃপর তিনি তার দুই কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে বলেন কান দুটি বধির হয়ে যাক যদি আমি ইহা রাসূল (স.) কে বলতে না শুনি।[৫১৩] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যদি নামায পড়তে পড়তে কুঁজো হয়ে যাও এবং রোযা রাখতে রাখতে কেশের ন্যায় ক্ষীণ হয়ে পড় তথাপি হারাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত এ রোযা-নামাযে কোন ফল পাবে না এবং উহা কবূলও হবে না।[৫১৪] বান্দাকে যেসমস্ত হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকতে হবে তার কতিপয় নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

---

৫১০. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৫৭।

৫১১. আল-কুরআন, ২ : ১৭৩। এছাড়া হালাল-হারাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ৬:১১৮,১১৯ ; ৬৬:১ ; ৭:৩৩।

৫১২. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৬২৬, হাদীস নং ১৩৫২।

৫১৩. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** খ.০১ ও ১০, পৃ. ৭১ ও ২৪, হাদীস নং ১৪ ও ৫৭৩২ প্রাগুক্ত।

৫১৪. মূল: হযরত ইমাম গায্‌যালী (র.), ***সৌভাগ্যের পরশমণি***, অনু: আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৯০।

ক. সুদ : বর্তমানে গোটা পৃথিবীর অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক। আমাদের বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ এ সুদ প্রথা ধনীকে আরও ধনী বানায় আর দরিদ্রকে আরও নিঃস করে দেয়। দরিদ্ররা সুদের করালগ্রাসে নিঃস হয়ে একসময় ভিটে বাড়ী ছাড়া হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সুদকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। আল-কুরআনে এসেছে, "আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম"।[৫১৫] অথচ অধিকাংশ মানুষ সুদকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা বলে, ব্যবসা আর সুদতো একই রকম।[৫১৬] সুদি ব্যবস্থায় মানুষ কর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে যায়, তারা পুঁজি নির্ভর হয়ে পড়ে। পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে বসে বসে খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুদি উপার্জনের অনেক ভয়াবহতার কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, সুদের ৭০টি গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ হল মায়ের সাথে যিনা করার সমান।[৫১৭] এছাড়াও রাসূল (স.) সুদখোর, সুদ দাতা, সুদি কারবারের লিখক ও দুই সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন।[৫১৮]

খ. ঘুষ : ঘুষ একটি দেশের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দেয়। ঘুষ লেনদেনের কারণে অনেক অবৈধ কাজ সিদ্ধ হয়ে যায় আবার অনেক বৈধ প্রাপক তার হক বুঝে পায় না। ইসলামী শরীয়ত ঘুষ লেনদেন সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূল (স.) বলেছেন, ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী।[৫১৯] অন্য বর্ণনায় আছে, ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।

গ. জুয়ার আয় : জুয়া ইসলামী শরীয়তে হারাম। তাই জুয়া থেকে যে অর্থ উপার্জন হবে সেটাও হারাম। আল্লাহ তা'আলা জুয়াকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে "মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো শয়তানের কাজ সুতরাং তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর"।[৫২০]

ঘ. গান বাজনা ও মডেলিংয়ের উপার্জন : ইসলামি শরীয়তে নাচ-গান, বাজনা, মডেলিং ইত্যাদি হারাম। সুতরাং এগুলোর থেকে যে উপার্জন হয় সেগুলোও হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে গোমরাহ করার জন্য খেল তামাশা কিনে আনে"।[৫২১] রাসূল (স.) বলেন, "তোমরা নর্তকী বেচা-কেনা করো না এবং নাচ-গান শিক্ষা দিও না, এ ব্যবসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, এগুলোর উপার্জন হারাম"।[৫২২]

একদিন হযরত লোকমান হেকীম এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, খোদার গোটা সৃষ্টিকূল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার কথা শোনার জন্য দূর দূরান্ত

---

৫১৫. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫।

৫১৬. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫।

৫১৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৭৬৪, হাদীস নং ২২৭৪।

৫১৮. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৭৬৪, হাদীস নং ২২৭৭।

৫১৯. আবু বকর আহমদ ইবনে আমর আল বায্যার, ***মুসনাদুল বায্যার***, মুহাক্কিক: মাহফুযুররহমান ও আদিল বিন সাদ, মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮-২০০৯ খৃ., খ. ০৩, পৃ. ২৪৭।

৫২০. আল-কুরআন, ৫ : ৯০।

৫২১. আল-কুরআন, ৩১ : ০৬।

৫২২ . ইমাম তিরমিযী, ***জামে তিরমিযী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৫৭১।

থেকে এসে জমায়েত হয়? তখন হযরত লোকমান হেকীম বলেন এমন কতগুলো কাজ আছে যেগুলো আমাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো হল এই: নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা ও মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।[৫২৩]

মোটকথা একজন মানুষ যখন হালাল উপার্জন করাকে নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নিবে এবং হারাম ভক্ষণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে তখন সে দুর্নীতি করবে না, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না, লুটতরাজ করবে না, ওজনে কম দিবে না। সে সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকবে, গরীব দুঃখীদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখবে। তাদেরকে যাকাত ও নফল সদকা প্রদান করবে। এভাবে সে ইহকালে আযাব ও গযব থেকে মুক্ত থাকবে এবং পরকালেও নাজাতপ্রাপ্ত হবে।

৫ম পরিচ্ছেদ
চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধিকরণ

১. কুরআন-হাদীস অধ্যয়নঃ

মানবজাতিকে সফলতা অর্জন করতে হলে এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে কলুষতামুক্ত চিন্তা চেতনা ধারণ করা খুবই জরুরী। চিন্তা চেতনার পরিশুদ্ধিকরণ ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন যথাযথ হওয়া আবশ্যক। আধুনিক নব্য দর্শন ও জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় দ্বীনি শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রদীপ হাতে না নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে এক কদম পথও অতিক্রম করা সম্ভব নয়, করতে গেলে পথভ্রষ্ট হয়ে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জাহানে ধ্বংসে পর্যবষিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا অর্থাৎ যে বিষয়ে আপনার নিকট জ্ঞান নেই তার উপর আপনি নির্ভর করবেন না। নিশ্চয় শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং অন্তর প্রত্যেক জিনিষই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[৫২৪] তিনি আরও বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা আর কে অধিকতর জালিম হতে পারে? যে অজ্ঞতার কারণে মানুষকে গোমরাহ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।[৫২৫] তিনি অন্যত্র বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে

---

৫২৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৬।

৫২৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

৫২৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৪৪।

ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণ করে।[৫২৬] বুঝা গেল, অজ্ঞতা আর মুর্খতার ভেতরে ডুবে থেকে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। মুর্খতার দেয়াল ভেদ করে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে-ই জীবন চলার পথে এগুতে হবে। আর জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হল আল-কুরআন। যাতে রয়েছে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করার এবং পারলৌকিক জীবনে মুক্তি লাভ করার বিস্তারিত জ্ঞানভাণ্ডার। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি সকল জিনিষের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এবং হিদায়াত, রহমত ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে।[৫২৭] আর হাদীস হচ্ছে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। মহানবী (স.) তার কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতি দ্বারা পবিত্র কুরআনকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই জ্ঞান অর্জন করতে হলে কুরআন এবং হাদীস থেকে-ই করতে হবে। অপরদিকে কেউ যদি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে কুরআনুল কারীমকে উপেক্ষা করে চলে তবে তার জ্ঞান হবে ত্রুটিযুক্ত এবং পরকালে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি । যেমন কুরআনের বাণী, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবিকা (কবরের আযাব) আর আমি কিয়ামতের দিবসে তাকে অন্ধ করে তুলব।[৫২৮]

ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জ্ঞানের এ দুটি মূল উৎস তথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহ অধ্যয়ন খুবই জরুরী। পাশা-পাশি যে সকল বই পুস্তক কুরআন হাদীস বুঝার ব্যাপারে সহায়ক সেগুলোও নিয়মিত অধ্যয়ন করা উচিৎ।[৫২৯] আল্লাহ্ তা'আলা, বিশ্বজাহান, মানুষের কর্তব্য, ব্যক্তি ও সমষ্টির সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের মূলনীতি, মানব জীবনের শেষ পরিণতি প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান আহরণের জন্যে গভীর মনোযোগ ও গবেষকের মন নিয়ে কুরআন হাদীস অধ্যয়ন করা দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ। অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।[৫৩০] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কুরআন শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন তারপর মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছেন। তাতে বুঝা যায় যে, কুরআনের শিক্ষা ছাড়া কেউ মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয় না, যদিও সে বাহ্যিকরূপে মানুষ হয়ে থাকে। কেননা মানুষ হয়েও যারা সত্য মিথ্যার তারতম্য করতে পারে না, হক বাতিলের পার্থক্য করতে পারে না, যাদের অন্তর বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করে না তাদের মধ্যে আর চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; বরং পবিত্র কুরআনে তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু থেকেও আরও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا

---

[৫২৬]. আল-কুরআন, ২২ : ৩।

[৫২৭]. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯।

[৫২৮]. আল-কুরআন, ২০ : ১২৪।

[৫২৯]. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস,*** ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭ খৃ., পৃ. ১৯।

[৫৩০]. আল-কুরআন, ৫৫ : ১-৪।

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ অর্থাৎ আমি অনেক জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করে রেখেছি। তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তারা তা দ্বারা অনুধাবন করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ অছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনে না। এরা চতুস্পদ জানোয়ারের মত; বরং তার থেকেও আরও নিকৃষ্ট। বস্তুত এরা অমনোযোগী।[৫৩১]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ অর্থাৎ ঈমানদার লোকদের সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়া সঙ্গত নয়, সুতরাং এরূপ কেন হল না? যে, প্রত্যেক বড় দল হতে ক্ষুদ্র একটি দল বের হয়ে আসত ও দ্বীনের বুঝ (জ্ঞান) লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত, যেন তারা বিরত থাকতে পারে।[৫৩২] নবী করীম (স.) বলেছেন, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনল, তা সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করল, মনে রাখল এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছে দিল আল্লাহ্ তাঁর এ বান্দাহকে সতেজ (উৎফুল্ল) রাখবেন। কখনও কখনও এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তি পরোক্ষভাবে শুনেছে সে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক বুঝদার হয়।[৫৩৩]

এ পৃথিবীতে সফলকাম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে পরিশুদ্ধ চিন্তা চেতনা ধারণ করা অতীব জরুরী। পরিশুদ্ধ চিন্তা চেতনা ধারণ করা নির্ভুল জ্ঞান ব্যতীত কখনও সম্ভব হয় না, আর নিভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য জরুরী কুরআন ও হাদীসের যথোপযুক্ত অধ্যয়ন। কুরআন ও হাদীসের আদর্শকে অন্তরে ধারণ করতে পারলে চিন্তা চেতনা পরিশুদ্ধ হবে, অন্তর কলুষ্মুক্ত হবে। অন্তরকে কলুষতামুক্ত করতে না পারলে দুনিয়াতে যেমন বিপদের আশংকা রয়েছে তেমনি পরকালেও রয়েছে ভয়াবহ বিপদ। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, – يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ – إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ অর্থাৎ স্মরণ কর সে দিনের কথা, যে দিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিষ্কলূষ অন্তর নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয় উহা তার কাজে লাগবে।[৫৩৪]

---

৫৩১. আল-কুরআন, ৭ : ১৭৯।

৫৩২. আল-কুরআন, ৯ : ১২২, এছাড়া এসম্পর্কে আরো বলা হয়েছে আল-কুরআন, ৯৬:১-৫; ৫৮:১১; ১৩:১৬,১৯; ৩৯:৯; ২০:১১৪।

৫৩৩. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৩৪, হাদীস নং ২৬৫৮; ইমাম আবূ দাউদ, ***সুনানু আবী দাউদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৩২২, হাদীস নং ৩৬৬০; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৮৬, হাদীস নং ২৩৬।

৫৩৪. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৮-৮৯।

২. ধৈর্যের মানসিকতা পোষণ করাঃ

ধৈর্য মানে সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, উদারতা ইত্যাদি। ধৈর্য এমন একটি গুণ যার অনুশীলন করলে অন্যান্য মানবীয় গুণের বিকাশ সাধন সহজ হয়। ধৈর্য শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল বাধা দেয়া, বিরত থাকা, বেঁধে রাখা, সহিষ্ণুতা, ভারসাম্যতা, আত্মসংযম, অটল-অবিচল থাকা, অধ্যবসায়, বীরত্বের সাথে টিকে থাকা ইত্যাদি। আর পারিভাষিক অর্থে ধৈর্য হল, যে কোন অবস্থায় যুগের পরিবর্তিত পরিবেশে নিজের মন মেজাজকে পরিবর্তন না করা এবং সর্বাবস্থায় এক সুস্থ ও যুক্তিসংগত আচরণ রক্ষা করে চলা।[৫৩৫] ইসলামে ধৈর্যশীলতার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। ইসলাম সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্ম। কাজেই এর মধ্যে উদারতা, মহানুভবতা ও ধৈর্য এ সবের স্থান খুব উচ্চে। পরমত সহিষ্ণুতা আর পরধর্মের সার্থ রক্ষা করা ইসলামের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়। ইসলামে সহনশীলতার সার্বজনীন দিকটি যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে তা সব দেশের সব জাতির জন্য অনুকরণীয়।[৫৩৬] তবে পরমত সহিষ্ণুতার উপর ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করা ইসলামের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে স্বীকৃত। মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের প্রতি আস্থা রাখা, নিজের মতামতের উপর অবিচল থেকে অন্যদের মতামতের উপর গুরুত্ব দেয়া, স্বীয় আবেগ ও প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখা, কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায় দৃঢ় ও অটল থাকা, সত্যের পথে বিপদ আপদকে সহ্য করা প্রভৃতি সহনশীলতা ও ধৈর্য্যশীলতার মধ্যে পরিগণিত।

পৃথিবীতে সফলকাম ও সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে বহু ঘাত প্রতিঘাত মুকাবিলা করতে হয়, যা মুকাবিলা করতে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। আর ধৈর্য ছাড়া যে কোন জটিল পরিস্থিতি সফলভাবে মুকাবিলা করা যায় না। কারণ ধৈর্য হল সফলতার চাবিকাঠি। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৫৩৭] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) কে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا অর্থাৎ অতএব (হে মুহাম্মদ) আপনি সবরে জামীল অবলম্বন করুন।[৫৩৮] পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ। অর্থাৎ তুমি কেবল তাই অনুসরণ কর, যা অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর সবর অবলম্বন করতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন।[৫৩৯] মহানবী (স.) তার পবিত্র যবানীতে বলেছেন, عن ابى سعيدن الخدرى رضـ قال قال رسول الله صلعم ..... ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر- অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ

---

[৫৩৫]. অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, ***কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন,*** বাংলাবাজার, ঢাকা: ভূঁইয়া প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ ২০০৫ খৃ., খ. ০২, পৃ. ২৩।

[৫৩৬]. কাজী দ্বীন মুহম্মদ, ***জীবন সৌন্দর্য,*** ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ আগস্ট ১৯৮২, পৃ. ৩৫-৩৬।

[৫৩৭]. আল-কুরআন ২:১৫৩, ৪৫।

[৫৩৮]. আল-কুরআন, ৭০ : ৫।

[৫৩৯]. আল-কুরআন, ১০ : ১০৯; এছাড়া এসম্পর্কে আরো বলা হয়েছে আল-কুরআন, ১১:৪৯; ২:৪৫,২৪৯; ৮:৪৫, ৪৬,৬৫; ৪৬:৩৫; ৬৮:৪৮; ৩:২০০; ১৬:১২৬-১২৭; ৪০:৫৫,৭৭।

(স.) বলেছেন, ...যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি।[৫৪০] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, মুমিন নর-নারীর ওপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে; কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার সম্পদ বিনষ্ট হয়। এ সকল মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার ফলে তার কলব পরিস্কার হতে থাকে এবং পাপ পঙ্কিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিস্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়।[৫৪১]

দয়া-মায়া, কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা প্রভৃতি মুমিন চরিত্রের গুণ হিসেবে স্বীকৃত এবং মুমিনের অলংকারও বটে। তাই কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায় স্বীয় আবেগ উচ্ছাস দমন করা, প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও না নেয়া হল সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। পরমত সহিষ্ণু হওয়ার জন্যে ধৈর্য ও সহনশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ তা'আলার একটি সিফাত হল সহনশীলতা, নবী-রাসূলগণের মধ্যেও এ গুণটি বিদ্যমান ছিল। অতএব, ধৈর্য ও সহনশীলতা মানব চরিত্রের অন্যতম গুণ, যা মানুষকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে এবং পৃথিবীতে যে কোন আযাব-গযব ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। পৃথিবীতে যারাই উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। এ পৃথিবীতে জীবন চলার পথে বহু ঘাত প্রতিঘাত, বাধা বিপত্তি ও বিপদ আপদ আসতে পারে। এগুলো অত্যন্ত ঠাণ্ডামাথায় ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরিচয় দিতে না পারলে দুনিয়াতেও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরকালেও থাকবে কঠিন আযাব। সুতরাং যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে অস্থির না হয়ে তা ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করার মন মানসিকতা পোষণ করতে হবে। তাহলে মনোবল ঠিক থাকবে এবং চিন্তা চেতনা পরিশুদ্ধ থাকবে। ফলে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে আরোহন করা যাবে এবং ধ্বংস থেকে বাঁচা যাবে।

৩. নৈতিক চরিত্র গঠন :

মানুষ আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্র, গুণাবলী এবং কর্মের মধ্যে নিহিত। ইসলাম একটি সর্বজনীন ও মানবকল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অন্যায় অত্যাচার, ফেতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, দুর্নীতি, অনিয়ম তথা সকল প্রকার পাপাচার উৎখাত করে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠন করতে ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে। মানব সমাজ থেকে যাবতীয় অপকর্ম ও অনাচার বিদূরিত করে মানব জাতিকে নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেয়ার জন্যে আসমানী কিতাব নিয়ে অসংখ্য মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে। মানব জীবনে নৈতিক চরিত্রই প্রধান বিষয়, যা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে। নৈতিক চরিত্র বলতে শুধু মানুষের আমল আখলাককেই বুঝায় না; বরং ব্যাপক অর্থে মানবীয় সকল কর্মকাণ্ডই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুশিক্ষা মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যে মূলত সে শিক্ষাই সবচেয়ে

---

৫৪০. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ: ১২২।

৫৪১. ইমাম তিরমিযি, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ: ৬০২, হাদীস নং ২৩৯৯।

অকাট্য ও প্রয়োজনীয়, যা মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তার রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে প্রদান করেছেন। বস্তুত এ শিক্ষার দ্বারাই মানব জাতির আত্মিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি সাধন হয়। তাই মানব জাতির জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী তথা চরিত্রই হচ্ছে একমাত্র অনুসরণীয়।[৫৪২] কেননা এ পৃথিবী তার থেকে উত্তম কোন চরিত্রবান মানুষ দেখেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখবেও না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি (মুহাম্মদ সা.) সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।[৫৪৩] রাসূল (স.) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مكارم الْأَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি উত্তম ও মহৎ চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যে প্রেরিত হয়েছি।[৫৪৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।[৫৪৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا অর্থাৎ তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, যার নৈতিক চরিত্র সবচাইতে সুন্দর।[৫৪৬] মূলত নৈতিক চরিত্র হলো এমন এক শক্তি, যা মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি ও মানবীয় উচ্চাকাঙ্খা পূরণে বৈধ-অবৈধতা নির্দেশ করে এবং তাকে বৈধ-অবৈধতার সীমা রেখার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখে। নৈতিক চরিত্র-ই কেবল মানব সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথকে উন্মুক্ত করে। যার ফলে এক চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্তার সন্তুষ্টি অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। অপর দিকে মানুষের নৈতিক চরিত্র যখন ব্যপকভাবে বিনষ্ট হতে থাকে আর এর থেকে উত্তরণের কোন উপায় অবলম্বন করা না হয় তখন তারা ধীরে ধীরে আদর্শচ্যুত হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। তাই উত্তম চরিত্র মাধুরী অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। বস্তুত মানুষ কখনো সফলতার স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে না। কেননা তারা পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে আল্লাহ কতৃক নির্বাচিত মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আর্দশকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারলে একটি জাতি সফল ও অবক্ষয়মুক্ত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে।

৪. লোভ-লালসা পরিহার করা :

লোভ-লালসা বা উচ্চাকাঙ্খা মানুষের জন্মগত স্বভাব, যদিও এটা ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষ যত পায় ততই চায়। সমাজে বা পৃথিবীতে মানুষের আকাঙ্খা অসীম, কিন্তু তা পূরণের পন্থা বা সম্পদ সীমিত। যার ফলে মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। সে নিজের মধ্যে বিভিন্ন জিনিষ লাভের আশা সঞ্চার করতে থাকে। পার্থিব জীবনের এই লোভী স্বভাব তার পারলৌকিক জীবনের শান্তির পথে চরমভাবে বাধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু সে তা জানে না। মানুষের মধ্যে সাধারণত পদের লোভ, মান সম্মানের লোভ ও সম্পদের লোভ এ তিনটি বিষয় খুব প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে যদি সে নিয়ন্ত্রন করতে না পারে তবে তার ধ্বংস অনিবার্য। তাইতো বলা হয় লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। ইসলামী শরীয়তে কোন

---

[৫৪২]. আল-কুরআন ৩৩:২১; সাইয়েদ হামেদ আলী, ***ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?*** অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৫ম মুদ্রণ, জুলাই-২০১৩ খৃ, পৃ. ৭৬।

[৫৪৩]. আল-কুরআন, ৬৮ : ৪।

[৫৪৪]. ইমাম মালিক, ***মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক,*** মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি., ৫ম খ., পৃ. ৩৮২।

[৫৪৫]. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৯৪; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৫৯।

[৫৪৬]. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০৬।

পদ চেয়ে নেয়া বৈধ নয়। যদি কোন পদ সর্বসম্মতিক্রমে দেয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে, কারণ তাতে কল্যাণ রয়েছে। আর যদি চেয়ে নেয়া হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, **عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلعم لاتسئل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها**- অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাকে বললেন: তুমি নেতৃত্বের পদ প্রার্থনা করো না। কারণ, তুমি যদি তা চেয়ে নাও তবে তোমাকে ঐ পদের ভার দেয়া হবে। (এবং দায়িত্ব পালনে তুমি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।) আর যদি প্রার্থনা ছাড়াই তোমাকে ঐ পদ দেয়া হয় তবে তুমি ঐ পদের দায়িত্ব পালনে (আল্লাহ্র) সাহায্য প্রাপ্ত হবে।[৫৪৭] রাসূলুল্লাহ (স.) অন্যত্র বলেছেন, **عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ** অর্থাৎ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চেয়ে নেয়, তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। আর যাকে এ পদ গ্রহনে বাধ্য করা হয় তাকে সঠিক পথে চালনার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা পাঠান।[৫৪৮] রাসূল (স.) আরো বলেছেন, **عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار** অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: কোন ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থনা করল এবং তা পেয়ে গেল, অতঃপর তার ন্যায়বিচার তার স্বৈরাচারের উপর বিজয়ী হলে তার জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে যার স্বৈরাচার নিজের ন্যায় বিচারের ওপর বিজয়ী হবে তার জন্য দোযখ। [৫৪৯]

এমনিভাবে সম্মানের লোভ ও সম্পদের লোভ সবগুলোই বান্দার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের একটি মজ্জাগত স্বভাব হল সে নিজেকে সম্মানিত মনে করে এবং সে চায় সকলে তাকে সম্মান করুক। কিন্তু সম্মানের মূল চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।[৫৫০] আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তার ব্যাপারে জিবরাইল (আ.) কে ডেকে বলে দেন আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমি তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাইল (আ.) তাকে ভালবাসেন এবং আসমানের ফিরিশতাদেরকে ডেকে বলে দেন আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। অতঃপর আসমানের পিরিশতাগণ তাকে ভালবাসে। তারপর যমীনবাসীদের মধ্যে তাকে প্রিয় করে দেয়া হয়। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা যাকে ঘৃণা করেন তার ব্যাপারে জিবরাইল (আ.) কে ডেকে বলে দেন আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমি তাকে ঘৃণা কর। অতঃপর জিবরাইল (আ.) তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানের ফিরিশতাদেরকে ডেকে বলে দেন আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা কর।

---

[৫৪৭]. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৯, পৃ. ৬৩, হাদীস নং ৭১৪৬।

[৫৪৮]. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৬০৬, হাদীস নং ১৩২৪।

[৫৪৯]. ইমাম আবু দাউদ, ***সুনানু আবী দাউদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং ৩৫৭৫; ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-বায়হাকী, ***আস সুনানুল কুবরা,*** প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫১।

[৫৫০]. আল-কুরআন, ৩: ২৬।

অতঃপর আসমানের পিরিশতাগণ তাকে ঘৃণা করে। তারপর যমীনবাসীদের মধ্যে তাকে ঘৃণিত করে দেয়া হয়।[৫৫১]

মানুষ সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে যায়। সম্পদের লোভে চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, মাপে কম দেয়া, দুর্নীতি ইত্যাদি জঘন্যতম কর্ম সংঘটিত করতেও মানুষ দিধা করে না। সম্পদের জন্য মারা মারি, খুন খারাবি ইত্যাদি সংঘটিত করে মানুষ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে। এজন্যই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা (পরীক্ষা/বিপদ) স্বরূপ'।[৫৫২] সুতরাং মানুষকে সকল প্রকার বিপদ আপদ ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পেতে হলে সকল প্রকার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকার কোন বিকল্প নেই।

৪. জনকল্যাণমূলক মানসিকতা সৃষ্টি :

কোন জাতিকে নৈতিক অবক্ষয় ও পাপাচারমুক্ত রাখার গুরুত্বপুর্ণ উপায় হল তাদের মধ্যে মানবহিতৈষী ও জনকল্যাণমূলক ধ্যান-ধারণা প্রোথিত করা। সর্বদা জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখা। কেননা এ পৃথিবীতে যত জাতি ধ্বংস হয়েছে, তার মূলে ছিল স্বার্থপর চিন্তা-চেতনা, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করা। একদল মানুষ তার মন-মগজে লালিত চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অপর একদল মানুষকে ধ্বংস করছে, অস্থিরতা সৃষ্টি করছে এবং মানবাধিকার ধ্বংস করছে। এটা এ জন্যই সম্ভব হচ্ছে, তাদের চিন্তা চেতনা ও দর্শনে মানবহিতৈষী ধ্যান-ধারণা অনুপস্থিত। তারা নিজেদের অন্যায় স্বার্থের পেছনেই দৌড়াচ্ছে আর নিজেদেরকে অন্যান্য মানুষের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভাবছে। অপরপক্ষে মানুষের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে ভেবেছে মূল্যহীন। এ অনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা মানুষের জীবনের সকল সুখ-শান্তি এবং নিরাপত্তাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। তাদের এ অমানবিক আচরণের ফলে সমাজ ও জাতি অনিবার্য ধ্বংসে নিপতিত হচ্ছে। তাই যখন কোন জাতির মানুষের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-মূল্যবোধ, প্রেম-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া জাগরিত হয় এবং তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মানবতাবাদী ও মানবহিতৈষী চিন্তা-চেতনা গড়ে ওঠে তখন সে জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আর তখনই একটি জাতির মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» অর্থাৎ হযরত তামীমে দারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স.) বলেন, দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম কার জন্য? রাসূল (স.) বললেন আল্লাহ, তার কিতাব, তার রাসূল, মুসলমানদের নেতাগণ এবং সকল মুসলমানের জন্য।[৫৫৩] অন্য হাদীসে রাসূল (স.) বলেছেন, "এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার, তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ নম্বরটি হল উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের কল্যাণ কামনা করা"।[৫৫৪] সুতরাং মানবজাতিকে কল্যানময় জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের মধ্যে অন্যের কল্যানে কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

---

৫৫১. ইমাম মুসলিম, ***সুনানু মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২০৩০, হাদীস নং ২৬৩৭; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওয়ালী উদ্দীন, ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১৩৯৪, হাদিস নং ৫০০৫।

৫৫২. আল-কুরআন; ৬৪ : ১৫।

৫৫৩. ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৭৪, হাদীস নং ৯৫।

৫৫৪. ইমাম ওয়ালী উদ্দীন তিবরীযী (র.), ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১৩১৫, হাদীস নং ৪৬৩০।

পরোপকার এবং অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। সর্বোপরি নিজের সুবিধার দিকে না তাকিয়ে জাতীয় কল্যাণে কাজ করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
পরকালীন জবাবদিহিতায় উদ্বুদ্ধকরণ

১. পরকাল সম্পর্কে সু-স্পষ্ট ধারণা লাভ :

পরকালকে আরবীতে آخرة বলে। آخرة শব্দটি اخر শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয়। এর অর্থ হল শেষ, সমাপ্তি, পরবর্তী ইত্যাদি। এটি اول শব্দের বিপরীত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত অসীম জীবনকে আখিরাত বা পারলৌকিক জীবন বলে। আখিরাত এমন একটি জীবন, যেখানে মুমিন বান্দা ব্যতীত প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। মৃত্যুর পর কবর জীবন থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিবস, হিসাব নিকাশ এবং জান্নাত জাহান্নামের অনন্ত জীবন প্রভৃতি আখেরাতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আখেরাত সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করে তার ঈমান নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পরকালীন জীবনে পাড়ি জমাইতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল।[৫৫৫] মরণের পর পরই শুরু হবে আখিরাতের অনন্ত জীবন, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সুতরাং আখিরাত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা অতীব জরুরী। স্বচ্ছ ধারণা থাকলেই পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হবে। কেননা যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন প্রস্তুতি নেয়ার আর কোন সময় থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছিয়ে যেতে পারবে, না এক মুহূর্ত এগিয়ে আসতে পারবে।[৫৫৬] অর্থাৎ আল্লাহ পাক যার জন্য যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন ঠিক সে সময়ই তার মৃত্যু হবে। মুত্যুর পর প্রত্যেক মানুষকে কবরে যেতে হবে। পরকালের প্রথম স্তর হল কবর। এই কবর কারো জন্য জান্নাতের বাগান হবে আবার কারো জন্য হবে জাহান্নামের গর্ত। এভাবে দীর্ঘকাল চলতে থাকবে। তারপর কিয়ামত হবে; হাশর নশর হবে; হিসাব নিকাশ হবে। কারো হিসাব হবে খুবই সহজ আবার কারো হিসাব হবে খুবই কঠিন। যার হিসাব কঠিন হবে তার ধ্বংস অবধারিত। এরপর পুলসিরাত পার হয়ে কেউ জান্নাতে যাবে আবার কেউ ফুলসিরাত পার হতে পারবে না। তারা নিচে জান্নামে পড়ে যাবে। যারা জান্নাতে যাবে তাদের জীবন হবে খুবই আনন্দময় এবং সুখের জীবন। তারা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে। তাদের মনের সকল চাহিদা সেখানে পূরণ হবে। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন সকল নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি, কোন কর্ণ কোন দিন শোনেনি এবং কোন অন্তর কোন দিন কল্পনাও করেনি। অপরদিকে জাহান্নামীদের জীবন হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের জীবন হবে অত্যন্ত দুঃখ এবং যন্ত্রনাময়। তারা জাহান্নামের আগুনে জলতে থাকবে। আগুনে পুড়ে তাদের শরীরের চামড়াগুলো পঁচে পঁচে পড়বে। এরপর তাদের চামড়াগুলোকে

---

[৫৫৫]. আল-কুরআন, ৩:১৮৫; ২১:৩৫; ২৯:৫৭।

[৫৫৬]. আল-কুরআন, ৭:৩৪; ১০:৪৯; ৬৩:১০-১১।

আবার সুস্থ করে দেয়া হবে যেন তারা শাস্তির যন্ত্রনা পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদন করতে পারে। শাস্তির যন্ত্রনায় তারা পিপাসার্ত হয়ে যখন পানি চাইবে তখন তাদেরকে জাহান্নামীদের শরীরের পুঁজ পান করতে দেয়া হবে এবং কাঁটাযুক্ত তৃনলতা খেতে দেয়া হবে। ইহা দ্বারা তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণ হবে না; বরং তাদের যন্ত্রনা আরো বেড়ে যাবে। তারা সেখানে বাঁচবেও না আবার মরবেও না। অর্থাৎ তাদের জীবন হবে অত্যন্ত দুর্বিষহ এবং যন্ত্রনাময়।

পরকালের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেদিন লুকোচুরি করার কোন সুযোগ থাকবে না। বান্দা তার কোন কাজ চাইলেও ঢাকতে পারবে না। তার সকল কাজ কর্মের রেকর্ড অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ করা হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا - اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا- অর্থাৎ আর আমি প্রতিটি মানুষের কর্মকে তার জন্যে গলার হার করে দিয়েছি; আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে আমলনামা বের করব; যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (তাকে বলা হবে) পাঠ কর তোমার আমলনামা, আজ তোমার হিসাবের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট।[৫৫৭] আমলনামা এমন ভাবে প্রকাশ করা হবে যে, বান্দা তা দেখে বিস্মিত হয়ে বলবে, يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا অর্থাৎ হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যা ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, সব কিছুই এতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে? তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। আর আপনার প্রতিপালক কারো উপর জুলুম করেন না।[৫৫৮] বান্দা কোন কাজ অস্বীকার করতে চাইলেও সে সুযোগ পাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তা প্রমানের জন্য সাক্ষীর ব্যবস্থা রাখবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হাত, পা, যবান ইত্যাদি তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ স্মরণ কর সে দিনের কথা, যে দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের জিহবা, হাত এবং পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।[৫৫৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ সে দিন আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব, আর তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।[৫৬০]

২. দুনিয়া আখিরাতের ক্ষেতস্বরূপ :

পৃথিবীর লীলা-খেলা একদিন শেষ হয়ে যাবে। আবার নতুন করে আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। বস্তুত আখিরাত হল মানব জীবনের সব প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির জায়গা। এ নশ্বর জীবনে মানুষ কর্ম করে, যার প্রতিদান পাবে আখিরাতে। দুনিয়ার ভাল-মন্দ ও সকল কৃতকর্মের ফলাফল পাওয়া যাবে আখিরাতে। তাই মু'মিনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আখিরাতের সফলতা ও মুক্তিলাভ। তবে

---

[৫৫৭]. আল-কুরআন ১৭ : ১৩।
[৫৫৮]. আল-কুরআন ১৮ : ৪।
[৫৫৯]. আল-কুরআন, ২৪ : ২৪।
[৫৬০]. আল-কুরআন, ৩৬ : ৬৫।

এ মুক্তির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়া। আখিরাতের চিন্তা-চেতনাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার প্রীতি, মোহ, আকর্ষণ ও চাকচিক্যকে অগ্রাধিকার দিলে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। খলিফা সুলাইমান ইবনে মালিক একদা হযরত আবূ হাযিম (র.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যু আমাদের নিকট এত অপ্রিয় কেন? তিনি উত্তর দিলেন, কারণ দুনিয়াকে তোমরা সুসজ্জিত করেছ এবং পরকালকে উৎসন্ন করেছ। সুসজ্জিত স্থান পরিত্যাগ করে উৎসন্ন স্থানে গমণ করা যে কোন লোকের নিকট স্বভাবত-ই অপ্রিয় বলে মনে হয়।[৫৬১] বস্তুত দুনিয়ার ভাল-মন্দ কর্মের ফলাফল আখিরাতে পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** - অর্থাৎ অনন্তর যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।[৫৬২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, **إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ** অর্থাৎ তোমরা সকলে কিয়ামতের দিন নিজ নিজ (কৃতকর্মের) প্রতিফল পুরোপুরিভাবেই পাবে। সফল হবে মূলত: সে ব্যক্তি, যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। বস্তুত এ দুনিয়া একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় উপভোগ্য জিনিষ ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৫৬৩] দুনিয়ার চাকচিক্যে মিশে গিয়ে পরকালের কথা ভুলে থাকলে চলবে না। কিয়ামতের দিন ঠিকই ধরাশায়ী হতে হবে। তখন কোন যুক্তি তর্ক দিয়ে বাঁচা যাবে না। নিজ কৃতকর্মের ফল পরিপূর্ণভাবেই ভোগ করতে হবে। যেমন অল্লাহ তা'আলার বাণী, **يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** অর্থাৎ যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজের পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।[৫৬৪] সফলতা সে ব্যক্তি অর্জন করতে পারে যে ভবিষ্যতের আশু পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য বর্তমান সময় থেকেই প্রস্তুত থাকে। এজন্য পরকালের প্রস্তুতি দুনিয়াতে থাকতে গ্রহণ করাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, **عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ** অর্থাৎ শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে নিজের জীবনের হিসাব নিয়েছে (বা নিজের প্রবৃত্তিকে বশ করেছে) এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্যে কাজ করেছে। আর নির্বোধ কাপুরুষ সে ব্যক্তি যে নিজের সত্তাকে প্রবৃত্তির দাস বানিয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের আশায় বসে আছে। [৫৬৫] পরকালে পাড়ি দেয়ার পর আর কোন নেক আমল করার সুযোগ থাকবে না। তবে এমন কিছু নেক আমল আছে যেগুলো দুনিয়াতে থাকা কালীন করে গেলে মৃত্যুবরণ করে চলে যাওয়ার পরও

---

[৫৬১]. মূল: হযরত ইমাম গায্যালী (র.), ***সৌভাগ্যের পরশমণি***, অনু. আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১০৯।

[৫৬২]. আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮।

[৫৬৩]. আল-কুরআন, ৩ : ১৮৫।

[৫৬৪]. আল-কুরআন, ১৬ : ১১১।

[৫৬৫]. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৬৩৮, হা. নং ২৪৫৯; ইমাম ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৪২৩, হাদীস নং ৪২৬০; মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে আলী আল-বাগাভী, ***শরহুস সুন্নাহ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০৮, হাদীস নং ৪১১৬; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ২৮, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং ১৭১২৩ ।

তার সাওয়াব ধারাবাহিকভাবে পৌঁছতে থাকবে। যেমন রাসূল (স.) এর বাণী, **اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلاثة من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার যাবতীয় কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তিন প্রকারের কাজ (সাওয়াব) অব্যাহত থাকে। (ক) সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ এমন দান খয়রাত, যার দ্বারা লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে উপকৃত হতে থাকে (খ) এমন ইল্‌ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান যা থেকে (মৃত্যুর পরও) মানুষ ফায়দা পায় (গ) এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে।[৫৬৬] এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি-ই এ তিন প্রকার আমলের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যাবে তখন সে বলতে থাকবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যদি সামান্য একটু অবকাশ দাও তবে আমি দান সদকা করতাম এবং নেককার হয়ে যেতাম। কিন্তু কোন আত্মাকে কোন সুযোগ দেয়া হবে না যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে। এজন্য মৃত্যু আসার পূর্বেই পরকালের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ইসলামী শরীয়তে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, **عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُور فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ , وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ , وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ , وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ , وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ** অর্থাৎ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমার কাঁধে হাত রেখে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে চল যেন তুমি অপরিচিত অথবা পথিক আর নিজেকে কবরবাসীদের মধ্যে পরিগণিত কর। অতঃপর ইবনে ওমর (রা.) বলেন যখন তুমি সকাল করবে তখন বিকালের জন্য অপেক্ষা করো না, আর যখন বিকাল করবে তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না। আর পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে পাঁচটি জিনিস কে অতীব মুল্যবান মনে কর। (ক) বার্ধ্যক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, (খ) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (গ) দারিদ্র্যতার শিকার হওয়ার পূর্বে সচ্ছলতাকে (ঘ) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে (ঙ) মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনকে।[৫৬৭]

হাশরের ময়দানের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেখানে বান্দা তার দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের হিসাব না দিয়ে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, **عن ابن مسعود عن النبي صلعم لاتزول قدما بن ادم حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله**

---

[৫৬৬]. ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস নং ১৬৩১; ইমাম মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক, ***মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক,*** আবু ধাবী: মুআস্‌সাসাতু যায়াদ ইবনে সুলতান আল নাহিয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ., খ. ০১, পৃ. ৭৪। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৪৩৮, হাদীস নং ৮৮৪৪; ইমাম আবু দাউদ, ***সুনানু আবী দাউদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৮৮০।

[৫৬৭]. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ২৩৩৩; আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, ***মুসান্নাফু ইবনে আবী শায়বা***, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ ১৪০৯ হি., খ. ০৭, পৃ. ৭৭, হাদীস নং ৩৪৩১৯। মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে আলী আল-বাগাভী, ***শরহুস সুন্নাহ,*** রিয়াদ: খ. ১৪, পৃ. ২৩১, হাদিস নং ৪০২৯।

من اين اكتسبه وفيما انفقه وما عمل فيما علم- অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানরা (স্বস্থান থেকে) এক কদমও নড়তে পারবে না, যতক্ষণ পাঁচটি ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে। (ক) তার জীবনকালটা কী কাজে শেষ করেছে? (খ) তার যৌবনকাল কী কাজে নিয়োজিত রেখেছে? (গ) তার ধন-সম্পদ কোন্ উৎস থেকে উপার্জন করেছে? (ঘ) কোন্ কাজে তা ব্যয় করেছে? (ঙ) যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার উপর কতটা আমল করেছে?[৫৬৮] সুতরাং দুনিয়ার জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করে পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় অর্জন করতে হবে। কেননা এ দুনিয়ায় পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় অর্জন না করলে মৃত্যুর পর আর কোন সুযোগ থাকবে না তা অর্জন করার। দুনিয়াই একমাত্র জায়গা যাতে পরকালীন সুখ শান্তির জন্য সকল ব্যবস্থাপনা করে যেতে হবে। এজন্য দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে শতভাগ কাজে লাগাতে হবে। অলসতা করে অথবা সামনে করব মনে করে সময় নষ্ট করা যাবে না। অন্যথায় হঠাৎ মৃত্য এসে হাজির হয়ে যাবে, তখন আর প্রস্তুতি নেয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

৩. পরকালীন জীবন-ই সর্বোত্তম :

মানব জীবন দুটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যথাঃ জীবন ও মৃত্যু। এ মৃত্যু চিন্তা মানুষকে দ্বীনের ওপর চলার পথ সহজ করে দেয়। মূলত পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবনের ভূমিকা মাত্র। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ এবং সে জীবন চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সমস্ত কাজের পুরোপুরি ফল প্রকাশিত হয় না; বরং কোন কোন কাজের আংশিক সুফল বা প্রায়শ্চিত্ত কখনও কখনও এ দুনিয়াতে দেখা যায় কিন্তু তার পরিপূর্ণ ফলাফল মৃত্যুর পরই শুরু হয় যা চিরস্থায়ী। আর দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম করে এবং সৎকর্মের ওপরই মৃত্যু বরণ করে, তার জন্যে আখিরাতের জীবনই সর্বোত্তম। সুতরাং দুনিয়ার সকল কর্মের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে আখিরাতে সুন্দর জীবন পাওয়া। তাই আমাদের উচিত, দুনিয়াতে সৎকর্ম করা এবং অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। যদি আমরা এটা করতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য আখিরাতের জীবনই হবে সর্বোত্তম । আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থাৎ পার্থিব জীবনতো খেল-তামাশা ব্যতীত কিছুই নহে, আর মুত্তাকীদের জন্যে পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি তা ভেবে দেখ না? [৫৬৯] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى অর্থাৎ বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখিরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী।[৫৭০] অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা অতি নগন্য, আর আখিরাত (মুত্তাকীদের জন্য) অতি উত্তম, আর তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।[৫৭১] পরকালীন জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের কোন তুলনাই হয় না। কেননা দুনিয়ার জীবন হল ক্ষণস্থায়ী আর পরকালীন জীবন হল

---

[৫৬৮]. ইমাম তিরমিযী, ***সুনানু তিরমিযী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ৬১২, হাদীস নং ২৪১৬।

[৫৬৯]. আল-কুরআন, ৬ : ৩২; অনুরূপ ৭:১৬৯; ১২:৫৭,১০৯; ১৬:৩০।

[৫৭০]. আল-কুরআন, ৮৭ : ১৬-১৭

[৫৭১]. আল-কুরআন, ৪ : ৭৭; অনুরূপ ৯ : ৩৮; ১২ : ৫৭।

চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে পরিপূর্ণ সুখ শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় কেননা দুনিয়া পরিপূর্ণ সুখের জায়গা নয়। আর পরকালে জান্নাত হবে পরিপূর্ণ শান্তির আবাসস্থল। সেখানে অশান্তির লেশমাত্র থাকবে না। বান্দা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। তার মনের সকল আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হবে। দুনিয়াতে বান্দার বিভিন্ন ধরণের রোগ ব্যাধি হয়, একসময় সে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু পরকালে কোন মৃত্যু নেই। তবে জাহান্নামীরা সেখানে যন্ত্রনার মধ্যে থাকবে। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মনমুগ্ধকর বালাখানা, সুস্বাদু ফল-ফলাদি, সুপেয় পানীয়, উন্নত খাটিয়াসমূহ, স্বচ্চ পানপাত্রসমূহ, সুন্দরী রূপসী হুর ও সেবিকাগণ, কোমল গালিছাসমূহ ইত্যাদি যেসব ব্যবস্থাপনা রেখেছেন দুনিয়াবাসী তার কল্পনাও করতে পারবে না। সুতরাং পরকালে এমন উত্তম জীবন পাওয়ার জন্য দুনিয়ার এ মরিচিকাময় ভোগ বিলাস ও চাকচিক্য বিসর্জন দিতে হবে। তাহলেই দুনিয়াতে একটি সফল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

৪. আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন :

স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের একান্নভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। এটাই হচ্ছে একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম স্তর বা ভিত্তি। পরিবার থেকে শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার উপর। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কল্পনা করা যায় না তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়।[৫৭২] সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রভৃতি পারিবারিক সুস্থতা ও আদর্শ পরিবার গঠনের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি যদি নড়বড়ে হয়ে যায় এবং তাতে ভাঙ্গন ধরে তাহলে সমাজ জীবনে নানা ধরণের অশান্তি ও বিপর্যয় দেখা দেয়। এ কারণে ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা ও সুস্থতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ আদর্শ পরিবার গঠন করতে না পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন শান্তি ও কল্যাণ আসবে না। তাই প্রতিটি পরিবারকে আদর্শ পরিবারে রূপান্তরিত করতে হবে। নিম্নে আদর্শ পরিবার গঠনের জন্যে কিছু করণীয় দিক তুলে ধরা হল:

ক. ইসলামী পরিবারের রূপ রেখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে হবে।

খ. ইসলাম ধর্মে প্রদত্ত পর্দা বিধানের বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ. বিবাহ ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করতে হবে ।

ঘ. ব্যভিচার বা অবৈধ যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করতে হবে।

ঙ. পারিবারিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হবে।

চ. পারিবারিক আইন ও বিধানের পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করতে হবে ।

মূলত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর পরিবারের প্রধান পরিবারের দায়িত্বশীল। তাই পরিবারের প্রধান তার পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবাররূপে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। পরিবারে যাতে অসামাজিক কোন কর্মকাণ্ড সংঘটিত না হয় সে ব্যপারে সজাগ দৃষ্টি

---

[৫৭২]. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ***পরিবার ও পারিবারিক জীবন,*** ঢাকা ১১০০: খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৩৩।

রাখতে হবে। শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক অত্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে পরিবারের নিয়ন্ত্রন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং নিজ পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ আর পাথর। সেখানে অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাবের ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে। তারা কখনো আল্লাহর হুকুমের ব্যতিক্রম করে না। আর যে হুকুমই তাদের দেয়া হয়, তারা তা ঠিকমত পালন করে।[৫৭৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, عن عبد الله ابن عمر رضى ان رسول الله صلعم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيتيه অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, সাবধান তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[৫৭৪] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন, عن عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ "، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ- অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। ১. মদপানকারী ২. মাতা-পিতার অবাধ্য ৩. দায়ূছ যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয়।[৫৭৫] সুতরাং প্রত্যেকটি পরিবারের প্রধানের দায়িত্ব হল তার অধীনস্ত পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবাররূপে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। পরিবারে যে কোন ধরণের অনৈতিক, অশ্লীল ও শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডকে দমন করা। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে আদর্শবান ও নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান করে তোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে মনগড়া চলার নীতি পরিহার করে শরীয়তের বিধি বিধান মোতাবেক চলতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারলেই পরিবার আদর্শরূপে গড়ে উঠবে আর প্রত্যেকটি পরিবার যদি আদর্শবান হয় তাহলেই গড়ে উঠবে একটি আদর্শ সমাজ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন করা যায়। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও চিন্তা চেতনার মানুষ বসবাস করে। ভাল-মন্দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি সমাজ। এক শ্রেণির মানুষ সর্বদা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত করে বেড়ায়। কালোবাজারী, হত্যা, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, সমকামিতা প্রভৃতি মানবতা বিরোধী জঘন্য কর্ম সমাজে প্রতিনিয়ত সংঘটিত করে বেড়ায় যা মানব সমাজকে সর্বদা উদ্বিগ্ন করে তোলে। সংঘবদ্ধ ও সামাজিকভাবে এগুলো প্রতিরোধ করতে পারলে অবশ্যই সমাজ ভাল হয়ে যাওয়ার কথা। তাই আজকের এ অশান্ত বিশ্বে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বস্তির সুবাতাস প্রবাহিত করতে হলে মহানবী (স.) কতৃক প্রদত্ত কল্যাণমূলক সমাজের নির্দেশনা গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই। কেননা ইসলামী

---

[৫৭৩]. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬।

[৫৭৪]. ইমাম বুখারী, ***সহীহ বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ২৬, হাদীস নং ৫১৮৮; ইমাম মুসলিম, ***মুসলিম শরীফ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ১৪৫৯, হা. নং ১৮২৯।

[৫৭৫]. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৯, পৃ. ২৭২।

সমাজই একমাত্র সমাজ যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং সমাজে বিদ্যমান যে কোন অসামাজিক কার্যকলাপকে সংঘবদ্ধভাবে মুকাবিলার নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।[৫৭৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا» অর্থাৎ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত না রাখে, আল্লাহ্ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন।[৫৭৭]

৫. তওবা-ইস্তিগফার :

তওবা শব্দের অর্থ হলো পাপ স্বীকার করা, প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, অনুতাপ করা, অনুশোচনা করা, লজ্জিত হওয়া ইত্যাদি। বিশেষভাবে অনুতপ্ত হয়ে বিনয়ের সাথে সঠিক ও শুদ্ধ পথে ফিরে আসা। আর পরিভাষায়, কোন কাজ অন্যায়ভাবে হয়ে যাওয়ার পর বা আল্লাহর হুকুম অমান্য ও সীমালঙ্ঘন করার পর অনুতপ্ত হয়ে চরম পেরেশানির সাথে আল্লাহ্র কাছে অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাওয়া ও সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজে ফিরে আসাকেই তওবা বলা হয়। নৈতিকতার অবক্ষয় রোধ, অন্যায়-অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে তওবা-ইস্তিগফার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন মু'মিনের কর্তব্য হল, কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে আর কখনও অপরাধ করবে না মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

ইস্তিগফার শব্দের অর্থ হল ক্ষমা প্রার্থনা করা, মাফ চাওয়া ইত্যাদি। বান্দাহ তার গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তওবা ও ইস্তিগফার আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য। মানবরচিত বিধি-বিধানে পার্থিব জীবনে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অপরাধ সংঘটিত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করার চেয়েও তা সংঘটিত হওয়ার পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে কার্যকরী পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামে অপরাধ যেন সংঘটিত-ই হতে না পারে তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তথাপিও অসর্তকতা বশত যখন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তখন ইসলামের দিক নির্দেশনা হলো সাথে সাথেই তা থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করা। শয়তানের ধোকায় কিংবা নফসে আম্মারার প্ররোচনায় মানুষের থেকে কিছু অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়। যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হল তওবা ইসতেগফার। সর্বোপরি আল্লাহ্র কাছে তওবা- ইস্তিগফার করার মাধ্যমে বান্দার ভুল ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

---

[৫৭৬]. আল-কুরআন, ৫ : ২।

[৫৭৭]. ইমাম আবূ দাঊদ, ***সুনানু আবী দাঊদ,*** প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১২২, হাদীস নং ৪৩৩৯।

বান্দা যদি পরকাল, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিশ্বাস করে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে বলে বিশ্বাস করে তবে অবশ্যই তাকে কৃত গুনাহের জন্য তওবা ইসতেগফার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট খাঁটি তওবা করে পরকালীন জবাবদিহিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা কোন গুনাহের কাজ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসে তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহ্ খাতার জন্য মাফ চায়। কারণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গুনাহ্ মাফ করতে পারেন? আর তারা জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্ম বার বার করে না।[৫৭৮] তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা খালেস দিলে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে স্থান দেবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত।[৫৭৯] পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা যারা অজ্ঞতাবশত: খারাপ কাজ করে অতঃপর সাথে সাথে তওবা করে। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।[৫৮০] আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ অতঃপর তারা কি আল্লাহ্‌র দিকে তওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান।[৫৮১]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, عن انس بن مالك رضـ قال قال رسول الله صـ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد اضله فى ارض فلاة অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেছেন, বান্দা গুনাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্য যখন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায়, তখন আল্লাহ্ সে ব্যক্তির তওবার দরুন ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা ফিরে পায়।[৫৮২] রাসূল (স.) আরো বলেছেন, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন

---

[৫৭৮]. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৫।

[৫৭৯]. আল-কুরআন, ৬৬ : ০৮।

[৫৮০]. আল-কুরআন, ৪ : ১৭।

[৫৮১]. আল-কুরআন, ৫ : ৭৪।

[৫৮২]. ইমাম বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৮, পৃ. ৬৮, হাদীস নং ৬৩০৯; ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২১০৫, হাদিস নং ২৭৪৭।

একশত বার তওবা করে থাকি।[৫৮৩] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেছেন, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ। অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন।[৫৮৪]

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ, আসমানী গযব ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল তওবা করা। আমরা জানি হযরত ইউনুস (আ.) এর জাতির লোকেরা হযরত ইউনুস (আ.) কে না পেয়ে যখন আল্লাহর দরবারে খাঁটিভাবে তওবা করল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেন এবং তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) এর সময়ে একজন লোক মদের বোতল নিয়ে রাস্তায় তাঁর সামনে পড়ে যায়। সে লোকটি অত্যন্ত ভীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার মদকে দুধে রূপান্তরিত করে দেন।

[৫৮৩]. ইমাম মুসলিম (র.), ***সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২০৭৫, হাদীস নং ২৭০২।
[৫৮৪]. ইমাম তিরমীযি (র.), ***সুনানুত তিরমীযী***, প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ৫৪৭, হাদীস নং ৩৫৩৭।

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার খলিফা হিসেবে, যার সূচনা হয়েছিল হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে দিয়ে। খলিফাগণের কাজ পৃথিবীতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহ পাক যখন যে কাজের নির্দেশ দেন তা আঞ্জাম দেয়া। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অন্যায়, অবিচার ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে। তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সেসব নবী রাসূলগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেনি। তারা সৃষ্টিকর্তার প্রদর্শিত পথ বাদ দিয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। অন্যায়, অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, মারা-মারি, খুন-খারাবী, হত্যা, লুণ্ঠনসহ যাবতীয় এমন কোন অপকর্ম নেই যাতে তারা লিপ্ত হয়নি। ফলে তারা আদর্শচ্যুত হয়ে ভ্রষ্টতার চরম সীমায় পৌঁছে যায় যে কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আর তাদের পরবর্তীতে নতুন জনগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। এভাবে কালের পরিক্রমায় আল্লাহ পাক আরববাসীকে পৃথিবীতে বসতি দান করেছেন। তাদের নিকট পাঠিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) কে। তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কুরআনুল কারীম। যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবাধ্যাচারণ ও ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মত অবাধ্যাচারণ করে তারা ধ্বংসে নিপতিত না হয়। তারা যেন তাদের ঘটনাপুঞ্জ থেকে শিক্ষা নিয়ে সফলকাম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে পুর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাদের জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যেন মানুষ এগুলো পাঠ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তিনি এসব ঘটনাবলীকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সফলতা আর ধ্বংসের কাহিনী থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য যাবতীয় কর্মপন্থা অবলম্বন করবে। এজন্য কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যমীনে ভ্রমন কর অতঃপর লক্ষ্য কর মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল" (৬:১১)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "আমি তাদের পূর্বে অনেক জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের জনপদে তারা এখন বিচরণ করে, এটা কি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেনি? নিশ্চয় এতে রয়েছে প্রজ্ঞাবানদের জন্য নিদর্শন" (২০:১২৮)।

বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ প্রভূত উৎকর্ষতা লাভ করেছে। জলপথ, স্থলপথ ও আকাশ পথে যানবাহনের ক্ষেত্রে পৃথিবী বহুগুণ এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এগুলোর দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে, কেননা আল-কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎস। যেমন আমরা শুধুমাত্র রাসূল (স.) এর মিরাজের কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারি যে, রাসূল (স.) ১৪০০ বছর পূর্বে রাতের সামান্য সময়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিতে আকসা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে সেখান থেকে আবার ফেরত এসেছিলেন, যা সে সময়ের জন্য অনেকটা অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের রকেট আবিস্কারের মাধ্যমে সেটা বুঝা অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞানীরা তা থেকে গবেষণা করে স্থলপথ এবং আকাশ পথের উন্নত যানবাহনের

আবিস্কার করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত নূহ (আ.) এর নৌকা তৈরির কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নৌ-যান তৈরির ফর্মূলা দিয়েছিলেন। যার আধুনিকায়নের ফলে বর্তমান পৃথিবী আধুনিক নৌ-যান তথা লঞ্চ, স্টিমার ও গভীর সামুদ্রিক জাহাজ উপহার পেয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে সবকিছুর উন্নতি হলেও উন্নত হয়নি কেবল মানব জাতির নৈতিক চরিত্রের, অবক্ষয় মুক্ত হতে পারেনি ঘুনেধরা এ জাতি। বর্তমান পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এতটাই অবনতি ও স্খলন হয়েছে যে, তারা কেবল মানবতার সীমাই লংঘন করেনি; বরং পশুত্বের সীমাও লংঘন করেছে। 'খাও দাও ফুর্তি কর' এ বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে তারা পশুত্বের সীমাকেও হার মানিয়েছে। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, পৃথিবীতে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল অন্যায় অপরাধ বিরাজমান ছিল বর্তমান পৃথিবীতে তার পরিমাণ কোন অংশে কম নয়। তারা যেমন মূর্তিপূজা করত বর্তমানেও মূর্তিপূজা উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান। বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশ আমাদের বাংলাদেশেও দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে মূর্তি ও দেব-দেবী পূজা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাতে প্রচুর পরিমানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতাও লক্ষণীয়। পূজা ছাড়াও আমাদের দেশের অনেক মানুষ তাদের ঘরে, ঘরের শো-কেইসে, দোকান পাটে সম্মান করে বিভিন্ন ধরণের মূর্তি সাজিয়ে রাখে। এছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবেও দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসমূহে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্য ও সৌন্দর্য বর্ধনের নামে বিভিন্ন ধরণের মূর্তি স্থাপন করা হয় যা শিরকের নামান্তর।

পূর্ববর্তী জাতির লোকেরা যেমন নবী-রাসূলগণের উপর অত্যাচার করত বর্তমানেও দ্বীনের দাঈ ও নবীর ওয়ারিশদের উপর অত্যাচারের ধারা চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামিক স্কলার ও দ্বীনের দাঈগণের উপর মামলা-হামলা, জেল-জুলুম, এমনকি ফাঁসির উদাহরণ ভুরি ভুরি। এছাড়া আদ জাতি যেমনিভাবে বিশাল ক্ষমতাধর, অহংকারী ও জাব্বার ছিল, দূর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানত, মানুষদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাত, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে ছিল নেশাগ্রস্ত, ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান পৃথিবীতেও বিশ্বের সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে নেশাগ্রস্ত হয়ে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, ভিয়েতনাম ইত্যাদি রাষ্ট্রে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে এসব রাষ্ট্রকে নরক রাজ্যে পরিণত করে দিয়েছে। নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর লেলিয়ে দিয়েছে হিংস্র হায়েনা ইসরাঈলকে। লুণ্ঠন করে নিয়েছে তাদের থেকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার নামক নিয়ামত। তাদের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তার পূর্বে এক সময় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করতে করতে অর্ধ পৃথিবী পর্যন্ত শাসন করেছিল বৃটিশ। কথিত আছে যে বৃটিশদের রাজ্যে কখনও সূর্য ডুবতো না। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ব্যর্থ হয়ে তারা একসময় লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ নীতি বাদ দিয়ে তারা ফিরে গেছে আপন ঘরে। এমনিভাবে আমাদের বাংলাদেশেও রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাকর্মীদের উপর জেল-জুলুম, অপহরণ, গুম, খুন, ক্রসফায়ার, চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি অত্যাচারের ভুরি ভুরি উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি দমনে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ক্ষমতাসীন দল সবসময় তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

মাদায়েনবাসী যেমন ওজনে কম দিত বর্তমানেও ওজনে কম দেয়া লোকের সংখ্যা অনেক। ছোটোখাটো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পরিবেশক পর্যন্ত সকল স্তরের ব্যবসায়ীরাই মনে হচ্ছে যেন ওযনে কম দেয়াটাকে রুটিন মাফিক স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এতে যে অন্যায়ভাবে পরের হক গ্রাস করা হচ্ছে এদিকে যেন তাদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। তারা নিজেরা যখন অন্যদের থেকে গ্রহণ করে তখন ওযনে বেশী গ্রহণ করে, আবার অন্যদেরকে যখন দেয় তখন ওযনে কম দেয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে মাছ ও গোস্ত বিক্রেতাদের মধ্যে এ প্রবণতা খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত পক্ষে যে অন্যকে ঠকায় সে নিজেকে লাভবান মনে করলেও সে লাভবান নয়; বরং সে দুনিয়াতেই অন্যদিক দিয়ে ঠকে যাবে আর পরকালে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

হযরত লূত (আ.) এর জাতি যে ঘৃণ্য অপকর্ম (সমকামিতা) করে সমূলে ধ্বংস হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আধুনিক পৃথিবীতে সেই সমকামীদের দৌরাত্মও কম নয়। বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ যে সমকামী শুধু তাই নয়; বরং আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীদের অনেকেই সমকামিতার মত একটি নিকৃষ্ট ঘৃণ্য যৌনাচারের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান করছে। দিন দিন সমকামিতার প্রতি বিশ্ব নেতাদের মৌনতা বেড়েই চলেছে। তারা আইন পাশ করে এদের এ ঘৃণ্য পাপাচারের বৈধতা দিচ্ছে। যেমনঃ গত ১২ই মার্চ ২০২১ ইং তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় "পুরো ইউরোপই সমকামীদের স্বাধীন অঞ্চল, ঘোষণা পার্লামেন্টের" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সমকামীদের ইউরোপে কোন ভয় নেই বলে ঘোষণা করেছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। তাতে বলা হয়েছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ভুক্ত সব অঞ্চল এখন থেকে সমকামীদের জন্য স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে। গত ১১ই মার্চ ২০২১ ইং বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৪৯২ জন সদস্য এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে, ১৪১ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে এবং ৪৬ জন ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রায় ৭০% আইন প্রনেতা সরাসরি সমকামিতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিশ্ব মানবতার নৈতিক স্খলনের পরিমান কত? সমকামিতা নামক অপ্রাকৃতিক যৌনাচারের প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রদানে পশ্চিমা বিশ্বই সবচেয়ে এগিয়ে। যেমন সর্বপ্রথম সমলিঙ্গের বিয়েকে আইনগত বৈধতা দিয়েছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্র নেদারল্যান্ড। তারা ২০০১ সালে সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধতা দান করে। ২০১৯ ইং সনের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মোট ২৯ টি দেশ সমলিঙ্গের বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এগুলো হল আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ইকুয়েডর, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তূগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, তাইওয়ান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং উরুগুয়ে (সূত্রঃ দেশ বা অঞ্চল অনুযায়ী সমকামী অধিকার, https//bn.m.wikipedia.org)। তাইওয়ান এশিয়ার সর্বপ্রথম দেশ যারা ২০১৯ সালের মে মাসে তাদের সংসদে ৬৬-২৭ ভোটে সমকামী বিয়েকে আইনগত বৈধতা দিয়ে বিল পাশ করেছে (সূত্রঃ সমকামী বিয়ের বৈধতা দিল তাইওয়ান, dw.com, ১৭/০৫/২০১৯)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৯০ ইং সনে মানসিক রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দেয়। এছাড়া জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তার মানবাধিকার কাউন্সিলে 'সমকামীদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি তুলে দেয়া হোক' মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এতে

৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জন সদস্যের ভোটে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেয়ার প্রস্তাবটি পাশ হয়। সুতরাং উল্লিখিত চিত্র অনুধাবন করলেই বুঝা যায়, বিশ্ব নেতারা সমকামিতা নামক ঘৃণ্য যৌনাচারের প্রতি কতটুকু সহনশীল এবং তাদের চারিত্রিক স্খলনের পরিমাণ কত?

সারা পৃথিবী যেন আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমা বিশ্বের পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের মত রক্ষণশীল মুসলিম রাষ্ট্রেও সমকামীদের সংখ্যা ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ২০১৯ ইং সনের 'ডয়চে ভেলে বাংলাতে' একটি প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশে প্রচুর সমকামী আছে, সেটা সবাই জানে। তারপরও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে ১৯৯৯ ইং সনে 'গে বাংলাদেশ' এবং ২০০২ ইং সনে 'টিন গে বাংলাদেশ' নামে দুইটি অনলাইন গ্রুপ সমকামিতার পক্ষে খুব জোরালোভাবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে অবশ্য এ গ্রুপগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ২০০৯ সালে 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' নামে অপর একটি অনলাইন গ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটে যার মাধ্যমে সমকামীরা তাদের অপকর্মের প্রচার ও প্রসার করে আসছে। এছাড়া ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে ঢাকার কাকরাইলে 'বন্ধু' নামে একটি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী সংস্থা স্থাপিত হয় যা শুরু থেকেই পুরুষ সমকামীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্ধুর শাখাদপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এ সংস্থাটি সরকার কতৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাদের কার্যক্রম প্রকাশ্য ক্রম প্রসারমান। বর্তমানে 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' এবং 'বন্ধু' এ দুটি সংগঠন বাংলাদেশে সমকামিতার প্রসারে খুবই সক্রিয় রয়েছে। শুধু তাই নয় এসব সংগঠনের পাশাপাশি আমাদের দেশের দায়িত্বশীল মহল থেকেও সমকামিতার প্রতি দিন দিন নমনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউতে বাংলাদেশের তৎকলীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমণি লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের অধিকার সংরক্ষণের স্বীকৃতিদানের কথা বলেছেন; সাংবিধানিকভাবে তাদের সমঅধিকার ও স্বাধীনতা থাকার কথাও বলেছেন তিনি। তার কয়েক মাস আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বন্ধু ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটি অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন যে, জাতীয় আইন কমিশনের সহায়তায় তার কমিশন একটি খসড়া আইন তৈরির কাজ করছে যেটি ব্যক্তির যৌন জীবনের কারণে তার প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করবে। এছাড়া গত ২০১২ ইং সনে তিনজন শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটি বিবৃতি দেন যেখানে সমলিঙ্গের মানুষদের আইনগত বৈধতা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (রেইনার এবার্ট, সমকামিতা : ধারণা বনাম বাস্তবতা, bdnews24.com, 30 may, 2013). প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ-যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, 'সমকামিতা আমাদের সমাজে আছে। তিনি বলেন সমকামিতাকে বৈধতা দেয়ার জন্য আমাদের এখানেও আইন করা প্রয়োজন। সমকামিতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।'(মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশে সমকামিতা, Men's Guild. সূত্রঃ গুগল) এছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে অসংখ্য পতিতালয় ও যৌনপল্লী যেগুলোতে রাষ্ট্রীয় মৌনতায় চলছে অবাধ যৌনাচার। তাতে ধ্বংস হচ্ছে আমাদের মূল চালিকাশক্তি তরুণ ও যুব সমাজ। আমাদের বাংলাদেশে যেখানে শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বাসী সেখানে অবৈধ যৌনাচার ও সমকামিতার মত ঘৃণ্য পাপাচারের পক্ষে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এ ধরণের ভূমিকা কখনও

কাম্য হতে পারে না। অথচ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে এইড্স নামক মরণব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অবৈধ যৌনাচার ও সমকামিতা। অবৈধ যৌনাচারের মাধ্যমে এক যৌনকর্মী থেকে অপর যৌনকর্মীর শরীরে এবং সমকামিতার মাধ্যমে এক সমকামী থেকে অপর সমকামীর শরীরে এইড্সের জীবাণু ছড়ায়। সুতরাং এইড্স নামক মরণব্যধি থেকে বাঁচার জন্য অবৈধ যৌনাচার ও সমকামিতা নামক ঘৃণ্য অপকর্ম থেকে বিরত থাকার কোন বিকল্প নেই।

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, চুরি, ডাকাতি, চিনতাই, লুণ্ঠন, খুন-খারাবী, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, জবরদখল ইত্যাদি আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি বিদ্যমান আছে। বরং আমার ধারণামতে তা পূর্বের চেয়েও আরও মাত্রাতিরিক্ত হারে বিদ্যমান। এক কথায় জোর যার মুল্লুক তার নীতিতে যেন গোটা পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবি বিভিন্ন অপকর্মের নামের আধুনিকায়ন করে সেসকল অপরাধকে সমাজে হালকা করে তোলার এবং সমাজে সেগুলোকে সমাদৃত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। যেমন তারা জুয়ার নাম দিয়েছেন ক্যাসিনো, সুদের নাম দিয়েছেন মুনাফা/কিস্তি, ঘুষের নাম দিয়েছেন স্পীড মানি, মূর্তির নাম দিয়েছেন ভাস্কর্য, মদের নাম দিয়েছেন ড্রিংকস, ব্যভিচারকে হালকা করে তোলার জন্য তারা পতিতালয়ের নাম দিয়েছেন যৌনপল্লী, পতিতা ও বেশ্যা শব্দের আধুনিক নাম দিয়েছেন যৌনকর্মী আর পুরুষ পতিতার নাম দিয়েছেন মেইল এস্কর্ট, নর্তকীর নাম দিয়েছেন মডেল, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নতুন ছাত্রদেরকে বরণ করে নিতে পূরাতন ও প্রভাবশালী ছাত্রদের যে অত্যাচার তার নাম দিয়েছেন র‍্যাগিং। ইত্যাদি নানা কৌশলে তারা অপরাধপ্রবণতাকে উস্কে দিচ্ছেন।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানবতার মুক্তির একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার দালিলিক গ্রন্থ হল পবিত্র কুরআনুল কারীম। আর তার প্রয়োগ ও সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে মহান সমাজ সংস্কারক, বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শে। তিনিই একমাত্র শোষিত, বঞ্চিত, ও অবহেলিত মানুষের তথা মানবাধিকারের মূর্ত প্রতীক। বস্তুত মহানবী (সা.) এর প্রজ্ঞাময় দিকনির্দেশনা, জীবনদর্শন এবং তার দূরদর্শী চিন্তা-চেতনাই মানব সমাজের সার্বিক সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। এক কথায় তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তারকারী এক অনন্য মহামানব এবং এক অসাধারণ জাতি গঠনের রূপকার। ইসলামী আদর্শের মধ্যে রয়েছে অবক্ষয়মুক্ত সুশৃঙ্খল ও কল্যাণময় জাতি গঠনের রূপরেখা যা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শে বহুমাত্রিকভাবে ফুটে উঠেছে। যা আজকের এ অস্থির ও অস্থিতিশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক গোলামীর ক্ষেত্রে মানব সমাজের মুক্তির দিশারী হিসেবে একমাত্র কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত।

সুতরাং ধ্বংসপ্রায় মানবজাতিকে রক্ষার জন্য এবং তাদেরকে ভয়াবহ স্খলন থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সেজন্য আল-কুরআন ও মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের

ঘটনাপূঞ্জ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তারা যে সকল অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। অহঙ্কার, জুলুম, নির্যাতন ইত্যাদি পরিহার করে এক আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে। আর সেজন্য কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যেমন সৃষ্টিকর্তার পরিচয় অর্জন পূর্বক তার প্রতি ঈমানকে খাটি করে তাওহীদি চেতনা ধারণ ও তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ওহীভিত্তিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মানব জীবনে তা বাস্তবায়ন করত জাতীয় মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের মাধ্যমে পাপাচারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে বান্দার মধ্যে মনচাহে জিন্দেগী পরিহার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগরণ নিশ্চিত করতে হবে। মৌলিক ইবাদাতসমূহ পালন, আচরণবিধি সংশোধন, হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ইসলামী অনুশাসনমূলক কর্মসূচী পালন করতে হবে। পর্যাপ্ত কুরআন হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে চিন্তা চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে যাতে ধৈর্য ও জনকল্যানমূলক মানসিকতা সৃষ্টি হয়, এবং লোভ লালসাহীন নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। সর্বোপরি পরকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যেন বান্দা পরকালীন জবাবদিহিতায় উদ্ধুদ্ধ হয় ও পরকালীন অনন্ত সুখের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণপূর্ব জাহান্নাম থেকে বাঁচার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে ব্রতী হয়। ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে মানবজাতিকে সফলকাম জাতিতে রূপান্তর করা ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

মোটকথা মানুষকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে, পরকালে আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হতে হবে, কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে, বদকার হলে জাহান্নামের আগুনে জলতে হবে, ইত্যাদি বিশ্বাস যদি অন্তরে পোক্ত করা যায়, বান্দা যদি সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ রেখে চলতে পারে এবং তার প্রত্যেকটি কাজকে জীবনের শেষ কাজ মনে করে সম্পাদন করতে পারে তবেই মানবজাতির সফলতা অনস্বীকার্য। এজন্য হযরত ওমর ফারূক (রা.) এর সীলমহরকৃত আংটিতে লিখা ছিল كفى بالموت واعظا অর্থাৎ মৃত্যুটাই ওয়াজ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি নিয়ে মুত্যুবরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআন।

২. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী আল-বসরী আদ-দিমাশকী, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীরে ইবনে কাছীর)***, দারু তাইয়্যেবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি., ১৯৯৯ খৃ., ০৮ খণ্ড।

৩. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনুল হুসাইন ফখরুদ্দীন রাযী (র.), *মাফাতীহুল গায়ব **(তাফসীরে কাবীর)***, বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২০ হি., ৩২ খ.।

৪. আল্লামা শামসুদ্দীন কুরতুবী (র.), ***আল-জামিউ লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী)***, কায়রো: দারুল কুতুব আল মিছরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি., ১৯৬৪ খৃ., ২০ খ., ১০ ভলিয়ম।

৫. আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আলূসী (র.), ***তাফসীরে রূহুল মা'আনী,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি., ১৬ খ.।

৬. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বিন মুস্তফা আল-ইসতাম্বুলী (র.), ***তাফসীরে রূহুল বয়ান,*** বৈরুত: দারুল ফিকর, ১০ খ.।

৭. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী, ***আল-কাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরে ছালাবী)***, বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি., ২০০২ খৃ., ১০ খ.।

৮. আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথী (র.), ***তাফসীরে মাযহারী***, পাকিস্তান: মাকতাবাতুর রশীদিয়্যাহ, প্রকাশ ১৪১২ হি., ১০ খ.।

৯. হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী (র.), ***তাফসীরে বাগাভী***, বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি., ৫ খ.।

১০. মোহাম্মদ রশীদ ইবনে আলী রেযা আল-হুসাঈনী, ***তাফসীরুল মানার***, আল-হাইআতুল মিছরিয়্যাহ, প্রকাশ ১৯৯০ খৃ., ১২ খ.।

১১. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, ***তাফসীরে ফাতহুল কাদীর***, দামেশক, বৈরুত: দারু ইবনে কাছীর ও দারুল কালিম আত-তাইয়্যেব, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি., ০৬ খ.।

১২. অবুল হাসান মুকাতিল বিন সুলায়মান আল-বলখী, ***তাফসীরে মুকাতিল (টীকা),*** বৈরুত: দারু এহয়াইত তোরাছ, ১ম প্রকাশ ১৪২৩ হিজরী, ০৫ খ.।

১৩. আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল উনদুলুসী (র.), ***আল-বাহরুল মুহীত***, বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রকাশ ১৪২০ হি., ১০ খ.।

১৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), ***তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন***, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সউদী আরব: খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রন প্রকল্প, মুদ্রন: ১৪১৩ হি.।

১৫. মূলঃ আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.), ***তাফসীরে জালালাইন***, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম, ***তাফসীরে জালালাইন আরবী-বাংলা***, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, খ. ০৭।

১৬. মান্না' ইবনে খলীল আল কাত্তান (মৃ. ১৪২০ হি.), ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআ'রিফ, ২য় সংস্করণ ১৪২১ হি., ২০০০ খৃ., ০১ খ.।

১৭. সুবহি আস-সালিহ, ***মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন***, দারুল ইলম লিল-মালাঈন, ২৪তম সংস্করণ ২০০০ খৃ., ০১ খ.।

১৮. ড. আমীর আবদুল আযীয, ***দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন***, বৈরুতঃ দারুল ফুরকান, ১ম সংস্করণ।

১৯. মূলঃ মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ***উলূমুল কুরআন ও উসূলে তাফসীর***, অনুবাদঃ মুফতী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, ঢাকাঃ আশরাফিয়া বুক হাউজ, ১ম প্রকাশ মার্চ ২০১৩ খৃ.।

২০. আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (র.), ***আল-ইতক্বান ফি উলূমিল কুরআন***, আল-হাইআতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যাহ লিল-কুতুব, প্রকাশ ১৯৭৪ খৃ., ১৩৯৪ হি., ০৪ খ.।

২১. শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, ***আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন,*** মিশর, দারুস সাবূনী, ২য় সংস্করণ ২০০৩ খৃ.।

২২. ড. হামূদ বিন আহমদ বিন ফারজ আর-রুহায়লী, ***মানহাজুল কুরআনিল কারীম ফী দাওয়াতিল মুশরিকীনা ইলাল ইসলাম***, মদীনা মুনাওয়ারাহঃ আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ, উমাদাতুল বাহাস আল-ইলমি বিল জামিআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি., ২০০৪ খৃ., ০২ খ.।

২৩. আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবু বকর আস-সুয়ূতী (র.), ***তাফসীরে জালালাইনের পার্শ্বটীকা***, (সূত্র. www.islamicpotro.com)।

২৪. ABDULLAH YUSUF ALI, ***THE HOLY QUR-AN, (Text, Translation and commentary)***, COPYRIGHTED 1946 BY KHALIL Al-RAWAF, PRINTED IN THE UNITED STATES BY MCGREGOR & WERNER, INC. VOLUME ONE.

২৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** দারু তাওক্বিন নাজাত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২হি., ০৯ খ.।

২৬. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, ***সহীহ মুসলিম***, বৈরুতঃ দারু এহয়াইত তোরাছ আল-আরাবী, ০৫ খ.।

২৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, ***জামে আত-তিরমিযী***, বৈরুতঃ দারুল গারব আল-ইসলামী, প্রকাশ ১৯৯৮ খৃ., ০৬ খ.।

২৮. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে মূসা আত-তিরমিযী, ***জামে আত-তিরমিযী***, মিশরঃ শিরকায়ে মাকতাবা ওয়া মাতবাআয়ে মোস্তফা, ২য় সংস্করণ ১৩৯৫ হি, ১৯৭৫ খৃ., ৫ খ.।

২৯. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, ***সুনানুন নাসাঈ***, মাকতাবুল মাতবূআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬ হি., ১৯৮৬ খৃ., ০৮ খ.।

৩০. সুলাইমান ইবনুল আসআছ আল আযদী আস-সিজিস্তানী, ***সুনানু আবি দাউদ***, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ০৪ খ.।

৩১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** তাহক্বীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারু এহয়াইল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, ০২ খ.।

৩২. আবু আবদুল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আন-নিশাপুরী, ***আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হি., ১৯৯০ খৃ., ০৪ খ.।

৩৩. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান আত-তামীমী (র.), ***সহীহ ইবনে হিব্বান***, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪০৮ হি., ১৯৮৮ খৃ., ১৮ খ.।

৩৪. ইমাম মালিক, ***মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক,*** মুহাক্কিক: বাশ্শার আওয়াদ মারূফ ও মুহাম্মদ খলীল, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি., ০২ খ.।

৩৫. ইমাম মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক, ***মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক,*** আবুধাবী: মুআস্সাসাতু যায়াদ ইবনে সুলতান আল-নাহিয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ., ০৮ খ.।

৩৬. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ***মুসনাদে আহমদ,*** মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৪২১ হি., ২০০১ খৃ., ৪৫ খ.।

৩৭. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দারেমী, ***সুনানুদ দারেমী,*** আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ: দারুল মুগণী, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ হি., ২০০০ খৃ., ৪ খ.।

৩৮. আবু বকর ইবনে আবী শায়বাহ, ***মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ***, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ হি., ০৭ খ.।

৩৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আল-বাগদাদী, ***আত-তাবাক্বাতুল কুবরা***, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১০ হি., ১৯৯০ খৃ., ০৮ খ.।

৪০. আবু ইয়ালা আহমদ ইবনে আলী আল-মূসেলী, ***মুসনাদে আবী ইয়া'লা***, দামেস্ক: দারুল মামূন লিত-তোরাছ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪ হি., ১৯৮৪ খৃ., খ. ১৩।

৪১. ইমাম আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম প্রকাশ ১৪২৩ হি., ২০০৩ খৃ., খ. ১৪।

৪২. ইমাম আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, ***আস-সুনানুল কুবরা***, বৈরুত, লিবনান: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., ১০ খ.।

৪৩. সুলাইমান ইবনে আহমদ আত-তাবারানী, ***মুসনাদুশ শামিয়ীন***, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি., ১৯৮৪ খৃ., ০৪ খ.।

৪৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ***জুযউল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম***, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮০ খৃ., ১৪০০ হি., ০১ খ.।

৪৫. আবু বকর অহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী আল-বায়হাকী (র.), ***আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী***, জিদ্দা, মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ১ম সংস্করণ ১৪১৩ হি., ১৯৯৩ খৃ., ০২ খ.।

৪৬. আল্লামা তাবারানী (র.), ***আল-মুজামুস সগীর***, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ খৃ., ০২ খ.।

৪৭. আবু বকর আহমদ ইবনে আমর আল বায্যার, ***মুসনাদুল বায্যার***, মুহাক্কিক: মাহফুযুর রহমান ও আদিল বিন সাদ, মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮-২০০৯ খৃ., ১৮ খ.।

৪৮. মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে আলী আল-বাগাভী, ***শরহুস সুন্নাহ,*** দামেশ্ক, বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৫ খ.।

৪৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওয়ালী উদ্দীন আত-তিবরীযী, ***মিশকাতুল মাসাবীহ,*** বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৫ খৃ., ০৩ খ.।

৫০. আবদুর রাযযাক বিন আবদুল মুহসিন আল-বদর, ***আশ-শায়খ আবদুর রহমান বিন সাদী ওয়া জুহুদুহু ফী তাওযীহিল আকীদাহ***, রিয়াদ: আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১৮ হি., ১৯৯৮ খৃ., ০১ খ.।

৫১. লাজনাতু উলামা বিরিআসাতি নিযামুদ্দিন আল-বলখী, ***ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া***, দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৩২০ হি., ০৬ খ.।

৫২. আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-জাযীরী, ***আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ,*** বৈরুত: লিবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., ০৫ খ. ।

৫৩. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে কুদামা, ***আল-মুগনী***, মাকতাবাতুল কাহেরাহ, প্রকাশ ১৩৮৮ হি, ১৯৮৮ খৃ., ১০ খ.।

৫৪. শায়খ আহমদ মুল্লাজিউন (র.), ***নূরুল আনওয়ার,*** দেওবন্দ: সাহারানপুর, আশরাফী বুক ডিপো।

৫৫. শায়খ আহমদ মুল্লাজিউন (র.), ***নূরুল আনওয়ার,*** ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, প্রকাশ ১৯৭৬ খৃ.।

৫৬. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, কায়রো: দারুল হাদিস, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি., ২০০৪ খৃ., ১৪ খ.।

৫৭. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, দারু হিজর, ১ম প্রকাশ ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ., ২০ খ.।

৫৮. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ***, মুহাক্কিক: আলী শীরী, দারু এহয়াইত তোরাছ আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খৃ., ১৪ খ.।

৫৯. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ***, দারু এহয়াইত তোরাছ, প্রথম সংস্করণ ১৪০৮ হি., ১৯৮৮ খৃ., ১৪ খ.।

৬০. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, বৈরুত: দারুত তোরাছ, ২য় সংস্করণ ১৩৮৭ হি., ১১ খ. ।

৬১. মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.), ***তারীখুত তাবারী***, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি., ১১ খ.।

৬২. আল্লামা জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওযী, ***আল-মুনতাযাম ফি তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম***, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি., ১৯৯২ খৃ., ১৯ খ.।

৬৩. ড. জাওয়াদ আলী, ***আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম***, পাদটীকা, দারুস সাকী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪২২ হি., ২০০১ খৃ., ২০ খ.।

৬৪. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাছাছুল আম্বিয়া***, আল-কাহেরা: মাতবাআয়ে দারুত তা'লীফ, ১ম সংস্করণ ১৩৮৮ হি., ১৯৬৮ খৃ., ০১ খ.।

৬৫. আহমদ আলী সাবিত আল-খতীব আল-বাগদাদী, ***তারীখুল আম্বিয়া,*** বৈরুত: লিবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ০১ খ.।

৬৬. মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে ঈসা আদ-দামেরী (র.), ***হায়াতুল হায়ওয়ান,*** বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪২৪ হি., ০২ খ.।

৬৭. মূল: আল্লামা ইবনে কাছীর (র.), ***কাসাসুল আম্বিয়া***, অনুবাদ: মাও. উবায়দুর রহমান খান নদভী, ঢাকা ১১০০: সোলেমানিয়া বুক হাউজ, মুদ্রন: জানুয়ারী ২০১৭, সকল খণ্ড একত্রে ০১ ভলিউম।

৬৮. মাওলানা হিফযুর রহমান (র.), ***কাছাছুল কোরআন***, অনুবাদ: মাওলানা নূরুর রহমান, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পূর্ণমুদ্রন: নভেম্বর ২০১২, ০৫ খ.।

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৩ খৃ., ০২ খ.।

৭০. ইউসুফ বিন আবদুর রহমান বিন ইউসুফ, ***তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল,*** বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০০-১৯৮০, ৩৫ খ.।

৭১. আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব আল-কিনানী, ***আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ***, বৈরুত: দার ও মাকতাবায়ে হেলাল, প্রকাশ ১৪২৩ হি., ০১ খ.।

৭২. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-বাগদাদী, ***আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়্যাহ***, বৈরুত: দারু ছাদির, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭ হি., ১০ খ.।

৭৩. আল্লামা শিহাবুদ্দীন আল হামাভী, ***গ্রন্থ মুজামুল বুলদান,*** বৈরুত: দারু ছাদির, ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ., ০৭ খ.।

৭৪. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, ***আদাবে জিন্দেগী,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: জুন ১৯৯৪ খৃ., মুহাররম ১৪১৫ হি.।

৭৫. মূল: ইমাম গাযালী (রহ), ***এছলাহে নফ্‌স বা আত্মার পরিশুদ্ধি,*** বাংলা রূপায়ণ: শর্ষিণা লাইব্রেরী অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ কতৃক অনুদিত, শর্ষিণা লাইব্রেরী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ মার্চ ২০১১ ইং।

৭৬. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, ***ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্‌স রোগের উৎস ও প্রতিকার,*** আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই ২০০৯ খৃ.।

৭৭. লেখক মণ্ডলী, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, একাদশ সংস্করণ জুন ২০১৩ খৃ.।

৭৮. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.), ***মিন্‌হাজুল আবেদীন,*** অনু. মাওলানা মুজীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ জুন ১৯৯৪ খৃ.।

৭৯. ড. কাজী দ্বীন মুহম্মদ, ***জীবন সৌন্দর্য,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ আগস্ট ১৯৮২ খৃ., যিলকদ ১৪০২ হি.।

৮০. মূল: হযরত ইমাম গায্‌যালী (র.), ***সৌভাগ্যের পরশমণি***, অনু: আবদুল খালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম (ই.ফা.বা. চতুর্থ) সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, পৌষ ১৪১০, যিলকদ ১৪২৪ হি., ০৪ খ.।

৮১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস,*** ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭ খৃ.।

৮২. অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, ***কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন,*** বাংলাবাজার, ঢাকা: ভূঁইয়া প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ ২০০৫ খৃ., ০৩ খ. একত্রে এক ভলিউমে।

৮৩. সাইয়েদ হামেদ আলী, ***ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?*** অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৫ম মুদ্রণ জুলাই-২০১৩ খৃ.।

৮৪. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ***পরিবার ও পারিবারিক জীবন,*** ঢাকা ১১০০: খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৩ খৃ.।

৮৫. আস-সাইয়্যেদ আশ-শরীফ আল-জুরজানী, ***আত-তা'রীফাত***, করাচী, পাকিস্তান: কাদীমী কুতুবখানা।

৮৬. ইবরাহীম মোস্তফা ও অন্যান্য, ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত***, দেওবন্দ: কুতুবখানায়ে হুসাইনিয়া, প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩ খৃ.।

৮৭. রাগিব আল ইস্পাহানি, ***আল মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন***, করাচী, পাকিস্তান: নূরমোহাম্মদ কারখানা।

৮৮. মূল: আবুল ফযল মাও. আব্দুল হাফিজ বালয়াভী (রহ:), ***মিছবাহুল লোগাত,*** অনু. হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ ১৪২৪ হি., ২০০৩ খৃ.।

৮৯. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী, ***লিসানুল আরব***, বৈরুত: দারু ছাদের, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৪ হি., ১৫ খ.।

৯০. আবু তাহের মেসবাহ, ***আল-মানার (আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান)***, চকবাজার, ঢাকা: ১২১১, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রকাশকাল ১৯৯০ খৃ., ০১ খ.।

৯১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আরবী- বাংলা ব্যবহারিক অভিধান [আল- ক্বামূসুল ওয়াজীয],*** ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, চতুর্দশ সংস্করণ: জানুয়ারী ২০১১ খৃ.।

৯২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ***আলকাওসার আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান,*** বংলাবাজার, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ৭ম সংস্করণ মার্চ ১৯৯৭ খৃ., যিলকদ ১৪১৭ হি.।

৯৩. A. T. DEV'S, ***STUDENTS FAVOURITE DICTIONARY(BENG. TO ENG.),*** BANGLA BAZAR, DHAKA, PROGATI COMPUTER & PUBLISHER, NEW ADDITION 2002.

৯৪. A. T. DEV'S, ***STUDENTS FAVOURITE DICTIONARY(BENG. TO ENG.),*** BANGLA BAZAR, DHAKA, PROGATI COMPUTER & PUBLISHER, NEW ADDITION 2007.

৯৫. ***দৈনিক ইনকিলাব, মানবজমিন, প্রথম আলো, সংগ্রাম***, প্রকাশিত ১লা জানুয়ারী ২০০০ খৃ.।

৯৬. ***দৈনিক ইনকিলাব***, ৩১ মার্চ ২০১৭ ইং তারিখে প্রকাশিত; ***প্রথম আলো***, ১০ অক্টোবর ২০২০ ইং তারিখে প্রকাশিত।

৯৭. আতিকুর রহমান নগরী, ***দৈনিক ইনকিলাব***, প্রকাশ ৪ জানুয়ারী ২০১৯ খৃ.।

৯৮. ***প্রথম আলো,*** ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ খৃ. তারিখে প্রকাশিত।

৯৯. ***দৈনিক সকাল***, ২৯ জুন ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত।

১০০. কাদির কল্লোল, ***বিবিসি বাংলা,*** ঢাকা: ২৫ নভেম্বর ২০১৫ খৃ. তারিখে প্রকাশিত। সূত্র: www.bbc.com 2015/11

১০১. ফাহিম আজম, ***হযরত নূহ (আ.) এর জীবনী,*** islamic linker. প্রকাশ ২৫/০১/২০১৭ খৃ.।

১০২. নূহ-***উইকিপিডিয়া***, বাইবেলের বর্ণনা।

১০৩. www.almstba.com/t255887.html

১০৪. ***সূরা হুদের নামকরণ***, www.almstba.com/t255887.html

১০৫. আতাউর রহমান খসরু, ***কোথায় ছিল নূহ (আ.) এর ঘরবসতি***, ***দৈনিক কালের কণ্ঠ***, প্রকাশ ১০ই অক্টোবর ২০১৯ খৃ.।

১০৬. উইকিপিডিয়া-***সমকামিতা, শব্দতত্ত্ব,*** সূত্র: bn.wikipedia.org/wiki/mgKvwgZv

১০৭. ***সমকামীদের মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বিপক্ষে বাংলাদেশ*** | বিশ্ব | DW| ০৬/১০/২০১৭; ***দেশ বা অঞ্চল অনুযায়ী সমকামী অধিকার***, bn.m.wikipedia.org

১০৮. ***বিবিসি বাংলা***, ১৯ মে, ২০১৭ খৃ.।

১০৯. রয়টার্স, ঢাকা, ***দৈনিক নয়াদিগন্ত***, ১৬ মার্চ, ২০১৩ খৃ.।

১১০. *বিবিসি বাংলা*, ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৪ খৃ.।

১১১. *মিশর*, উইকিপিডিয়া।